KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 200	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : মীর ওয়াহাব
Title চতুরঙ্গ	Size 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number ৬১/১ ৬১/2 ৬১/৩-৪	Year of Publication বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৮ // Aug 2001 শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৮ // Dec 2001 কার্তিক-চৈত্র ১৪০৮ // May 2002 (1)
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : আবদুর রাউফ	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৬১ সংখ্যা ৩–৪

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

দুর্দশাক্লিষ্ট শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে বসবাসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিরিখে রাজনৈতিক মতাদর্শের বিচার এবং জাতশিল্পীর সহজাত প্রেরণা মিলেমিশে যেভাবে বিকশিত হয়েছে সোমনাথ হোরের মহান শিল্পীসত্তা—শিল্পীর আশি বছর বয়ঃক্রম উপলক্ষে সেই ইতিহাস নির্মাণ করেছেন প্রসিদ্ধ শিল্প-ইতিহাসকার অশোক ভট্টাচার্য।

পরিবেশবিজ্ঞান সর্বজনীন সমৃদ্ধিভিত্তিক উন্নত সভ্যতার চাবিকাঠি হয়ে উঠতে পারে যে প্রক্রিয়ায় তা ব্যাখ্যা করেছেন প্রকৃতিবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের কুশলী সমন্বয়কারী চিন্তাবিদ শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ।

জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে সম্মানিত অসমিয়া সাহিত্যিক ইন্দিরা গোস্বামীর পরিচয় ও সাহিত্যকৃতি সহ তাঁর একটি অনবদ্য গল্পের অনুবাদ।

নোবেলবিজয়ী নইপলের সাহিত্যে ভারতবীক্ষার অসম্পূর্ণতা নিয়ে আনন্দ ঘোষহাজরার নিবন্ধ। প্রসঙ্গত পুরাতন চতুরঙ্গ থেকে An Area of Darkness গ্রন্থের সমালোচনার পুনর্মুদ্রণ।

৩৮ বছর আগে ড. বিষ্ণু বসুকে লেখা শম্ভু মিত্রের একটি দীর্ঘ অপ্রকাশিত পত্র।

আলিপুর বোমার মামলার আসামি বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবী বিভূতিভূষণ সরকারের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা।

অনালোচিত জ্ঞানতাপস ইতিহাসবিদ হাসান আসকারির জন্মশতবর্ষে অধ্যাপক সোমনাথ রায়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

অমিয়ভূষণের 'মহাসত্ত্ব' নাটিকার শেষাংশের পুনর্মুদ্রণ।

প্রথম পছন্দ !

সেরা কেটারার বলতেই বিজলী গ্রীল।
যে-কোনও সামাজিক বা পারিবারিক উপলক্ষে কেটারিং-এর প্রয়োজনে সকলের প্রথম পছন্দ বিজলী গ্রীল। কারণ সকলেই জানেন সেরা খাবার আর সেরা আপ্যায়নে বিজলী গ্রীলের জুড়ি নেই।

Bijoligrill

কেটারিং-এ শেষ কথা

কলিকাতা : ৯ই, রূপচাঁদ মুখার্জি লেন, কলিকাতা-৭০০ ০২৫
ফোন : ৪৫৫-২৩৬০/৩৯২২/৫৫৪১, ফ্যাক্স : ৯১-৩৩-৪৫৫ ২৭৬৬

দিল্লি : সি/১৯৫, গ্রেটার কৈলাস, পার্ট-১, নিউ দিল্লি-১১০ ০৪৮
ফোন : ৬৪৮-০৫০২, ৬২৮-৭৩৭১, ৬৮৮-১৮৫৫, ফ্যাক্স : ৬২৩-৪৯৩৯

কার্তিক-চৈত্র ১৪০৮
বর্ষ ৬১ সংখ্যা ৩-৪

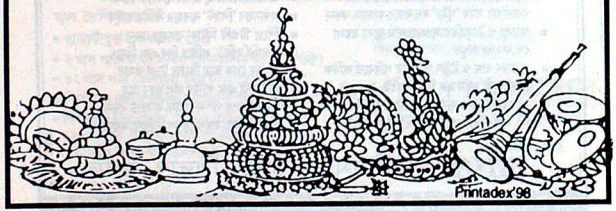

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০

শিল্পী সোমনাথ হোর ✣ অশোক ভট্টাচার্য ১৯৯

কবিতা ✣ ২০৯-২১৬

ছোট্ট পৃথিবীটা ✣ কৃষ্ণ ধর নদীর ওপারে ✣ মৃণাল বসুচৌধুরী
স্বাভাবিকে ✣ মতি মুখোপাধ্যায় ইতিকথা ✣ প্রণব চট্টোপাধ্যায় আম ও আঁটি ✣ উৎপল ঝা
ফুল, এইসব ✣ নাসের হোসেন হে সমষ্টি ✣ অতনুশাসন মুখোপাধ্যায় সম্রাটের উদ্দেশে ✣ রজতশুভ্র মজুমদার

প্রসঙ্গ : প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবন ✣ শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ২১৭

অনুবাদ গল্প : যাত্রা ✣ মামণি রয়সম (ইন্দিরা) গোস্বামী ✣ সঞ্জিত চক্রবর্তী ২২২

জ্ঞানপীঠ বিজয়িনী ইন্দিরা গোস্বামী ২২৯

কপিরাইট ✣ অমিতাভ রায় ২৩৩

বিপ্লবীর স্মৃতিকথা ✣ বিভূতিভূষণ সরকার ২৪১

নইপল সাহেবের প্রস্থান ভূমির খোঁজে ✣ আনন্দ ঘোষ হাজরা ২৪৪

তাঁর নিপীড়িত মানুষের প্রতি টান বা ভালবাসাও নেই ✣ রামপ্রসাদ সেন ২৫১

শম্ভু মিত্রের একটি চিঠি ✣ বিষ্ণু বসু ২৫৩

ঐতিহাসিক সৈয়দ হাসান আসকারি ✣ সোমনাথ রায় ২৫৭

গ্রন্থসমালোচনা ২৬০-২৭৩

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী ✣ অমিতাভ রায় ✣ পরিমল চক্রবর্তী ✣ গৌতম নিয়োগী
মধুময় পাল ✣ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ✣ মীনাক্ষী ঘোষ
ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ✣ সুশীল সাহা ✣ ঝরনা ধর

নাট্য-চলচ্চিত্র সমালোচনা ২৭৪

মেঘ মুখোপাধ্যায় ✣ বিশ্বনাথ রায়

রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ে চিঠি ✣ কমলাকান্ত বরাট ২৮১

পুনর্মুদ্রণ : মহাসত্ত্ব ✣ অমিয়ভূষণ মজুমদার ২৮৪

মূল্য: ১৫ টাকা শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক ইম্প্রেশন হাউস, ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা - ৯
ডাকে: ১৮ টাকা থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা – ১৩ থেকে প্রকাশিত দূরভাষ : ২৩৭-৩৭৭০
শিল্প পরিকল্পনা: রণেন আয়ন দত্ত অক্ষর বিন্যাসে – নয়া উদ্যোগ, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা – ৬ সম্পাদক : আবদুর রাউফ

কৃষ্ণা কেমিক্যাল নিয়ে এল শুভ্রতার ঝলক্-

ম্যাজিক্যাল হোয়াইটনার যুক্ত

WHITE HORSE DETERGENT POWDER

এতে নেই বিজ্ঞাপনের চমক। জিনিষ চিনুন সঠিকভাবে আর ব্যবহার করেই দেখুন। হোয়াইট হর্স্ ডিটারজেন্টের প্রতিটি প্যাকেটেই পাবেন লাকি গিফ্‌ট কুপন।

T.V., ফ্রিজ, ক্যামেরা, সেলাই মেশিন ছাড়াও আছে নানান আকর্ষণীয় পুরস্কার। তাই আর দেরী নয়। আজই আনুন।

WHITE HORSE DETERGENT POWER

❖ আর জিতে নিন চমকপ্রদ সব পুরস্কার ❖

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণা কেমিক্যালস্

কলকাতা

দূরভাষ :4527399

প্রবন্ধ

শিল্পী সোমনাথ হোর

অশোক ভট্টাচার্য

সোমনাথ হোর আশি বছরে পৌঁছেছেন। এখনকার বাঙালি শিল্পীদের তিনি শীর্ষস্থানীয় একজন। ভারতের সমকালীন রূপকলার মানচিত্রেও তাঁর স্থান তারকাচিহ্নিত। সাধারণ ভাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা ছাপাই ছবির মর্মস্পর্শী রূপকার হিসাবে। তবে শেষ বয়সে অভ্যস্ত মাধ্যমকে পাশে রেখে তিনি যে ধাতুপাতের ভাস্কর্যগুলি রচনা করেছেন তাতেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর সৃজনশীলতার প্রাণশক্তি। সমকালীন ভাস্কররাও তাই অকুণ্ঠচিত্ত তাঁকে স্বমর্যাদায় গ্রহণ করতে।

আমাদের দুর্ভাগ্য, এখন সব রকমের কাজ থেকে তাঁকে ছুটি নিতে হয়েছে— ভঙ্গুর স্বাস্থ্য, বার্ধক্য জনিত স্বাভাবিক দুর্বলতা, আর চিকিৎসকের পরামর্শ তাঁকে ঘরবন্দি করেছে। এমনকী লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ তাঁর পক্ষে এখন কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে।

তবু, ভাবতে ভাল লাগে, তাঁর অবস্থান যেখানে থাকার তিনি সেখানেই আছেন। তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন সমকালীন ভারতীয় রূপকলার অন্যতম রূপকারের আসনে।

সোমনাথ হোরের কর্মবহুল দীর্ঘজীবন আমাদের নানা ভাবে সৌভাগ্যবান করেছে। প্রথমত তাঁর সারাজীবনের নানা পর্বের কাজ পরিক্রমা করে আমরা এখন তাঁর সম্পর্কে একটা পুরোপুরি ধারণা করে নিতে পারি। দ্বিতীয়ত, শেষের দিকে, যখন তিনি সারা দেশে স্বীকৃতি ও ভালবাসা অর্জন করেছেন, এবং তাঁর জীবন ও ভাবনা সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠেছে, তখন *আমার চিত্রভাবনা* (১৯৯২) নামে স্বল্প পরিসরের বইটি লিখে তাঁর জীবন, সামাজিক বিশ্বাস ও শিল্পাদর্শ বিষয়ে সকল প্রয়োজনীয় কথা লিপিবদ্ধ করে ভবিষ্যতের শিল্প-ঐতিহাসিকের দুর্ভাবনা নিরসন করে দিয়েছেন। এর ফলে তাঁর বিষয়ে আজ ও আগামীকাল যিনিই কলম ধরুন তাঁকে আর অনুমান বা সংশয়ের বোঝা বইতে হবে না। বরং মানুষ ও শিল্পী সোমনাথ হোরকে ছোট বইটির ভিত্তিতে তিনি সঠিকভাবে উপস্থাপিত করতে পারবেন, করতে পারবেন তাঁর প্রাপ্য তথ্যনির্ভর মূল্যায়ন।

২

কোনও সৃজনশীল শিল্পীই স্থানকালপাত্র নিরপেক্ষ নন। প্রত্যেকেই তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়ে, বিশেষ কয়েকটি অভিজ্ঞতার স্তর পেরিয়ে নিজস্ব অবস্থান খুঁজে নেন। তবে পারিপার্শ্বিকের প্রভাব সকলের সৃষ্টিতে সমানভাবে লক্ষ করা যায় না। সমাজ-মনস্ক যাঁরা, আসপাশের মানুষ ও প্রকৃতি, এবং অপ্রকৃতির সঙ্গে ঘর করে যাঁরা নিজের জীবন-দর্শন গড়ে তোলেন, তাঁদের ওপর এই প্রভাব যতখানি, ততখানি নয় সেই জাতের শিল্পীদের ওপর যাঁদের লক্ষ্য থাকে "দেশকাল উত্তীর্ণ" "বিশুদ্ধ" শিল্পীসৃষ্টির মাধ্যমে সর্বজনীন ও সর্বকালীন প্রতিষ্ঠা। সোমনাথ ছিলেন, এবং এখনও আছেন, দ্বিতীয় নয়, প্রথম শ্রেণীরই শিল্পী। তাঁর প্রথম জীবনের কাজের যে স্থায়ী ভাব, শেষ জীবনেরও তাই-ই। তবে অবশ্যই তার আবেদনের স্তরে ঘটেছে এক বড় পরিবর্তন। প্রথম দিকের কাজের আবেদন ছিল প্রধানত সামাজিক বুদ্ধি-বিবেচনা আর আবেগ অনুভূতির কাছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের আবেদন মননশীল মানুষের রসোপলব্ধির কাছে। কিন্তু দুই পর্বের কাজেরও একটা দৃঢ় মেলবন্ধন আছে— শিল্পীর অনন্য সংবেদনশীলতা, যা অসহায় মানুষ শুধু নয়, অন্য জীবের প্রতিও প্রসারিত, যা একান্তই মানবিক।

সোমনাথের জীবনের গোড়ার কথা তাঁর কাছ থেকেই শোনা যাক্ :

"১৯২১ সালের ১৩ এপ্রিল আমার জন্ম। চট্টগ্রাম জেলার বরমা গ্রামে। আমার প্রথম শিল্পকর্ম-একটি সী-প্লেন, বলা চলে জলভাসি বায়ুযানের মডেল তৈরি করা ... পড়াশুনা বিশেষ করতাম না। এসব করতে ভাল লাগত। কিছুদিনের মধ্যে বাবা আমাকে গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন; একান্নবর্তী বিরাট পরিবার। সবাইয়ের সঙ্গে মানুষ (!) হোক এই ছিল বোধ হয় কামনা।

গ্রামে এসে নিম্নতম অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হলাম। ... কী করে নিচের ক্লাসগুলির ঘাটসিঁড়ি কিছু কিছু অতিক্রম করলাম তা খুব একটা মনে পড়ে না। দেবেন্দ্র মজুমদার আমাদের ড্রয়িং আর ড্রিল শেখাতেন, তাঁর ড্রয়িং ক্লাসে আমি খুব মন দিয়ে কাজ করতাম, কাজ মানে বাজারি কপিবুক থেকে চেয়ার, টেবিল, বাড়ির গেট, গোলাপ ফুল প্রভৃতি। এগুলি করতে গিয়ে সোজা করে লাইন টানা, বেঁকিয়ে টানা, গোল বৃত্ত আঁকা ইত্যাদিতে আমি মজা পেতাম। মাস্টারমশাই আমাকে আঁকায় খুব উৎসাহ দিতেন

... আমার আঁকার হাত দেখে আমার শৈলেন কাকা আমাকে জলরঙের ছোট একটি বাক্স কিনে দেন। ক্যালেন্ডার দেখে কিংবা বই থেকে রঙিন ছবি, ফুল, পাখি (মাছরাঙা খুব সুন্দর লাগত), আঙুরের থোকা বা আপেল নকল করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত, খুব ভাবনাও হত, রঙ বুঝি ফুরিয়ে যাবে। চিত্তরঞ্জন দাশের 'সাগরসংগীত' কাব্যগ্রন্থে একটি ছবি ছিল, তাতে জলের উপরে মেঘের আনাগোনার অন্তরালে চাঁদ, জলেও তার প্রতিবিম্ব, সেই ছবি নকল করতে কী যে হয়রানি; তবু দিনের পর দিন অপটু হাতে চেষ্টা করে গেছি।

তখনকার দিনে বসুমতী, ভারতবর্ষ, প্রবাসীতে ছাপা ছবি দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতাম। কী করে শিল্পীরা এসব আঁকেন? আমাদের গ্রামে এক কালীসাধকের আখড়ায় দুজন গ্রামশিল্পী 'শ্মশানে হরিশ্চন্দ্র'র কাহিনীচিত্র তিন দেয়ালে দিশি রঙ দিয়ে আঁকেন। আমি প্রায় গিয়ে দেখতাম। ভেবেই পেতাম না — কোন্ অলৌকিক শক্তিতে মন থেকে গাছপালা নদনদী জল আগুন পশুপাখি এবং সর্বোপরি মানুষমানুষীর অবয়ব আঁকা সম্ভব। দেখে দেখে নকল করা যায়; কিন্তু মন থেকে আঁকা, সে কোন্ যাদু!"

সোমনাথের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় তাঁর সময়কার আর পাঁচজন বাঙালি শিল্পীর মতোই তাঁর চিত্রকর্মে হাতে খড়ি, প্রাথমিক পাঠ আর মাধ্যমকে আয়ত্তে আনার প্রয়াস। রেখার বিচিত্র গতি, রঙের জৌলুস আর রূপের মোহনীয়তায় তিনি তাঁর সহজাত শিল্পীবোধেই আকৃষ্ট হয়েছেন। কিন্তু তাঁর জীবনকে, তাঁর শিল্পীসত্তাকে বিশিষ্ট চরিত্র দিয়েছিল যে পরিস্থিতি তা না-জানলে তাঁকে ঠিকভাবে জানা যাবে না। সেই পরিস্থিতির কথা, বিশেষ অভিজ্ঞতার কথাও তিনি লিখেছেন 'আমার চিত্রভাবনায়'।

"১৯৪০-৪১ সালে কলকাতায় বৌবাজারের মোড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধ ছাত্রনিবাসে থেকে সিটি কলেজে পড়তাম।.. এই সময় শিবু নামে এক সঙ্গীর প্রভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসি। পার্টি বে-আইনি ছিল; তাই আকর্ষণও সহজ ছিল। সে সময় কিছু দিন হাতে লিখে পোস্টার করি। হাতের অক্ষর পরিচ্ছন্ন ছিল বলে পোস্টারগুলির কদর হত। জার্মান কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হবার পর যুদ্ধের ব্যাখ্যা পালটে গেল। 'এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে এক পাইও নয়, এক ভাইও নয়' আওয়াজ কিছু দিনের মধ্যে এই যুদ্ধে 'প্রতিটি পাই, প্রতিটি ভাই' লেখা শুরু হল। এ সবের তাৎপর্য খুব একটা বুঝতাম না। প্রায় ছাপার মতো করে লিখতে পারতাম, বন্ধুরা খুশি হত। আমিও এক ধরনের তৃপ্তি পেতাম।"

কিন্তু এই সময় জাপানি বোমার হিড়িকে কলকাতা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল — কলেজ গেল বন্ধ হয়ে। কাজেই সোমনাথকে গ্রামে ফিরতে হল। সেখানেও কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মীদের সঙ্গে যুক্ত হলেন তিনি। পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'পিপ্‌ল্‌স ওয়ার' আসত চট্টগ্রামে, তাতে থাকত চিত্তপ্রসাদের ফ্যাসি-বিরোধী কার্টুন, সেগুলো বড় আকারে নকল করে পোস্টার হিসাবে এঁকে দিতেন তিনি। সে-সময় '৪২-র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিরোধী 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনও শুরু হয়েছে জোরদার। কমিউনিস্টরা তখন মিত্রশক্তি ব্রিটিশ শক্তির চেয়ে আপাত ভয়ংকর জাপানি ফ্যাসিবাদেরই বিরুদ্ধে সোচ্চার। সোমনাথ কমিউনিস্টদের সঙ্গেই থেকে গেলেন। একজন কমিউনিস্ট হিসাবেই প্রত্যক্ষ করলেন ব্রিটিশ ও দেশীয় জোতদারদের ষড়যন্ত্রে মনুষ্যসৃষ্টি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। ইতিমধ্যে তিনি হারিয়েছেন বাবাকে; ছোট ভাইবোনদের নিয়ে কষ্টে সংসার চালাচ্ছেন তাঁর সময়। তবু সে-সময় সমস্ত পরিবারটিই কমিউনিস্ট পার্টির নানা কাজে সক্রিয় — বিশেষ করে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের ত্রাণের ব্যাপারে।

১৯৪৩-৪৪-এর চট্টগ্রামের অভিজ্ঞতা মর্মন্তুদ। এক দিকে জাপানি বোমারু বিমানের ঘনঘন আক্রমণ, অন্যদিকে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে গ্রামের গরিব কৃষক পরিবারগুলির ছিন্নমূল, ক্লিষ্ট শোভাযাত্রা, এবং পথে পথে মৃত্যু। বাইশ বছরের সোমনাথের জীবনকে চিরকালের মতো নির্ধারিত করেছিল এই অভিজ্ঞতা মানবিকতার বুকে যে-ক্ষত তিনি দেখলেন, তার অভিজ্ঞতা ভুলতে পারেন নি কোনও দিনই। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই লিখছেন :

"দিল্লীতে থাকাকালে আমি বিষয়কে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছি; কিন্তু বিষয় আমাকে ছাড়েনি। পঞ্চাশের মন্বন্তরের যে ক্ষত, যুদ্ধের যে অমানবিকতা, ছেল্লিশের দাঙ্গার বীভৎসা — এগুলি আমার আঁকার পদ্ধতিতে খোদিত হয়ে যাচ্ছিল, আমারই অজানিতে। কাঠ-খোদাইয়ের নরুন দিয়ে কাঠ কাটি, ধাতুতলে অ্যাসিড দিয়ে ক্ষত তৈরি করি, আগে থেকে কোনো খসড়া ছাড়াই এই কাটাকুটির কাজ চলে, পরে অসংখ্য ক্ষত একটি মাত্র বিষয়ের ইঙ্গিত বয়ে আনে; তা হল আমাদের চারপাশের যারা অসহায়, পরিত্যক্ত, নিরন্ন, তাদের অবয়ব। দুর্ভিক্ষের ছবি দিয়ে যে খড়ি হাতের আঙুল পেরিয়ে হৃদয়ে দাগ কেটে ছিল, তার দাগ আর মিলাল না।"

যে-কোনও মাধ্যমের সৃজনশীল শিল্পীরই দুটো প্রধান সমস্যা থাকে — কী সৃষ্টি করব, আর কেমন করে সৃষ্টি করব। প্রথম সমস্যার সমাধান তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর রাজনৈতিক-সামাজিক আদর্শের শক্ত ভিত্তিতে। কিন্তু পরের সমস্যা, কেমন করে আঁকবেন সেই ছবি? এরও উত্তর তিনি পেয়ে গেলেন চট্টগ্রামেই। চিত্তপ্রসাদ অনেক আগে থেকেই কমিউনিস্ট হয়েছেন, এবং তাঁর ছবি, যার অধিকাংশই রাজনৈতিক কার্টুন বিশেষ, নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে পার্টির মুখপত্রে। যুদ্ধবিরোধী শিল্পী হিসাবে তাঁর খ্যাতিও তখন ছড়িয়ে পড়েছে দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও। তিনি

একটি আদিবাসী পরিবার

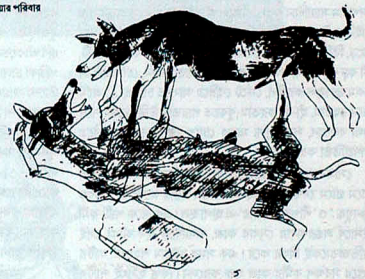

পার্টির নির্দেশেই চট্টগ্রামে এলেন দুর্ভিক্ষের ছবি আঁকতে। সঙ্গী হলেন সোমনাথ, অর্জন করলেন এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। তাঁর এই অভিজ্ঞতার কথা, তাঁর সঙ্গে চিত্তপ্রসাদের গাঢ় সম্পর্কের কথা তিনি লিখেছেন "চিত্তপ্রসাদ" নামক স্মৃতিকথায়। লিখছেন : "আমার সঙ্গে যখন পরিচয় হয়, তখন তিনি পঞ্চাশের মন্বন্তরের অসহায় শিকার অজস্র ননারীর ছবি এঁকে চলেছেন এবং সেগুলি সাম্যবাদী মুখপত্র People's War এবং 'জনযুদ্ধ'-এ নিয়মিত ছাপা হচ্ছে। ....

তিনি আমার প্রথম দীক্ষাগুরু। প্রায় হাতে ধরে ক্ষুধিত পীড়িত মুমূর্ষুদের অবয়ব আঁকায় উৎসাহ জুগিয়েছেন। যখনই চট্টগ্রামে যেতেন, আমি তাঁর অবিরাম সঙ্গ পেতাম। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ওঁর সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতাম। রাত্রে লণ্ঠনের আলোয় বসে দেখতাম সারাদিনে করা পেন্সিলে আঁকা স্কেচগুলিকে অবলীলায় চাইনীজ ইংকের কালিতুলি দিয়ে ভরাট করে তুলেছেন। মনে পড়ে, তিনি বলছেন — 'সোমনাথ, এই যে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি, কী বড় বড় চোখ, কত চুল, কত দিন খেতে পায়নি, চোখগুলি কী রকম জ্বলজ্বল করছিল, ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে' .... আমি শুনে যেতাম, হাঁ-হাঁ করতাম;বুঝতে পারতাম উনি নিজের সঙ্গে কথা বলছেন, সমগ্র দৃশ্য মনের চোখে দেখছেন এবং ছবিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করছেন।"

সোমনাথও পোস্টারে দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকে সহকর্মীদের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে দেখাতে থাকলেন। চিত্তপ্রসাদের মতো তাঁর ছবিও 'জনযুদ্ধ' ও 'পীপ্‌লস ওয়ার'-এ ছাপা হল। এক দিকে পার্টি কর্মী হিসাবে লঙ্গরখানায় সেবার কাজ, অন্যদিকে ছবি আঁকা সেই অভিজ্ঞতাকেই বিষয় করে। এক সময় চট্টগ্রাম শহরের পার্টির দপ্তরে সর্বক্ষণ কর্মীর কাজ শুরু করলেন। কিন্তু হঠাৎই পার্টির প্রাদেশিক কমিটির ডাকে কলকাতায় চলে আসতে হল তাঁকে, কাজ করার জন্য।

কলকাতায় এক 'অন্যজগতের সঙ্গে' পরিচিত হলেন তিনি। তখন সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি আর ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে (যা কিছুদিনের মধ্যে নাম বদলে হয় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ) খ্যাতনামা কবি সাহিত্যিক সংস্কৃতিকর্মীদের সমাবেশ ঘটেছে। গোপাল হালদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুধী প্রধান, সমরেশ বসু আরও অনেকের সঙ্গেই পরিচিত হলেন তিনি। বন্ধুত্ব হল সুকান্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গে। তখন সারাভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্ণধার পি.সি. যোশী। তাঁর ছিল কবি-সাহিত্যিক, নাট্যকার প্রমুখ শিল্পীদের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ। তাঁর আগ্রহে নিখিল চক্রবর্তী আর স্নেহাংশু আচার্যের ব্যবস্থায় শিক্ষিত শিল্পী হতে সরকারি আর্ট স্কুলে (তখনও কলেজ হয়নি) ভর্তি হলেন সোমনাথ। এতে চিত্ররচনার আঙ্গিকগত দিকে তাঁর যে দক্ষতার অভাব সম্পর্কে তাঁর অতৃপ্তি ছিল, তা নিরসনের সম্ভাবনা তৈরি হল।আর্ট স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা পেলেন জয়নুল আবেদীনের মতো শিল্পীর — মনোযোগ সহকারে মক্‌সো করলেন, লাইনের কাজ। মনোযোগ দিলেন, অন্য সহপাঠীদের মতোই, স্থিরচিত্র, অবয়ব, প্রাচীন মূর্তি, লাইফ আর পার্‌স্পেকটিভ স্টাডির দিকে।

আর্ট স্কুলে সোমনাথ ভর্তি হয়েছিলেন ১৯৪৫-এ। সে-সময়টা কলকাতা শহর ছিল নানা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল — রশীদ আলি দিবস, নৌ-বিদ্রোহ দিবস, ২৯ শে জুলাই-এর শ্রমিক ধর্মঘট, প্রায় প্রাত্যহিক ছাত্র-ধর্মঘট ইত্যাদি। এই আন্দোলনে স্বভাবতই পার্টি কর্মী ও শিল্পী সোমনাথ সাড়া না দিয়ে পারলেন না। তা ছাড়া মন্বন্তর — উত্তর গ্রাম-বাংলায় ভাগচাষিরা শুরু করেছেন তে-ভাগা আন্দোলন। তখন সোমনাথ থাকতেন মুজাফ্‌ফর আহমেদের সঙ্গে পার্টি কমিউনে, আর মাঝে মাঝে ছবি আঁকতেন পার্টি দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকার জন্য। 'স্বাধীনতা' পত্রিকা চালাতেন প্রধানত সোমনাথ লাহিড়ি ও নৃপেন চক্রবর্তী। তাঁদের আগ্রহে সোমনাথকে যেতে হল উত্তরবঙ্গে—রঙপুরে। সেখানে দশ দিন ভ্রমণ করতে করতে যে ডায়েরি তিনি লিখেছেন, তা আজ ছবি তিনি এঁকেছেন, তা আজ মূল্যবান দলিল। তাঁর পূর্বসূরী, চিত্তপ্রসাদ এঁকেছিলেন এমনই এক 'ডায়েরি ক্ষুধার্থ বাংলা'। ১৯৪৬-এর ১৮ই থেকে ২৮শে ডিসেম্বর হল এই ডায়েরির রচনাকাল।এটা পড়লে, এবং সঙ্গের স্কেচগুলো দেখলে, বাংলার কৃষকদের সংগ্রামী চেহারার এমন এক অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়, যার তুলনা দুর্লভ।এই ডায়েরি থেকে বিক্ষিপ্ত কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরার লোভ তাই সম্বরণ করতে পারছি না।

... "আজও প্রায় জনপঞ্চাশের লোক মিলে ধান কাটলেন। জমি জোতদার হাফেজ মিঞার, আধি নিয়েছে কসিমুদ্দিন আর গেলগেলো। আগের দিনের মতোই ঝাল্ডা উড়িয়ে, গান গেয়ে, ধ্বনি দিয়ে, ধান কাটা হলো।

আজকের ধানকাটা একটা নতুন ধরনের উৎসব হিসেবে চোখে ঠেকলো। কাল হিন্দু আধিয়ারের ধান কাটায় যে মাঙ্গলিক অভিযান হয়েছিল, আজ মুসলমান আধিয়ারের ধান কাটায়ও একই আয়োজন, একই উৎসব। যারা লাঙ্গল চালায়, ফসল ফলায়, তারা হিন্দু নয়, মুসলমানও নয়। তারা কৃষক।

ফেরার পথে এক বাড়ি থেকে দু-আনার মুড়ি কিনলুম। পয়সা দিয়েছিলুম শুধু মুড়ির জন্য, এলো কিন্তু মুড়ি মোয়া দুই। আর মুড়ির যা পরিমাণ তা দেখে সঙ্গী কমরেডকে জিগেস করলুম — দু'আনায় এত মুড়ি। কমরেড বললেন, "আপনি যে কমোরেড — কমোরেডকে বেশি দেবে না?" এখানকার ছেলেমেয়েদের কাছে কমোরেড অতি আদরের জিনিস।

পার্টি কর্মীদের বৈঠক

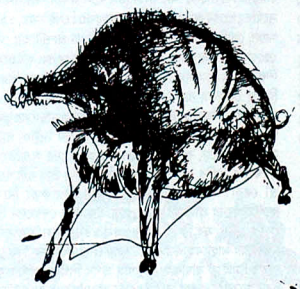

... বিকেলে ডোমারের দিকে রওনা হলুম। রওনা হবার আগে উপস্থিত একজন আধিয়ারকে জিগেস করলুম — "কি কমরেড, কী বোঝেন, নিজ খুলিতে ধান তুলতে পারবেন তো।" জবাব এলো, "এবার ছাড়ি দিমু না, এবার ছাড়ি দিমু না, জান দিমু তো ধান দিমু না।"

শয়তান জোতদার পুলিশ কিংবা গুন্ডার সহায়তায় যে চেষ্টাই করুক, এবার ধান পাবেনা, এই আশ্বাস নিয়েই বড়গাছা ছাড়লুম। যেখানে মোহনদা, রূপকান্তদার মতো কৃষক মাতব্বর রয়েছে, লখিয়া, কসিমুদ্দিনের মতো জোয়ান ভোলান্টিয়ার রয়েছে, নারায়ণ, পাঁচুদার মতো লালঝাণ্ডা কর্মী রয়েছে, দীনেশদার মতো কৃষক-নেতা রয়েছে, সেখানে আধিয়ারের তেভাগা আন্দোলন সফল হবেই।"

২১শ তারিখে লেখা এই রোজনামচার মতোই অন্যান্য দিনগুলোতেও এমনই এক নতুন জীবনের আস্বাদন লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন সোমনাথ। তারপর শেষ দিনের পাতায় লিখেছেন মোষের গাড়ি চড়ে ফেরার কথা:

"রাতের শেষ দিনের শুরু। এমনি সময় দেখি পুবের আকাশ, যাকে পেছনে ফেলে চলেছি, অপরূপ রূপে সজ্জিত হয়েছে। বহুরূপে বহুবার বহু দৃশ্য দেখেছি। অবাক হয়ে ভেবেছি, কেন এমন হয়, কেন এমনটি হয়। বিস্তৃত দুনিয়ার প্রতি অণু-পরমাণু যেন এক অবিরাম গতির আকর্ষণে তীব্র বেগে একদিকে ছুটে চলেছে, এই গতির বন্ধনের বাইরে কেউ নেই। মনে হয়, এই গতি, অবিচ্ছিন্ন অবিরাম গতি, ছবির প্রাণ। ছবি — সে ধরণীর বুকেই হোক, আর কাগজের বুকেই হোক, গতিহীন হতে পারে না।"

পঁচিশ বছরের যুবক সোমনাথের এই অভিজ্ঞতা আর বিশ্বাসকে না জেনে তাঁকে, তাঁর শিল্পকর্মকে বোঝা, উপলব্ধি করা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। জীবন-সায়াহ্নে কেন তিনি লালবাঁধের গ্রামকে বেছে নিয়ে, কৃষক জীবনের কাছাকাছি ফিরে যেতে চেয়েছেন, তারও উত্তর তাঁর এই পূর্ব-অভিজ্ঞতাতেই নিহিত।

৩

সোমনাথের জীবনে রাজনৈতিক মতাদর্শের তাড়নার আগেই দেখা দিয়েছিল শিল্পীর প্রেরণা। তাই তিনি তাঁর শিল্পকে নিয়েই কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তখন যাঁরা পার্টির বড় নেতা তাঁদের সাহিত্য-শিল্প-সংগীত-নাটকের প্রতি অশ্রদ্ধা ছিল না, বরং সর্বভারতীয় সচিব পি. সি. যোশী ছিলেন শিল্পবোদ্ধা এবং সীমিত অর্থে পৃষ্ঠপোষকও। এই পার্টি পরিবেশে সোমনাথ নিজস্ব চিত্রভাষা খুঁজতে যখন ব্যস্ত, সেই সময় তাঁর হাতে আসে কিছু চিনা উডকাট প্রিন্টের নমুনা। সেই উডকাট

ছবিগুলির মধ্যে একটা নতুন দিশা পেলেন। সাদায় কালোয়, এবং রঙেও, উডকাট যে সাধারণ মানুষের জীবনধারা, সংগ্রাম ও দুঃখদুর্দশাকে বিশেষ করে তুলে ধরার সার্থক মাধ্যম হতে পারে, এটা বুঝে আর্ট স্কুলে দ্বিতীয় বর্ষে তিনি গ্রাফিক বিভাগে যোগ দিলেন। উডকাটে আর্ট স্কুলে শিক্ষক হিসাবে পেলেন শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদকে। 'তেভাগার ডায়েরি'র অনেক স্কেচই সোমনাথ পরবর্তী কালে কাঠখোদাইয়ে রূপান্তরিত করেছিলেন।

এদিকে ১৯৪৮-এ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ও রাজনীতিতে একটা বড় পরিবর্তন ঘটল — শুরু হল 'এ আজাদি ঝুঁটা হ্যায়' আন্দোলন। তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আর্ট স্কুলের শিক্ষা অসম্পূর্ণ রেখে, পোস্টারের জন্য ছবি এঁকে এবং আরও দু-এক জন সহযোগীর সঙ্গে লিথোতে তা ছেপে সেই আন্দোলনের এক প্রধান সংগ্রামী শিল্পীর ভূমিকা নিলেন তিনি। কেননা এই নতুন রাজনীতি ও নতুন নেতৃত্বের সঙ্গে মতে মিলতে না পেরে তখন থেকেই পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন চিত্তপ্রসাদ।

'তেলেঙ্গানা' আর 'কাকদ্বীপ'-এর সাফল্য সত্ত্বেও, পঞ্চাশের গোড়ার দিকে সেই আন্দোলন ব্যর্থ হলে একটা আত্মসমীক্ষার সুযোগ পেলেন অনেকের মতো সোমনাথও। সেই সময়, ১৯৫২ সালে, সোভিয়েত রাশিয়ার ছবির এক বিরাট প্রদর্শনী হয় লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে। বড় বড় ক্যানভাসে প্রচারমূলক ছবিগুলোর শিল্প হিসাবে যে অসারতা তা তাঁকে সমাজতান্ত্রিক দেশের শিল্পচর্চা বিষয়ে মোহভঙ্গ করল। বিপুল আয়োজন ও তার অসারতার সঙ্গে দরিদ্র সেজান ও ভ্যান গঘের প্রাণোদ্দীপ্ত ক্যানভাসের তুলনা তাঁকে পথ বেছে নিতে সাহায্য করল। তিনি সস্ত্রীক পার্টির সদস্যপদ ছেড়ে, কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের সম্মতিতেই সর্বক্ষণের শিল্পীর কষ্টকর জীবনে ব্রতী হলেন। তাঁর সঙ্গী হলেন স্ত্রী রেবা। জীবনযাপনের প্রয়োজনে শিক্ষকতা নিলেন কর্পোরেশনের প্রাইমারি স্কুলে; প্রায় এক বছর শেখালেন ড্রিল থেকে ড্রয়িং সব কিছুই। তারপর ১৯৫৪ সালে অতুল বসু মহাশয়ের আহ্বানে ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুলে পেলেন গ্রাফিক বিভাগের দায়িত্ব। মাইনে সামান্যই, তবু এই প্রথম শিল্পীর পেশায় যুক্ত হবার সুযোগ পেলেন তিনি। এখানে ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে নিজের চর্চাও চলল সমান তালে — আর মনের মধ্যে শিল্পবিষয়ে ভাবনা চিন্তা। অবনীন্দ্রনাথের নব্যবঙ্গীয় শিল্পধারা, পাশাপাশি বাস্তবধর্মী পাশ্চাত্য অনুগামী ধারা সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও বোধ গড়ে তুললেন। সেই সঙ্গে অনুধাবন করতে থাকলেন পোস্ট-ইম্প্রেসনিস্ট ও তার পরবর্তী য়ুরোপীয় চিত্রকলার বিবর্তন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে। এই সব কিছুই তাঁকে ছবির গভীরে টেনে নিয়ে গেল।

৪

ম্যাকসিম গোর্কির মতো সোমনাথও হয়ত বলতে পারেন

— তাঁর জীবনবোধ ও সামাজিক চেতনার শিক্ষা তিনি পেয়েছেন তাঁর কৈশোর থেকে প্রথম জীবনের রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতির মহাবিদ্যালয়ে। কিন্তু শিল্পশিক্ষা তাঁকে অর্জন করতে হয়েছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে, আন্তরিক তাগিদে। তিনি তাঁর প্রথম গুরুর স্বীকৃতি দিয়েছেন চিত্তপ্রসাদকে — তাঁর কাছ থেকে শিখেছেন কীভাবে বুভুক্ষু মানুষের, শ্রমজীবী ও সংগ্রামী মানুষের জীবন্ত মডেলকে অবলম্বন করে স্কেচের খাতা ভরাতে হয়। তারপর প্রয়োজন মতো সেই স্কেচ কালিতুলিতে সম্পূর্ণতর করা যায়। সরকারি কলেজে জয়নুল আবেদীনের তত্ত্বাবধানে অ্যাকাডেমিক পাশ্চাত্যরীতিতে ছবি আঁকায় কী ধরনের অনুশীলন তিনি করেছিলেন, তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। আর নিজস্ব ভাবনায়, চিনা উডকাটের নিদর্শন দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর ছাপাই ছবিকেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে বিষয় হিসাবে বেছে নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। এই ছাপাই ছবির বিভিন্ন পদ্ধতিতে দক্ষতা অর্জনে তাঁর যে নিরলস প্রয়াস তার কথা বিস্তারে বলা প্রয়োজন।

আসলে সব কলাশিল্পের শিল্পীর বিশেষ ক্ষমতা চিহ্নিত হয় তাঁর প্রতিভা ও দক্ষতার সমন্বয়ের ওপর। প্রতিভা সহজাত হলেও তার স্ফূরণে প্রয়োজন সাধনার — তা যেমন নান্দনিকভাবে নিজেকে শিক্ষিত ও অনুভবী করতে, তেমনই নিজস্ব শিল্পমাধ্যমের করণকৌশলে পূর্ণ অধিকার অর্জনের জন্যও। এই যে শিল্পসৃষ্টির দু-মুখী প্রক্রিয়া, তার পথে এগোতে হয় শিল্পীকে এককভাবে। আর যাঁরা রসিক তাঁরা তৃপ্ত হন এই প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট শিল্পের শ্রবণে বা দর্শনে। তাঁদের তেমন প্রয়োজন হয় না এই দুরূহ প্রক্রিয়ার অভিঘাতকে জানার।

সব মাধ্যমের শিল্পীই কারিগর। তবে মূর্তি বা ছাপাই ছবির শিল্পী সম্ভবত তুলনামূলকভাবে অধিকতর কায়িক পরিশ্রমী। কী ছাপাই ছবির করণকৌশলকে আয়ত্ত করতে, কী তৈরি করা ম্যাট্রিক্স থেকে ছাপ তুলতে ছাপাই ছবির শিল্পীর ভূমিকা অনেকটা কারুশিল্পীর মতোই। যদিও তার যে প্রক্রিয়াজাত শিল্পকর্ম তা শিল্পীর সংবেদনশীলতায় ও নান্দনিক উপলব্ধির গুণে শিল্প অভিধা অর্জন করে। সোমনাথ তাঁর জীবন জুড়ে ছাপাই ছবির করণকৌশলকে নানা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় আয়ত্ত করার সাধনা করেছেন। তাঁর কাজ প্রধানত ইন্‌টাগলিও ধর্মী — তা কাঠখোদাই বা ধাতুতক্ষণ বা ধাতুক্ষরণ যে পদ্ধতিতেই হোক। এই পদ্ধতিগুলিকে তিনি আয়ত্ত করতে শুরু করেছিলেন আর্ট স্কুলে। তাঁর চর্চাকে আরও প্রখর করেন ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুলে শিক্ষকতার চার বছর — ১৯৫৪-১৯৫৮ সালে। তারপর দিল্লির পলিটেকনিককে (যা পরে দিল্লি কলেজ অব আর্ট-এ রূপান্তরিত হয়) তিনি গ্রাফিক বিভাগের প্রধান হিসাবে দীর্ঘ প্রায় ন'বছর এই চর্চাকে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর পর্যায়ে নিয়ে যান। তখন তাঁর লক্ষ্য বিষয় নয়, বিষয়কে ছাপিয়ে শিল্পকর্মকে তার নিজস্ব অধিকারে, রূপরস সৃষ্টির দক্ষতায়, প্রতিষ্ঠিত করা। ড্রয়িং, কাঠখোদাই, এনগ্রেভিং এবং লিথোগ্রাফ বা পাথরছাপের কাজ তাঁর চলতে থাকে প্রায় একই সঙ্গে। দিল্লির আর্ট কলেজে তিনি কাজের পরিবেশ পেয়েছিলেন, পেয়েছিলেন ভবেশ সান্যাল, শৈলজ মুখার্জি, দিনকর কৌশিক, ধনরাজ ভগত, বীরেন দে, জয়া আপ্পাস্বামীর মতো শিল্পীদের সঙ্গ ও সাহচর্য। দিল্লিতে থাকতে থাকতে কাজের মধ্য দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে বিষয়কে শিল্পপ্রকরণের জানা আভরণে বিভূষিত করা রসসৃষ্টির চরম নয়, প্রয়োজন বিষয়কে ছাপিয়ে যাওয়া। তাঁর শিল্পীজীবনের প্রথম পর্বে বিষয়বস্তুর প্রাবল্যে অধিকাংশ ছবিই যতখানি সেন্টিমেন্টাল বা উচ্ছ্বাসপ্রবণ ততখানি রসোপলব্ধ নয়। তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সমকালের সামাজিক দাবিই তাঁকে চালিত করেছে বেশি, ছবির নিজস্ব দাবি তাতে তেমন পূরণ হতে পারেনি। এই অতৃপ্তি থেকে ছবির নতুন দিগন্তের দিকে এগোতে সচেষ্ট হন তিনি। কিন্তু এই মানসিক স্তরেও তিনি মনের পরিতৃপ্তি খুঁজে পাচ্ছিলেন না, তাই হঠাৎই দিল্লি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কেন, তার উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন:

"দিল্লীতে থাকাকালে আমি বিষয়কে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু বিষয় আমাকে ছাড়েনি। পঞ্চাশের মন্বন্তরের যে ক্ষত, যুদ্ধের যে অমানবিকতা, ছেচল্লিশের দাঙ্গার বীভৎসা — এগুলি আমার আঁকার পদ্ধতিতে খোদিত হয়ে যাচ্ছিল, আমারই অজানিতে। কাঠ-খোদাইয়ে নরুন দিয়ে কাঠ কাটি, ধাতুতলে এসিড দিয়ে ক্ষত তৈরি করি, আগে থেকে কোনো প্রাথমিক খসড়া ছাড়াই এই কাটাকুটির কাজ চলে, পরে অসংখ্য ক্ষত একটি মাত্র বিষয়ের ইঙ্গিত বয়ে আনে; তা হল আমাদের চারিপাশে যারা অসহায়, পরিত্যক্ত, নিরন্ন, তাদের অবয়ব। দুর্ভিক্ষের ছবি দিয়ে যে খড়ি হাতের আঙুল পেরিয়ে হৃদয়ে দাগ কেটে ছিল, তার দাগ আর মিলাল না। দিল্লীর কাজ হঠাৎই একদিন ছেড়ে দিলাম। কর্তৃপক্ষ ছাড়তে চান নি। কিন্তু তখন আমি রুদ্ধশ্বাস দিল্লির সামগ্রিক পরিবেশ আমার অসহনীয় হয়ে উঠেছে।

রেবা এবং তিন বছরের কন্যা চন্দনাকে নিয়ে নিঃসম্বল অবস্থায় কলকাতায় আশ্রয় নিলাম।" ....

৫

দু'বছর কলকাতায় অনিশ্চিত অবস্থায় কাটানোর পর বন্ধু, দিল্লি আর্ট কলেজের একদা সহকর্মী, দিনকর কৌশিকের আহ্বানে, কিছুটা সংশয় নিয়েই, সোমনাথ বিশ্বভারতীর কলাভবনে গ্রাফিক বিভাগের দায়িত্বে শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯৬৯ সালে। তখন কলকাতায় রাজনৈতিক নৈরাজ্য চলছে, শুরু হয়েছে আদর্শের দ্বন্দ্ব। সন্ত্রাস তার যাত্রা শুরু করেছে। এই সময় শান্তিনিকেতনের পরিবেশে এক অন্য ধরনের মুক্তির স্বাদ পেলেন তিনি। এখানকার খোলা মাঠ, নীল আকাশ, গ্রাম্য নির্জনতা তাঁকে দিল্লি আর কলকাতার নাগরিক সংঘর্ষময় জীবনের পর নতুন মন নিয়ে কাজ করার প্রেরণা যোগাল। তিনি মন দিয়ে রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, বিনোদবিহারী আর রামকিংকরের কাজ গভীরভাবে অনুধাবন ও উপলব্ধি করলেন। এঁদের ছবি বা ভাস্কর্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনও কাহিনি বলে না, কিন্তু রূপকলার ভাষায় কথা বলে; যা শুনে নয়, দেখে শুনতে হয়, যার আবেদন চক্ষু ইন্দ্রিয়ের গোচর, এবং হৃদয়স্পর্শী। দিল্লির দ্রুতলয়ের জীবনের বাহ্যিক প্রকাশ নেই শান্তিনিকেতনে। কিন্তু তার প্রাকৃতিক পরিবেশে, স্থাপত্যে আর ভাস্কর্যে, সংগ্রহশালার ছবিতে, আর রবীন্দ্রনাথের গানে তাঁর মন নতুন করে রসসিক্ত হল।

শান্তিনিকেতনে বাস সোমনাথের পক্ষে, তাঁর সৃজনশীলতার পক্ষে ফলপ্রসূ হয়েছে। বিশেষ করে দুই মহান শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও রামকিংকর বেইজের উপদেশ ও উদাহরণ তাঁর রসসৃষ্টিকে আরও প্রসারিত করল, গভীরতার দিকে নিয়ে গেল। তিনি আকৃষ্ট হলেন, তাঁর সহজাত প্রবণতাতেই, বীরভূমের গরিব সাঁওতালদের জীবনের দিকে, বাউল আর বাজিকরের দিকে, গৃহপালিত শুয়োর আর রাস্তার কুকুরের দিকে। তাঁর সংবেদনশীল সত্তা কালিকলমে, পাথর ছাপে, ধাতুক্ষরণে ও ধাতুতক্ষণে, প্রধানত রেখার সাহায্যেই ধরে রাখতে থাকল সেখানকার সাধারণ স্থানীয় মানুষের জীবনধারাকে। সারা জীবন ধরে যেমন, শান্তিনিকেতনেও তাঁর প্রধান উপজীব্য হল মানুষ—অসহায়, দুর্দশাগ্রস্ত, দরিদ্র মানুষ। শান্তিনিকেতনে থেকেও তাঁর ছাপাই ছবির তালিকায় গুরুত্ব পায়নি তার দিগন্তবিস্তারী নিসর্গ। পায়নি সেই নিসর্গের নানান বর্ণ।

যাটের দশকের শেষ থেকে প্রায় সমস্ত সত্তর দশক জুড়ে পশ্চিমবঙ্গের সমাজজীবন যে এক ধরনের অর্থহীন হানাহানির রাজনীতিতে, অযথা অসংরক্ষিত মানুষের জীবনযাত্রাকে সন্ত্রাসে বিপর্যস্ত করে তুলল, তা সোমনাথকেও গভীরভাবে নাড়া দিল। এই খুনোখুনির পরিস্থিতিতে তাঁর মধ্যে ফিরে এল ক্ষতচিন্তা। এক নতুন মাধ্যমে এই ক্ষতকে ধরে রাখতে থাকলেন তিনি। তিনি লিখছেন: "রাস্তায় চাকার গভীর দাগ, গাছে কুঠারের কোপ, আর মানুষের দেহে অস্ত্রাঘাত সবই আমার চোখে ক্ষতরূপে দেখা দিল। এই ক্ষতচিন্তা থেকে আমার সাদার উপরে সাদা কাজগুলির জন্ম। এগুলি আপাত বিমূর্ত; কিন্তু এগুলি তৈরি হয়েছে প্রকৃত ক্ষত যে ভাবে তৈরি হয় সে ভাবে। মাটির পাত কিংবা মোমের পাতে নানা অস্ত্রের সাহায্যে; কখনও আগুনে ঝলসে নিয়ে। পরে সিমেন্টের ছাঁচ তৈরি করে তা থেকে ছাপ নিয়েছি। সমগ্র প্রক্রিয়ার পূর্ণপরিণতির জন্য বিপুল পরিশ্রম করতে হয়েছে। কারণ আমার সামনে কোনো পূর্ব উদাহরণ ছিল না, ছাঁচের উপরে কাগজের মন্ড বিছিয়ে প্রকৃত হাতে-তৈরি-কাগজ বানাতে হয়েছে, প্যাপিয়ে মাশে বলতে যা বোঝায়, তা নয়; আসল হ্যান্ডমেড পেপার। এর ফলে কাগজের বিস্তারে এক ধরনের টেনশন তৈরি হয়, যা প্রথানুসারী ছাপচিত্রে পাওয়া যায় না। প্রায় ১৩/১৪ বছর এই প্রথায় বেশ কিছু কাজ করি। কিন্তু শারীরিক ক্ষমতার কমতির কারণে এই মাধ্যম ছেড়ে দিতে হয়।"

সাদার ওপর সাদার এই কাজগুলোতে সমন্বিত হয়েছে সোমনাথের করণকৌশলগত দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর উদ্ভাবনী ক্ষমতা। কিন্তু এগুলি দেখলে যা মনকে নাড়া দেয়, তা হল এর সৃষ্টি প্রক্রিয়ার টেনশন, শিল্পীর সংবেদনশীল আবেগ। ছাপাই পদ্ধতিতে তৈরি হলেও, এই অনন্যসাধারণ কাজগুলি তাদের স্পর্শগ্রাহ্যতার গুণে রিলিফের মাত্রা অর্জন করেছে সামান্যতম তারতম্যের উত্তল-অবতলের সাহায্যে।

শান্তিনিকেতনের কলাভবনে যোগদানের পর তিনি ছাপাই ছবির ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন অনেক। সরল থেকে জটিল, এবং জটিলতর পদ্ধতিতে কাজ করেছেন, কাঠ ও ধাতুতলে, ইন্‌টাগলিও-র ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন সূক্ষ্মতার দিকে। কিন্তু এই সাদার ওপর সাদা কাজগুলোর পর তিনি তাঁর পঞ্চাশ বছরে ঝুঁকলেন ভাস্কর্যের দিকে — এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে।

৬

সোমনাথ প্রধানত তাঁর স্কেচ, ছাপছবি এমনকী ম্যুরাল করেছেন দ্বি-মাত্রিকতার শর্তে। কলাভবনের স্টুডিও-র দক্ষিণ দিকের দেয়াল জুড়ে তাঁর যে বিশাল ম্যুরাল, যাকে তিনি ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত করেছেন কী আঙ্গিকে কী রূপে, যেখানে বিষয় হিসাবে দেখি শাসক ও শাসিতদের চিরন্তন বিপরীত চেহারা, সেখানেও তাঁর ভাবনা রূপ লাভ করেছে ভূমির সমতলে। দৃশ্যে নেই পরিপ্রেক্ষিত এবং উপস্থাপিত অবয়বগুলিতে নেই বর্তুলতার আভাস। দ্বিমাত্রিকতার প্রতি এই পক্ষপাতে বহুদিন কাজ করে তিনি পরিণত বয়সে শুরু করলেন ভাস্কর্য। ছাপাই ছবির কায়িক শ্রম আর বহন করতে না পারাই তার প্রাথমিক কারণ। প্রথমে ছোট ছোট মোমের মূর্তি রচনার মধ্য দিয়ে নিজেকে ত্রিমাত্রিকতায় প্রকাশ করতে করতে তিনি বড় ভাবে ভাবতে শুরু করলেন। আর্মেচার বেঁধে তার ওপর মোমের মূর্তি তৈরি করে ঢালাইয়ের মাধ্যমে ভাস্কর্যের পথে এগোলেন তিনি। এ কাজে তাঁর সহায় হলেন ভাস্কর প্রভাস সেন ও বিপিন গোস্বামী।

সেই সময়, ১৯৭৫-এর মে মাসে, দীর্ঘ উনত্রিশ বছর ধরে এক অসমশক্তির দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ভিয়েতনামের মানুষ আমেরিকাকে বিপর্যস্ত করে জয়ী হল। পশ্চিমবঙ্গের সমাজবাদী মানুষ এই দীর্ঘকাল ধরেই নানা আন্দোলনের মাধ্যমে শরিক হয়েছেন এই দুর্জয় সংগ্রামের। দূরে দূরে থাকলেও, ভিয়েতনামের

মহান সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হয়েছেন সোমনাথ। তাই তার জয়কে বন্দিত করতে, তার শত-সহস্র ক্ষতকে এক স্থায়ী রূপ দিতে তিনি এক বড় পরিকল্পনার ভাস্কর্য রচনা করলেন — এক বিদীর্ণ বক্ষ-উন্নতশির মা আর তাঁর বুক-আঁকড়ে থাকা শিশু। নাম দিলেন 'ভিয়েতনামের ক্ষত' (১৯৭৭)। এই অসাধারণ কাজটি করতে তাঁর সময় লেগেছিল প্রায় আড়াই বছর। আমাদের দুর্ভাগ্য, কলাভবনের এক গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মূর্তিটি সম্পূর্ণ হবার পর প্রথম রাত্রেই (৩ রা ডিসেম্বর) চিরতরে চুরি গেল চল্লিশ ইঞ্চি উঁচু, চল্লিশ কেজি ওজনের, সোমনাথের সম্ভবত সব থেকে স্মরণীয় ভাস্কর্যটি। কাজটি নেই, আজ তার ছবিই কেবল সম্বল। সেই ছবি দেখলেও বোঝা যায়, বিশ্বাস আর চেতনার কোন গভীরতা থেকে রূপলাভ করেছিল এই মূর্তিটি।

সোমনাথ কলাভবন থেকে অবসর নেন ১৯৮৩ সালে। তিনি তখন স্থায়ীভাবে বাড়ি তৈরি করে বাস করছেন লালবাঁধ গ্রামে সেখানকার মানুষদের একজন হয়ে। এই বাড়িটা বসত বাড়িও বটে স্টুডিও বটে। আড়ম্বরহীন ব্যবস্থায় তিনি, স্ত্রী রেবা ও কন্যা চন্দনা, যে এতদিনে বড় হয়ে উঠেছে, রূপকলা সৃজনে ব্যস্ত থাকেন। এখানে সোমনাথ তাঁর ছাপাইযন্ত্র ছাড়াও তৈরি করলেন মূর্তি ঢালাইয়ের কারখানা। স্থানীয় কয়েকজন তরুণকে শিখিয়ে নিয়ে প্রধানত ভাস্কর্য রচনাতেই ব্যস্ত থাকলেন অবসর জীবনে। সৃষ্টি হল ছোট বড় অনেক কাজ। 'ভিয়েতনামের ক্ষত' বা 'বোমায় দীর্ণ পরিবার'-এর মতো বড় মূর্তিগুলি তৈরি হল টুকরো টুকরো ধাতুপাত জুড়ে জুড়ে। এমন ভাবেই রচনা করলেন অনেক মূর্তি। এই মূর্তিগুলির মধ্যে পাওয়া গেল তাঁর 'ক্ষত' থিমের এক নতুন রূপব্যাখ্যা, ত্রিমাত্রিকতায়। এদের নান্দনিক প্রকৃতি প্রচলিত ধারার আধুনিক ভাস্কর্য থেকে সম্পূর্ণভাবেই ভিন্ন, এমনকী এদের করণকৌশলও, তবু, তাঁর সংবেদনশীল ভাস্কর্য অভিনন্দিত হল সমকালীন ভাস্করদের দ্বারাও — মূর্তি শিল্পের ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য। বাস্তবিকই, তাঁর ক্ষুধার্ত কুকুর, শীর্ণকায় মানুষ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি ও অন্যান্য ভাস্কর্যরূপগুলি সমকালীন ভারতীয় ভাস্কর্যের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

৭

সোমনাথ হোর তাঁর আশি বছর বয়সে শিল্পী হিসাবে পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন। সারা জীবন এক সৃজনশীল প্রতিভার অতৃপ্তি নিয়ে কাজ করে গেছেন, অনেক কাজ। রূপকলার নানান মাধ্যম আয়ত্ত করেছেন নিষ্ঠা ও শ্রমে। সারা ভারতে আজ তিনি এক অগ্রণী শিল্পীর মর্যাদা অর্জন করেছেন। তাঁর কাজ বিদেশেও নন্দিত হয়েছে। সর্বভারতীয় কলাশিল্প পুরস্কার পেয়েছেন কয়েক বার - এক বার পেইন্‌টিং-এর জন্যও।

নানা আঙ্গিকে কাজ করলেও তাঁর প্রধান পরিচয় আজকের ভারতের এক শ্রেষ্ঠ ছাপাইছবির শিল্পী হিসাবে। দেড়শো বছর আগে যখন কলকাতায় সরকারি আর্ট স্কুল স্থাপিত হয়, তখন থেকেই ছাপাই ছবির চর্চা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শশীকুমার হেসের গুরু ওলিন্টো গিলার্ডির মতো শিল্পী করেছেন এন্‌গ্রেভিং প্রিন্ট। তারপর গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, মুকুল দে, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, রামকিংকর বেইজ ও আরও অনেকেই করেছেন ছাপা ছবি। কিন্তু তাঁদের শিল্পী পরিচয় চিত্রকলার জন্য। আধুনিক কালে সোমনাথ এই ছাপাই মাধ্যমকে, তার ভাষাকে, এমনই সমৃদ্ধ করেছেন যে এখন অনেক নতুন প্রতিভা এ পথে এগোচ্ছেন। একটি ছবির ভাষাকে এক জীবনে এতখানি প্রসারিত করা নিঃসন্দেহে মস্ত কীর্তি। কিন্তু এই করণকৌশলগত দক্ষতা ও উদভাবনই তাঁকে আজকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেনি। তাঁর গভীর কালচেতনা, অসহায় নিপীড়িদের সঙ্গে একাত্মবোধ আর শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতি বিশ্বাসই তাঁর ছবির কনসেপ্ট বা কন্‌টেন্ট হয়ে তাঁর ভাষাকে অর্থবহ করেছে। তাঁকে শিল্পী হিসাবে সমকালে দিয়েছে বিশিষ্টতার পরম স্বীকৃতি।

সোমনাথের মধ্যে সমন্বিত হয়েছে সংবেদনশীলতা ও মননশীলতা। তাই তিনি ক্রমশ আবেগের স্তর, প্রচারধর্মিতার স্তর অতিক্রম করে রসসৃষ্টির স্তরে পৌঁছেছেন। তবে সেই রস প্রধানত 'করুণ' হলেও এক অন্য আবেগের, অন্য উপলব্ধির স্বাদ সৃষ্টি করে। এই আবেগ, এই স্বাদ প্রধানত রূপ লাভ করেছে তাঁর টান টান, সেতারের তারের মতো রেখার তীব্রতায় ও ছন্দে। এখানেই তাঁর অনন্যতা, এখানেই তিনি সমকালীন হয়েও ভবিষ্যতেরও প্রতিনিধি।

সোমনাথ হোরের শিল্পীজীবনকে অনুসরণ করে, তাঁর সারা জীবনের কাজকে অনুধাবন করে একটা কথাই মনে হয় : এ সব কাজের বিশেষ তাৎপর্য সোমনাথের কাজ বলেই। তাঁর ধারার কাজে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁরই বিশিষ্ট গণমুখী শিল্পীব্যক্তিত্ব, দুর্লভ মিলন ঘটেছে তাঁর ধ্যান ও মননশীলতার, কালচেতনা ও মানবিকতার, করণকৌশলগত নিপুণতা ও সুসংযত নান্দনিকবোধের।

তথ্যসূত্র :

১। *Somnath Hore* : Pranabranjan Ray, Lalit Kala Academi, New Delhi.

২। *Wounds*, Somnath Hore, Calcutta, 1991.

৩। *আমার চিত্রভাবনা*, সোমনাথ হোর, কলকাতা, ১৯৯১।

৪। *তেভাগার ডায়েরি*, সোমনাথ হোর, কলকাতা, ১৯৯১।

৫। "চিত্তপ্রসাদ", সোমনাথ হোর, চিত্তপ্রসাদ রচিত *ক্ষুধার্ত বাংলা* (অনুবাদ: শোভনলাল মুখোপাধ্যায়)-এ সংকলিত, কলকাতা, ২০০২।

ছোট্ট পৃথিবীটা

কৃষ্ণ ধর

তুমি বলছ পৃথিবীটা তো ছোট্ট হয়ে এল
হাতের মুঠোতে, বসবার ঘরের জানালা দিয়ে ঢুকে
কখন যে একেবারে পাশটিতে এসে বসে আছে।
আমি ভাবতুম তুমি বুঝি ছেলেবেলার কথা বলছ
তখন তো রামধনুর রং এসে মিলে যেত এমনিভাবে
ঘটোপুটি সাঁতারকাটা পুকুরের জলে

আমার কি আর স্বপ্ন দেখার বয়স আছে
কাগজের লণ্ঠন কেবলই দুলছে বাতাসে
তা দেখে বুক টিপ টিপ করছে আমার
সত্যিই যদি পৃথিবীটা ছোট্ট বলের মতো
ক্রিকেটের মাঠে ছক্কার মারে আকাশে ঘুরতে থাকে

তুমি তো কখনও পায়ের তলায় ঘাসের দিকে তাকাওনি
তা হলে দেখতে নক্ষত্ররা সেখানে জোনাকিদের সঙ্গে
গোল্লাছুট খেলতে নামে রাতভর

তোমায় বলছি, আমি কোনও দৌড়ের পাল্লায় যেতে চাইনে
এই গাছপালাগুলির বোবা সংসারে বাস করি
অনেক কথা তো শোনা হল
এখন বধির হয়ে থাকতে ভাল লাগে
না শব্দ, না দৃশ্য, না কোনও কথোপকথন

দ্যাখো, আমাদের ছোট্ট পৃথিবীটা পুব দিকে মুখ করে
নীরবে ছোট্ট একটা প্রার্থনা সেরে নিচ্ছে
ইচ্ছা হয় তাতে দু'চারটে শব্দ যুক্ত করে বলি,
তুমি থাকো পৃথিবী আমাদের একমাত্র জন্মভূমি হয়ে
তোমার উত্তাপ আমাদের শরীরে, আমাদের রক্তের উষ্ণতায়,
বিকল্প নেই তার

নদীর ওপারে

মৃণাল বসুচৌধুরী

যে আগুন চুপিচুপি
ছুঁয়েছিল তোমার নূপুর
পরম আশ্লেষে
যে নখের কারুকাজে
শরীরে মৃদঙ্গ বেজে ওঠে
তার ধর্ম তার অনড় বিশ্বাস নিয়ে
আলোচনা হোক
মেঘের বৃষ্টির
হাওয়ার রোদের ধাতুর প্রেমের
ক্ষুধার তৃপ্তির
রক্ত বা বিপ্লবের ধর্ম নিয়ে কথা হোক
কথা হোক
স্নেহ মায়া
অন্ধকার উজ্জ্বলতা নিয়ে

যতদিন উচ্চকণ্ঠে বলতে না পারো
উন্মাদের কামুকের
বন্দুকের বারুদের
সঠিক ধর্ম কি
ততদিন বন্ধ রাখো সব
হিংসার ধর্ম কিংবা
ধর্মের হিংসা নিয়ে
বন্ধ করো অন্ধদের খেলা

পুজোয়
আজানে নয়
নদীর ওপারে দ্যাখো
হাত ধরাধরি করে
শিশুদের সঙ্গে নিয়ে
হেঁটে যায় আল্লা ও ঈশ্বর

স্বাভাবিকে

মতি মুখোপাধ্যায়

দান চায় প্রতিদান, প্রতিশোধ আসে আক্রমণে,
বর্জ্যেতে ভরালে নদী সে ভাসাবে উন্মাদ প্লাবনে।

একে একে দুই হয়, ঘন হলে কখনওবা তিন,
রাতের পরেও রাত, দুঃখী ঘরে আসেনা'ক দিন।

গভীর কটাক্ষে নারী যাকে নিত্য করেছে আহত,
প্রণয় সম্ভাসে লিপ্ত সে হলে কি অপরাধ হত?

জলকণাবাহী মেঘ বাতাসের টানে অসহায়,
কৃষ্ণচূড়া ঝরে গেলে বিজ্ঞানীর কীবা আসে যায়!

স্বপ্নের ভিতরে নামে কোনও দিন নায়েগ্রা প্রপাত
অলীক হোক না তবু সেখানেই পূরণের রাত।

ইতিকথা

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

এই মানব জনম ধুয়ে
বৃষ্টি নামে .....!

জমিন ভেজে সময় ভেজে
আহা! এমন মানব-জমিন!
মানুষের ঘর গেরস্থালির
নানা রঙের কথারাও ভিজে যায়
ভিজে যায় বিরহ-মিলন,
সিন্দুকের দলিল বেনারসি
সিন্দুকের বন্ধকি মাল
সব ভিজে জবজবে!
সুসময় দুঃসময় ধুয়ে একাকার...

জন্মের কবচকুণ্ডলের ভিতর থেকে
বৃক্ষজন্ম, বৃক্ষদের ইতিকথা
লেখা হতে পারে, লেখা হতে পারে
জীবনেরও ঘোর ইতিকথা।

আম ও আঁটি

উৎপল ঝা

সোনালি অহঙ্কার ভরা ঘর
সাতশো স্কোয়ার ফুট ব্যাপ্ত জীবন
মৌজ-ফুর্তি উথলে উঠছে অনুক্ষণ
নিস্পৃহ প্রতিবেশী — তবু সেও উচাটন।

অতর্কিতে একদিন
সমূহ বিন্যাস ঝন ঝন করে ভাঙে
ছেতরে পড়ে থাকে সবজির ঝুড়ি
সবুজ প্রতিভাময়ী ধনে পাতা, পটল উদ্ভাস
জন্ম হবে বলে তৈরি ছিল যারা
ধারালো জিঘাংসায় ফেটে পড়ছে অট্টহাসিতে।

তুলসিটবের পাশে স্তব্ধ সাদা শাড়ি
কেলগ মহিমা ভুলে শিশুটি এখন হাবা
বন্ধ দরজার আড়ালে ঝড়ের গর্জন
এ ধারে বিমূঢ় স্ট্রবেগেস্ট ড্যাডি
নুন-হলুদের অন্ধগন্ধের পাশে
মাথা কুটছে শেষ বেলার দুঃস্থ ট্যাপজল।

ডাইনিং টেবিল আজ রাতে অপার শূন্যতা বুকে
রিমোট ঘুমকি ভুলে২ ক্লান্ত সোনি নিশ্চিন্ত ঘুমোবে
রাতের আঠালো অন্ধকারে কে জানে
কোন শর্তে সন্ধি হবে
শাশুড়ির মতোই ভয়ে সাদা ভোরের সূর্য
উদ্বেগ-শঙ্কায় দম বন্ধ করে বসে থাকবে
আম ও আঁটিতে মিশে যাবে কি যাবে না!

ফুল, এইসব

নাসের হোসেন

পাথর গড়িয়ে পড়ছিল একের পর এক, আর আমি অনবরত
সেটাকে আস্তে আস্তে ঠেলে তুলছিলাম পাহাড়ের চূড়ায়,
যায় সমস্ত পাতা উড়ে, সেইসঙ্গে পাখিদের ডাক, ডাকবিভাগের
কিছু লোক কে জানে কেন বাড়িতে ডেকে ডেকে ফিরে গেছে,
কাল রাতে বাড়ি ফেরার পর সুমিতা বলল, জিজ্ঞেস করলাম
কেন এসেছিল, কিছুই সে বলতে পারল না, আকাশ থেকে
বৃষ্টি, আকাশ ভেঙে নামছে কাচের কুচি, ধুনুচি নাচছে
পাগলের মতো ধোঁয়ার মধ্যে চলন্ত দেবীর মুখোমুখি,
দেবীরা বুঝি সব সময়েই চলন্ত, সব সময়েই জাগ্রত,
তাদের একটু ঘুম এলে কী এমন ক্ষতি, ঘুমন্ত দেবীদের
দেখতে কি খুব বেশি সুন্দর বলে মনে হয়, হয়ত তাই তারা
অনেক সময় জেগেও ঘুমিয়ে থাকে, বিড়ালদের মতো তাদেরও
চোখ ফুটতে দেরি হয় কখনও কখনও, এসব আমাদের জানা,
যেটা অজানা সেটা হল, বাচ্চাদের ক্রিকেটের বল যখন
জানলা দিয়ে এসে তার বুকে লাগে, সে উঠে বসে, চক্ষু
ফোটবার আগেই জানলায় গিয়ে দাঁড়ায়, একবারও
বলে না 'এখানে ক্রিকেট খেলো না, আমার গায়ে
লেগেছে', বরং মিষ্টির প্যাকেট ছড়িয়ে দেয় তাদের দিকে
হয়ত তা ফুল, এইসব ফুল পাথরের দেশে জন্মেছিল

হে সমষ্টি

অতনুশাসন মুখোপাধ্যায়

হে সমষ্টি, তেজোদৃপ্ত বীর — সর্বশক্তিমান
যে সামান্য ভ্রূণ থেকে উঠে আসা —
ধরো, যদি তাদের সৃষ্টিই না হত?
অতএব, জন্মানোর অর্থই সৃষ্টিশীলতা।
হে সমষ্টি, তোমার কত রঙ্গ, কত লীলা, বোধ, বৈপরীত্য!
এক বোধে, ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্টের লড়াই
লাগাও
অন্য বোধে, সে লড়াই থেকে বাঁচাতে
ভাগ্যান্বেষণে পাঠিয়ে দাও সুদূর পশ্চিমে,
নরখাদকের ভূখণ্ডে।
বিবর্তন—সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট্—
এই হরিনাম জপতে জপতে
কয়েকশো বছর বাদে বড়দাদার সঙ্গে দেখা
চোখ মটকে বড়দাদা বলেন — মানবি নাকি
মানাব?
অহো, কী তোমার রঙ্গ!
হাজির কর মদমত্ত কত বীর — যেন প্রোসেনিয়ম
মঞ্চের নায়ক
বীর রসাত্মক অ্যাকশন আর সংলাপ
দর্শক যখন আর নিল না— জেহাদ
অ্যাই ব্যাটা ফ্যাসিস্ট্! ইউরোপ তোমার?
পৃথিবীর রাজা হবার খোয়াব তোমার ঘোচাচ্ছি।
কয়েক অঙ্কের নাটক খতম। দর্শক তোমার তারিফ
করল।
সামাজিক বিবর্তন, বিপ্লব — ইতিহাসের হাজারো
সোপান।
কত রস সৃষ্টি করলে হে রসিক!
ধ্বংসরস, পরমাণুরস, ধর্মরস, বর্ণরস, মায় হালফিল
গ্লোবরস
রসশাস্ত্রজ্ঞর অভিধানের নতুন এডিশন ছাপতে গেল
বুঝি!
কত সোচ্চার মতাদর্শ — আদর্শ বনাম আদর্শ
এই তো ক'দশক আগে — চিনের চেয়ারম্যান
আমাদের চেয়ারম্যান
চেয়ারম্যানের চেলাদের চোখ রাঙানি, গুম, খুন, এই
নিবি, সেই নিবি —
এখন চেয়ারম্যানের স্বজাতিদের চেয়ারের পায়া বড়
জোর তিববতীদের কাঁধে।
হে সমষ্টি, তোমার বোধ আর বোধান্তর কতগুলো মানচিত্র
চেনাল
কোনওটা নিমকি, কোনওটা সিঙাড়া, কোনওটা
খেসারির বড়ির আকার
ক্ষেত্রবিশেষে, যদি বিপরীত বোধ বা বিপরীত
বোধান্তর
কিংবা ভাবলেশহীন ভাবান্তর ঘটত
ঘটলে, সেটাও স্বাভাবিক হত—
তা হলে তো নিমকি হ'তে পারত অন্য কিছু
সিঙাড়া বা বড়ি তথৈবচ।
হে সমষ্টি, তোমার রঙ্গ, লীলা, বোধ আর বৈপরীত্য
মিলেমিশে যে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করল—
তার সার্বিক ফলশ্রুতির সংগ্রহের তুলনায়
বহু অজিয়াস রাজার বহু তিন হাজার গোশালার
বহু তিরিশ বছরের জমে থাকা আবর্জনা, নস্যপ্রমাণ।
যদি খুঁজে পাও লাখ লাখ হারকিউলিসকে —
ওদের কাজে লাগিয়ে দাও।
লক্ষ লক্ষ আলফিউস নদীর বাঁক ঘুরিয়ে
তোমার কীর্তির গায়ে লেপটে থাকা পূতিগন্ধ
ওরা ধুয়েমুছে সাফ করতে থাকুক।
হে সমষ্টি, অন্তত কিছুদিনের জন্যে বলো —
রান, রান, রান, স্ট্যাচ্যু।
জপ করো — সব ভ্রূণই তো অভিন্নরূপী।
দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকো—
ওই তোমার হারকিউলিসরা এখন আতর ছড়াচ্ছে,
গোলাপজলের ছড়্ড়া দিচ্ছে —
ওই বুঝি পুরো রিওয়াইন্ড হয়ে গেছে—
এখন ভ্রূণের কাছাকাছি।

সম্রাটের উদ্দেশে

রজতশুভ্র মজুমদার

সম্রাট,
আজ অমানিশার রাতে তোমার আকাশ থেকে
লাল বনমোরগের গায়ে হিরণ্ময় বালিয়াড়ির
ওপর তোমার মারণ অস্ত্র পড়ে —
তোমার জিঘাংসার বিষে আচ্ছন্ন হয় নদীতটে
মহুয়া-জাম-হরিতকীর শাখা যারা চাঁদনি রাতে
রূপকথার গল্প তৈরি করত একদিন —
তোমার ঘাতকী হুঙ্কারকে ঘরে ফেরার পথে
সন্ধেবেলার শাঁখ মনে করে চঞ্চল ছাতারে পাখির ঝাঁক —
তাদের রক্তের নজরানায় তোমার স্কাড-টমাহক
অনন্ত নক্ষত্রবীথির প্রেরণা পায়

হে মহারাজ,
নদীর হু হু বাতাসে নিয়ত ঢেউয়ের
ওঠাপড়ার সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছে যে ক্ষুধার্ত জলমোরগ —
হলুদ বালুকাবেলায় নতুন স্বপ্নে বিভোর
যে প্রথম-ফুল-আসা আকাশমণি—
তারা তো কোনও দোষ করেনি!

প্রবন্ধ

প্রসঙ্গ : প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবন

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়ে লিখতে গেলে পরিবেশ বিজ্ঞান কী, তার গুরুত্ব কী, সে বিষয়ে সূচনায় কিছু বলে নেওয়া দরকার। অনেকের ধারণা, পরিবেশচর্চা মানে শুধুমাত্র দূষণপ্রতিরোধ চর্চা। এ ধারণা ভ্রান্ত। পরিবেশচর্চার ব্যাপ্তি জীবন ও তার সমগ্র জাগতিক পরিমণ্ডলে। পরিবেশ আলোচনায় পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের যোগসূত্রগুলি এসেই পড়ে। তা ছাড়া, কারিগরি প্রকরণের ফলাফল প্রসঙ্গ পরিবেশ প্রশ্নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জগতের সমস্ত পদার্থ ও জীবজগতের মধ্যে অবিরাম যে আদান-প্রদান, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ঘাত-প্রতিঘাত চলছে, তা বুঝতে চাওয়ার মধ্যে আছে পরিবেশ বিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগের দিশা। যাঁরাই সম্যকরূপে পরিবেশবিজ্ঞান চর্চা করেছেন, তাঁরাই বুঝেছেন প্রাকৃতিক ব্যবস্থার মধ্যেই জীবনপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যথাযোগ্য সম্পদের আয়োজন আছে। প্রকৃতির নিয়ম পালন করে চললে সমাজে অনটনের কোনও সম্ভাবনা নেই। অবশ্য তাতে অতি-প্রাচুর্যের ব্যবস্থা নেই; তা থাকলে দায়িত্বজ্ঞানহীন ও বেহিসাবি খরচের অবকাশ থাকত। প্রকৃতি-সহযোগী পন্থা গ্রহণ করলে স্বাস্থ্যসম্মত পরিমিত চাহিদা মিটবে, আবার যে দূষণকে বিশ্লেষণ করা বা সমাহিত করা যায় না, সে প্রকার বা সে পরিমাণ দূষণ সৃষ্টিই হবে না।

পরিবেশ বিজ্ঞান উন্নত সভ্যতাস্থাপনের দিগদর্শন

পরিবেশ চর্চার আর এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। তা নূতন সভ্যতা গড়ার পথ দেখায়। লোভাতুর, আগ্রাসী সভ্যতা পরিহার করে সর্বজনীন কল্যাণভিত্তিক সভ্যতা পত্তনের পথনির্দেশ করে। স্কুল-কলেজে যে পরিবেশ বিজ্ঞান পড়ানো হয় তাতে অবশ্য এ তাৎপর্যের উল্লেখ থাকে না। তবু-ও কথাটা সত্য।

কীভাবে আমি এই উপলব্ধিতে পৌঁছলাম, তার একটু ইতিহাস এখানে বিবৃত করব বিষয়বস্তুর স্বার্থেই। সকল রাজনীতিক, সমাজসেবী ও চিন্তাবিদের কাছে আমি এই সত্য উপলব্ধির বিবরণ নিবেদন করতে চাই বিশেষ প্রয়োজনে। ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৬ সালের শেষভাগ পর্যন্ত আমি ছিলাম অবিভক্ত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি দপ্তরের অর্থনৈতিক ভারপ্রাপ্ত কর্মী। আবার ১৯৫৫-৫৬ সালে উক্ত পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তরে অর্থনৈতিক ইউনিটের সম্পাদক। স্ট্যালিনের একনায়কত্বের ঘটনা ১৯৫৬ সালে যখন স্বীকৃত হল, তখন কীভাবে এটা সম্ভব হল এ প্রশ্নের উত্তরে কমিউনিস্টরা "সেখানে ব্যক্তিপূজা ঘটেছিল" এই ব্যাখ্যা দিয়েই নিশ্চিন্ত হলেন। আমি এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট থাকতে পারিনি। কেন এই ব্যক্তিপূজা ঘটতে পারল, কেন এই জবরদস্ত শাসনের বিরুদ্ধে দেশের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ গড়ে উঠতে পারল না, সে প্রশ্ন আমাকে সতত বিদ্ধ করতে লাগল। কয়েকটি ঘটনায় আমার চোখ একটু খুলে গেল। সমস্ত উৎপাদনযন্ত্র জাতীয়করণের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষমতা সেখানে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল আর একচেটিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতার একচেটিয়াত্ব তো ছিল-ই; এই দুই প্রকার ক্ষমতা একই হাতের মুঠোয় এসে পড়ায় সেখানে প্রতিকারহীন একনায়কত্বের সৃষ্টি হতে পেরেছিল। তখন থেকে ম্যানেজমেন্টের বিকেন্দ্রীকরণ, ক্রেতা-সংস্থা (Consumers' Council), সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতার উপর আমি জোর দিতে শুরু করলাম কিন্তু সে দিকে পার্টি নেতৃত্ব কোনও গুরুত্ব দিল না। ফলে ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ফিরেই আমি পার্টির প্রাথমিক সভ্যপদ থেকেও ইস্তফা দিলাম।

তার কিছুদিন পরে আমার চিন্তাধারা আর একটু এগিয়ে গেল। আমার প্রতীতি হল যে জীবদেহে যেমন acid, alkaline ও neutral এর সমাবেশ আছে, সমাজের উৎপাদনব্যবস্থায় সেইরূপ সরকারি, বে-সরকারি ও সমবায়ী উদ্যোগের প্রয়োজন আছে সর্বোত্তম উৎপাদন লাভের ও সমাজের ভারসাম্য রক্ষার কারণে। এই উপলব্ধিতে মনে কিছুটা সন্তোষ এল বটে কিন্তু মনে মনে বুঝলাম, আমার মূল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর এখন পাওয়া যায়নি।

তারপর প্রায় তেরো বৎসর ধরে ধ্যানে-জ্ঞানে এক প্রশ্ন আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল: "যে ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল উন্নত এক মানবসভ্যতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে, তা কেন রাষ্ট্রকেন্দ্রিক (Statist) ব্যবস্থায় পর্যবসিত হল? পুঁজির-সম্বলহীন দরিদ্র মানুষের মুক্তি কীভাবে আসবে? ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রুটি-রুজির স্বাধীনতার সমন্বয় কীভাবে সম্ভব হবে?" ইতিমধ্যে পেট্রোলিয়াম, কয়লা ও নিউক্লিয়ার, এই তিন উচ্চশক্তির ক্ষেত্রগুলিতে আমার বিচরণ ভালভাবেই ঘটে গিয়েছে। কয়লা ও পেট্রোলিয়াম যে

চিরস্থায়ী নয় এবং তার প্রয়োগে যে দূষণ সৃষ্টি হয়, সে বিষয়ে আমার সমাকধারণা হয়েছে, নিউক্লিয়ার শক্তির উৎপাদন প্রক্রিয়া যে কী বিপদ ঘটাতে পারে, তা-ও বেশ বুঝেছি। তা ছাড়া বুঝেছি, বিশাল পুঁজি ব্যতীত এই সব শক্তির উৎপাদন সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের মালিকানায় এদের উৎপাদন কদাপি সম্ভব নয়। তদুপরি পেট্রোলিয়াম কিংবা কয়লাজাত রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে খেতি জমির বন্ধ্যাত্ব, খাদ্যে বিষবিকার, জল ও বায়ুর দূষণ প্রত্যক্ষ হয়েছে; সুতরাং এই প্রকার শক্তির (Energy) উপর এবং তৎ-সঞ্জাত feedstock -এর উপর প্রধানত নির্ভর করলে যে সাধারণ মানুষের মুক্তি কোনওদিন আসবে না — এ পন্থায় হয় বিরাট বিরাট কোম্পানির হাতে ক্ষমতা চলে যাবে নতুবা রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা চলে যাবে — এই উপলব্ধি দৃঢ় হল।

এই সময় চোখে পড়ল আমার গ্রামের দাদা-চাচা কলেজি শিক্ষা ব্যতিরেকে এঁদো পুকুরের ভাটকা-স্তরের জল ধানের জমিতে সিঁচাই করে, আর তাতেই ধানের ফসল বাড়ে। বুঝলাম, একেই বলে blue green algae. এরাই পুরাতন পুকুর সংস্কার করে নীচে-জমা পুরু পলিমাটি কেটে খেতের জমি উর্বর করে ; পশুর বিষ্ঠা ও মানবদেহনিঃসৃত মল কম্পোস্ট করে জমিতে সার দেয়। গাছ থেকে যে পাতা পড়ে তা পুড়িয়ে না দিয়ে কম্পোস্ট করলে, কচুরিপানাকে biogas plant -এর মধ্য দিয়ে biogas slury তে পরিণত করলে জমিতে সারের প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে মিটতে পারে। দেখলাম, মেদিনীপুরের এক চাষি Azolla নামক এক fern এর চাষ করে অন্য চাষি ভাইদের মধ্যে বিতরণ করছে মহারাষ্ট্রে এক চাষি জমির এক কোণে কেঁচোর বিপুল বংশবৃদ্ধির সুযোগ করে দিয়ে, পরে সারা খেতে তা ছড়িয়ে দিয়ে প্রচুর ফসল উঠিয়ে নিচ্ছে। পরম্পরা-বাহী চাষিরা ধানের পর কলাই চাষ করে দুই ফসল পায় আবার জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে নেয়। কলাইতরুর মূলে bacteria আছে। এবং তা বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন টেনে নিয়ে মাটিতে প্রোথিত করে, সে কথা বিজ্ঞানের পরিভাষায় তারা না জানলেও আসল কথাটা জানে। বুঝলাম, প্রকৃতির এই সম্পদ সকলের জন্য মুক্ত। কোনও বিত্তশালী ব্যক্তিই এই সম্পদকে কুক্ষিগত করে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করতে পারবে না। যদি প্রকৃতিদত্ত এই সব আরও আরও সম্পদের আবিষ্কার করা যায়, তা হলে তাই হবে মানব-মুক্তির পথে সত্যকারের পদক্ষেপ।

বর্ষাকালে খাল বা জলাভূমি থেকে বেরিয়ে ধানের খেতে মাছ ঘোরাফেরা করলে তাতে ধানগাছের শ্রীবৃদ্ধি হয়; ধানের খেতে যে হাঁস চরে, তা ধানগাছের পোকা খেয়ে আপন পুষ্টিবৃদ্ধি করে আবার আপন পুরীষ দান করে মাছের পুষ্টিসাধন করে। বুঝলাম, প্রকৃতিতে এইভাবে সহযোগ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার (symbiosis antibiosis) সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বিবর্তন ও ক্রমোন্নতির যাত্রা চলেছে। এই বিবিধ সম্পর্কের বাহকদের আবিষ্কার করতে পারলে এবং তাদের ধরনধারণ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করতে পারলে কৃষির উন্নতি অনেক সহজসাধ্য হবে।

সহজাত প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে যে সব গুণ আছে, তাতে কৃষিতে ব্যবহার্য রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন থাকে না; ফলে সেই সব পদার্থের উৎপাদক শিল্পের প্রয়োজন ঘুচে যায়। সৌর শক্তি, বায়ব শক্তি (solar energy and wind energy) এবং microhydel এর মধ্যে বিশাল বিদ্যুৎ উৎপাদন ফ্যাক্টরির বিকল্প আছে; তাতে বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বহু সংখ্যায় বিকেন্দ্রিক/ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলা যায় যার দূষণ সামান্য, সেই শিক্ষার আলোক পরিবেশ বিজ্ঞান থেকেই আসে।

মহামনীষী কার্ল মার্কস প্রকৃতির এই গুণের সন্ধান পাননি। তাই বিশাল শিল্প গঠনে তাঁর সম্মতি ছিল আর কেবল জাতীয়করণের মধ্যে সমস্যার সমাধান ও শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি খুঁজেছিলেন। বিশাল শিল্পের অন্তর্প্রবাহ যে ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের দিকে, সে বিষয়টি তাঁর বিবেচনার বাহিরেই থেকে গিয়েছিল। অবশ্য বিশাল শিল্পের ফলে শ্রমবিভাগ ও বিশেষজ্ঞতার (specialisation) নামে দিনের পর দিন মানুষকে যে বৈচিত্রবিহীন নিরানন্দময় ক্লান্তিকর শ্রমের বলি হতে হয়, তাকে তিনি নরহত্যা (assassination of man) বলে আখ্যা দিয়েছিলেন কিন্তু বিকল্প দিতে সক্ষম হননি। জাতীয়করণের নামে রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা সমর্পণের ফরমুলা হয়েছিল তাঁর একমাত্র সম্বল, যার বিষময় পরিণতি পরে প্রত্যক্ষ হয়েছিল।

চিনের নেতা মাও সে তুং শাসকপার্টি ও রাষ্ট্রশক্তির পদাধিকারীরা যে এক প্রকার ভোগী ও শোষক শ্রেণী হিসাবে গড়ে উঠতে পারে, সে কথা ঠিক-ই বুঝেছিলেন, কিন্তু পরিবেশতত্ত্বের মধ্যে শোষকদের মুঠি আলগা করে দেওয়ার যে সম্ভাবনা আছে, তার সন্ধান না পাওয়ায় কমিউনিস্ট চিন্তাব্যূহের বাহিরে আসতে পারেননি। ফলে চিনে কমিউনিস্ট নেতৃত্বেই ধনতন্ত্রের পুনঃপ্রবেশ ঘটছে।

পরিবেশ বিজ্ঞানের আলোকে বুঝতে পারি যে লেনিন মহাভুল করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের প্রযুক্তিবিদ্যা সোভিয়েট ইউনিয়ন গ্রহণ করবে এবং সেই পথেই যুক্তরাষ্ট্রকে হার মানিয়ে সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা ঘটাবেন। তিনি বুঝতে পারেননি এই প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতিরন্ধ্রে আছে কেন্দ্রাভিমুখিতা, এতে কেন্দ্রের হাতে ক্ষমতা বাড়ে, সাধারণ মানুষের মুক্তির আস্বাদ এতে থাকতে পারে না। আমাদের দেশে গান্ধী কিন্তু এ কথা বুঝেছিলেন। অনেকে তাঁকে "মেশিনারির সম্পূর্ণ বিরোধী" এবং "চরকাস্তরে প্রযুক্তিবিদ্যাকে সীমিত রাখার

পক্ষপাতী" বলে ভুল বোঝেন। বিকাশ ঘটাতে হবে প্রকৃতির সঙ্গে সহযোগের পথে, তাঁর এই কথা সম্পূর্ণ সঠিক। এই পথে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার ও কারিগরির পথ খুলে যাচ্ছে যা অত্যাধুনিক ; Solar cooker ও photovoltaics তার-ই অন্তর্গত।

এই একই কারণে সোভিয়েট ও তৎসঙ্গে বিদ্যুৎ হলেই সমাজবাদ হয়ে যাবে, লেনিনের এই ব্যাখ্যাও ছিল ভুল। সমাজাত্মিক চেতনা এবং তজ্জন্য সরল, অনাড়ম্বর জীবনশৈলীর জন্য আপন আপন অন্তরে সংগ্রামের যে প্রয়োজন ছিল, তার স্বীকৃতি এতে ছিল না। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে জীবনযাপনের আদর্শ না থাকলে ভোগবাদী জীবনধারা এসে যাবেই, তার স্বীকৃতিও ছিল না। জীবনের মান উন্নত করার প্রয়োজন অবশ্যই ছিল সাধারণের জন্য ; কিন্তু সে জন্যই উচ্চশ্রেণীর ভোগাদর্শ খর্ব করার প্রয়োজন ছিল, সে সত্য ছিল অনুচ্চারিত। তা ছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়লেই কি সব কিছু হয়ে গেল ? বিদ্যুৎ যদি বিশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে হয়, তবে ক্ষমতা হবে কেন্দ্রাভিমুখী; কিন্তু সেই বিদ্যুৎ যদি windmills, microhydel biofules সঞ্জাত হয়, তবে তা হবে সাধারণ মানুষের শক্তি জোগাবার হাতিয়ার ও মোটামুটি দূষণমুক্ত। বিকেন্দ্রিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কৌশল গণস্তরে পরিব্যাপ্ত করার ব্যাপারে প্রযুক্তিবিদ্যার যা অপূর্ণতা ছিল বা এখন-ও আছে, সে দিকে দৃষ্টি দিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ক গবেষণাকে অন্য খাতে প্রবাহিত করার প্রয়োজন ছিল। সুখের বিষয়, কায়েমি স্বার্থের বিরোধিতা সত্ত্বেও এখন এ দিকে চেতনা জেগেছে, যার ফলে নতুন নতুন প্রকৃতি-নির্ভর, স্বল্পবিত্তজনসাধ্য প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভব হচ্ছে, যার আলোচনা ভবিষ্যতে করা যাবে।

উপসংহারে এই কথাই বলতে হয়, পরিবেশবিজ্ঞান সর্বজনীন সমৃদ্ধিভিত্তিক উন্নত সভ্যতার চাবিকাঠি। যতই দিন যাচ্ছে, ততই পরিবেশ সম্বন্ধে নূতন আলোক পাওয়া যাচ্ছে, ততই এই প্রতীতি দৃঢ় হচ্ছে। অবশ্য ব্যাপারটা বড় সহজ নয়। এর মধ্যে আছে প্রতি গ্রামে বাণিজ্যিক শক্তির আকর্ষণ প্রতিহত করার চ্যালেঞ্জ কারণ গ্রামের ধনী ব্যক্তিরাও তাদের ধান, গম, সব্জি, দুধ, মাছ বাইরে চালান দিতে চায় অতিরিক্ত লাভের লোভে, গরিব প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে। পরিবেশপ্রেমের মধ্যে নিহিত আছে মানবপ্রেম। আধ্যাত্মিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে পরিবেশপ্রেম, তা মেকি। স্বার্থান্বেষিতাকে বিসর্জন না দিয়ে প্রাণীজগতকে ভালবাসা যায় না। নতুন সভ্যতা গড়ার জন্য চাই পরিবেশতত্ত্বের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার যোগ, বিশ্বপ্রেম যার মূলকথা।

২

গ্রীষ্মপ্রধান ও মধ্য-অক্ষাংশীয় দেশগুলির মধ্যে মৌলিক প্রভেদ

বর্তমান পৃথিবীতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশ বেশ সমৃদ্ধ। তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ যতটা আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি তাদের আয়। কীভাবে এই আয় এল বা এখনও আসছে, তার আলোচনা এখানে নয়। তাদের জীবনযাপনের মানদণ্ড দেখে অন্যান্য দেশের আকাঙ্ক্ষা জাগে ওই মানের জীবনলাভ করতে আর তারা মনে করে ওদের চলা পথে চললে সফল হওয়া যাবে। কয়েক বৎসর পূর্বে এক সমীক্ষায় জানা গিয়েছিল যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা বিশ্বের সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র ৬ শতাংশ কিন্তু তারা পৃথিবীর সম্পদের শতকরা ৪০ ভাগ ভোগ করে। পৃথিবীর সকল দেশই যদি এই মান চালু করতে চাইত, তা হলে সেই সম্পদের যোগান দিতে ছয়টি, অন্য ভাগীদারহীন, পৃথিবীর প্রয়োজন হত। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের পথের পথিক দেশগুলিকে একদিন দুঃখে পড়তেই হবে। সে ঘটনা ঘটবে যখন অন্য দেশগুলি তাদের দেশ থেকে শোষণ করে আনার পথগুলি বন্ধ করে দেবে। সে কথাও আজ আলোচ্য বিষয় নয়।

আজ আমরা আলোচনা করব পশ্চিমী ওইসব দেশের বিকাশ-নামীয় মডেল নিলে সমৃদ্ধির পথে আমাদের আদৌ অগ্রগতি হবে, না বিপরীত ফল ফলবে।

যদি-ও আমাদের এই পৃথিবীকে আমরা মহাশূন্যে উড়ন্ত একটি অখণ্ড জাহাজ বলে জানি আর আমরা পৃথিবীর সকল লোক তারই প্যাসেঞ্জার বলে মানি, তবু-ও বুঝতে হবে যে ওই জাহাজে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ আছে এবং সেখানে বিভিন্ন বিধি চালু আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলির সঙ্গে ওই মধ্য-অক্ষাংশের দেশগুলির প্রকৃতিদত্ত বৈশিষ্ট্যের দুস্তর প্রভেদ আছে। তাদের মাটির বিশেষত্ব, বৃষ্টিপাতের বিশেষত্ব, বায়ুপ্রবাহের বৈশিষ্ট্য, পরাগসংযোগের (pollination) ধরন, শস্যপুষ্টির উপাদানসমূহের মজুদাবিধি সবই পৃথক। আমাদের দেশের সঙ্গে তাদের বৈচিত্রের কোনও তুলনাই হয় না।

পশ্চিম ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকার দেশগুলিতে topsoil অর্থাৎ মাটির উপরিভাগের উর্বর স্তরটি অনেক নিবিড়, প্রচুরপূর্ণ ও বেধবিশিষ্ট। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাপদাহ ও আর্দ্রতার প্রভাবে decomposer ব্যাকটিরিয়ার ক্রিয়া অনেক বেশি, ফলে মাটির উপরিভাগের এই অংশটি অতি ক্ষীণ হয়ে যায়। এই মাটিতে কার্বন (carbon) অতি সামান্য থাকায় তা নাইট্রোজেন ধরে রাখতে পারে না। কেউ যদি এই মাটিতে নাইট্রোজেন-সমৃদ্ধ সার ব্যবহার করে, তাহলে শতকরা ৭০ ভাগ-ই বায়ুমণ্ডলে চলে যেতে পারে। ফল হবে nitrous oxide -জনিত দূষণ। তা ছাড়া মাটির গঠন ও উপাদানের ক্ষতি হবে। ফল হবে বিপরীত।

মধ্য অক্ষাংশের এই দেশগুলিতে প্রায় সারা বৎসর ধরেই মৃদুবর্ষণ চলতে থাকে। সুতরাং মাটি সেই বৃষ্টি ধরে রাখতে পারে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মৌসুমী অঞ্চলে বৎসরে মাত্র চার মাস বৃষ্টি হয়;তার তীব্রতা অনেক বেশি।আবার মাত্র ২০ ঘণ্টার মধ্যে এই চার মাসের সামগ্রিক বর্ষণের অর্ধেকটাই ঘটে যায়; মোট ৩০-৪০ ঘণ্টার মধ্যে তিন-চতুর্থাংশের সম্পাত ঘটে। মুষলধারার এই বৃষ্টি মাটির নীচে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, করার সময়-ই পায় না। শুধু যেখানে বন আছে, সেখানে এই বৃষ্টির অনুশ্রাব্য সম্ভব হয়;ঘন ঘাসের আস্তরণ থাকলেও কিছুটা সম্ভব হয়। ঘনবর্ষণের পর চলতে থাকে বৃষ্টিহীনতার শুষ্ক আট মাস বা অনুরূপ দীর্ঘ সময়, যার ফলে মাটি চৌচির হয়ে যায়। পরে যখন মুষলধারে বৃষ্টি নামে, তখন এই চৌচির মাটি সহজেই স্রোতের টানে ভেসে চলে যায়। মাটির উর্বরতা আরও কমে যায়।

মধ্য-অক্ষাংশের দেশগুলিতে বায়ুপ্রবাহের গতিও বেশি। গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে সে গতিবেগ কখন-ও বেশি, কখন-ও কম, তবে সাধারণত কম। যদিও কালবৈশাখীতে ঝড়ের রুদ্ররূপ মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষ করা যায়।

সবজি ও ফল উৎপাদনে পরাগযোগের (pollination) ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। পরাগযোগ ঘটে দুই এজেন্টের মাধ্যমে—একটি বাতাস, অপরটি পতঙ্গ।এই দুই এজেন্সি উভয় অঞ্চলেই কাজ করে। তবে মধ্য-অক্ষাংশের ওই দেশগুলিতে বায়বীয় এজেন্সির সমধিক প্রভাব আর গ্রীষ্মপ্রধানগুলিতে পরাগসংযোগ ঘটে বেশির ভাগ মৌমাছি ও অন্যান্য পতঙ্গের মাধ্যমে। পশ্চিমী ধরনে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করলে এই সব পতঙ্গ মারা পড়ে। ফলে ফল ও কাঁচা সবজির উৎপাদন কমে যায়।

উপরের বর্ণনা থেকে মনে হবে প্রকৃতি যেন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শুধু অসুবিধাজনক দিকগুলি দিয়েছে। সে ধারণা ভুল। এখানে বজ্রবিদ্যুৎ-পূর্ণ ঝড়বৃষ্টি বেশি, তার সঙ্গে বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন নেমে আসে। সেই জন্য দেখা যায়, এই ধরনের এক পশলা বৃষ্টির পরে একদিনের মধ্যেই গাছগুলি অনেকখানি বেড়ে উঠেছে। তারপর এদেশে কেঁচো (earthworm), পিঁপড়ে ও উপকারী কীটের পরিমাণ অনেক বেশি।এই প্রাণীরা জমির উর্বরতা বাড়ায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে নিশার শিশিরও উর্বরতাপ্রদ। এই সকল কারণে এ দেশে উদ্ভিদের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। তা থেকে কম্পোস্ট বানিয়ে topsoil এর ক্ষয় পূরণ করতে থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

এখানে কেঁচো প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ না করে পারছি না। চার্লস ডারউইন বলেছিলেন 'কেঁচো সভ্যতার সৃজক'। কেঁচো উর্বরতা বৃদ্ধি করলে তবেই কৃষি সমৃদ্ধ হবে; কৃষি সমৃদ্ধ হলে তবে-ই সভ্যতা সমৃদ্ধ হবে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলির আরও প্রভেদ আছে। পুষ্টির উপাদানসমূহ (nutrients) — যথা নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশিয়াম — এ দেশে প্রধানত তরুদেহে সঞ্চিত থাকে; পশ্চিমের দেশগুলিতে সেগুলি থাকে প্রধানত মাটিতে। সেজন্য এ দেশে গাছকাটলে অনেক বেশি ক্ষতি হয়—তাপদাহে মাটি শুকিয়ে যায়, বৃষ্টিতে দ্রুত ভূমিক্ষয় হয়; আর পুষ্টির মূল উপাদানগুলিও চলে যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এদেশে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সৃজনীমূলক ভূমিকা অনেক বেশি। পশ্চিমী ধরনে রাসায়নিক সার ও তার চিরসাথী কীটনাশক ব্যবহার করার যে চেষ্টা এখন এখানে হচ্ছে, তার মধ্যে আছে আপাতলাভের হাতছানিতে চিরন্তনী সর্বনাশের নিমন্ত্রণ। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক পশ্চিমদেশেও ক্ষতি করে। সে দেশে এই ক্ষতি সামলানোর ব্যবস্থা (cushion) বেশি;তাই ক্ষতি হয় অপেক্ষাকৃত মন্থরগতিতে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বৈচিত্রের সমারোহ অনেক বেশি। এখানে অসংখ্য প্রকারের তরুলতা, বহু ধরনের পশুপাখি, অনেক বেশি ধরনের মাছ, চিংড়ি ও অন্যান্য জলজপ্রাণী। এ দেশে প্রাকৃতিক নিয়মে তাদের বংশবৃদ্ধির হারও অনেক বেশি। শুধু tropical মানুষের নয়, মাটির অভ্যন্তরস্থ micro-organisms-এর বংশবৃদ্ধির হারও অত্যন্ত বেশি।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে "Nature has found stability in a longer chain of inter-connectedness" বহু উদ্ভিদ ও প্রাণীর সমাবেশ এই দীর্ঘ, সহযোগী, ধারাবাহিক শৃঙ্খলের কোনও সংযোগ (line) যদি ছিন্ন হয়, তা হলে তার প্রতিক্রিয়া বহু ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়। সে ভাঙন বহু ক্ষেত্রে ধ্বংস ডেকে আনে।

এই সকল কারণে পশ্চিমী ধরনের কৃষি, পশ্চিমী ধরনের শিল্প, পশ্চিমী ধরনে energy উৎপাদন, ব্যবহার ও দ্রুততম পরিবহনের উপর অত্যধিক জোর দিয়ে যাঁরা সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখছেন, তাঁদের অবহিত হওয়া উচিত যে এ পথে সমূহ সর্বনাশ। ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র 'প্রকৃতিবিজয়ী' প্রযুক্তিবিদ্যার দৌলতে অন্য দেশের উপর তাদের বিষান চাপিয়ে আপাত শ্রীবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এরা সবাই এই অতিরিক্ত cushion ভোগী মধ্য-অক্ষাংশের দেশ। জাপানও সেই বলয়ের অন্তর্ভুক্ত। একটি গ্রীষ্মপ্রধান দেশও এ পথে সমৃদ্ধি পাবে না। আমরা যদি এই প্রযুক্তির মোহবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি, তা হলে অসাম্যমূলক যে বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে উপরি উক্ত দেশগুলি আমাদের শোষণ করছে, সে পথ রুদ্ধ হবে। প্রকৃতির রোষে তখন তাদের পরিত্রাণ থাকবে না।

৩

আমেরিকায় টেনিসি নদীর উপর বাঁধ বাঁধার পর থেকে নদীর উপর আড়াআড়িভাবে বাঁধ বাঁধার ঢেউ শুরু হয়। এতে বিদ্যুৎ

উৎপাদন হয় প্রচুর কিন্তু নদীর আয়ু কমে যেতে থাকে। লাভের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হয়। কীভাবে তা হয়, তা পরের সংখ্যায় আলোচনা করব। এখন শুধু এইটুকু বলে ক্ষান্ত হব যে গঙ্গা নদীর বুকে তেহ্‌রির (Tehri) সু-উচ্চ ভূমিতে যে বাঁধ তৈরি সম্পূর্ণ হতে চলেছে, তার মত ভয়াবহ সম্ভাবনা-সঙ্কুল বাঁধ পৃথিবীর কোনও জায়গায় বোধ হয় তৈরি হয়নি। দেশের গণ্যমান্য সকলেই জানেন যে Plant movement -এর ফলে হিমালয় অঞ্চলে ক্রমাগত ভূকম্পন ঘটছে ও উৎক্ষেপণপ্রভাবে হিমালয় ক্রমশ উপরের দিকে ঠেলে উঠছে। এ জায়গায় বড় বাঁধ যারা গড়ে, তারা মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। বাঁধ-বাধা জলরাশির চাপে এই ভূকম্পন-প্রবণ অঞ্চলে মহা-ভূকম্পন ঘটার প্রবল সম্ভাবনা আছে। তবুও বহু খ্যাতিমান ভূবিজ্ঞানীরমতামত উপেক্ষা করে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারগুল সর্ববশক্তিমত্তার ভাণ করছেন। যদি এই বাঁধ ভাঙে তবে কয়েক মিনিটের মধ্যে ঋষিকেশ, হরিদ্বার ও তার চারদিকের বিস্তৃত জনপদ ডুবে যাবে, কোটি সংখ্যক মানুষ প্রাণ হারাবে। এ সব জেনেও রাজীব গান্ধী, বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং, নরসিংহ রাও, অটলবিহারী বাজপেয়ী এই বাঁধ নির্মাণে সম্মত হয়েছেন। একমাত্র ইন্দিরা গান্ধী লিখেছিলেন, "এই বাঁধে কারও উপকার হবে না।" প্রার্থনা করি, ভারতের ভাগ্যে যেন কোনও অঘটন না ঘটে। তবে এখন থেকে উত্তর ভারতবাসীকে সর্বদা দুর্ভাবনার মধ্যে থাকতে হবে। এই দায়িত্বহীন দুঃসাহসী উদ্যোগের মধ্যে যে ধ্বংসের বীজ আছে, সে ধ্বংস কোনও বিদেশি সৈন্যবাহিনীও কল্পনা করতে পারবে না। তৈমুর লঙ্গ, চেঙ্গিজ খাঁর ধ্বংসকাহিনি, কুরুক্ষেত্রের শ্মশানকামিতা ম্লান হয়ে যেতে পারে এ যুগে প্রকৃতি-বিজয় অভিলাষী রাজীব-বিশ্বনাথ-নরহরি-অটলের স্পর্ধিত কর্মে ও বিরোধী পক্ষের মৌন সহযোগে।

গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

গত কয়েক মাস ধরে চতুরঙ্গ দপ্তরের সংস্কারসাধনের কাজ চলার জন্য অস্বাভাবিক দেরিতে বেরল এই সংখ্যা। বাধ্য হয়ে দু'টি সংখ্যা যুগ্মভাবে প্রকাশ করতে হল। এ জন্য আমরা দুঃখিত।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা এখনও যাঁরা দেননি, যত শীঘ্র সম্ভব তাদের তা মিটিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে এ বিষয়ে চিঠি দেওয়া সম্ভব নয়, তাই গ্রাহকদের কাছে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার আবেদন জানাচ্ছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমান সংখ্যাটি অনিবার্যকারণবশত যুগ্মসংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হলেও গ্রাহকেরা শর্তানুযায়ী প্রদত্ত চাঁদায় বার্ষিক চারটি সংখ্যাই পাবেন। অর্থাৎ চারটি সংখ্যার জন্য দেয় টাকা পরবর্তী বছরের হিসাবে যোগ হবে।

বার্ষিক গ্রাহকচাঁদা ৭২ টাকা। বিদেশবাসী গ্রাহকদের চাঁদা US $ 12 "CHATURANGA" নামে স্থানীয় গ্রাহকরা চেক/ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠিতে পারেন।

অনুবাদ গল্প

যাত্রা

মামণি রয়সম গোস্বামী (ইন্দিরা গোস্বামী)

অধ্যাপক মীরাজকার ও আমি কাজিরাঙ্গা অভয়ারণ্য দেখে ফিরে আসছিলাম। আমরা দু'জন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষা বিভাগে কাজ করি। খুব আগ্রহের সঙ্গে আয়োজিত ছাত্রদের এক সভায় আমরা দু'জন নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে এসেছিলাম।

আমরা দু'জন একটি অ্যাম্বেসেডারে গুয়াহাটি অভিমুখে ফিরছিলাম। গাড়িটি ছিল খুব পুরনো। সে জন্য আমরা দিনের আলোয় ফিরছিলাম যাতে গুয়াহাটিতে তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে পারি।

মীরাজকার সাহেবের বাঘ-ভালুকের ভয় ছিল না। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের তিনি বড় ভয় পাচ্ছিলেন। তাঁর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে পাঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদীরা গুলি করে হত্যা করেছিল। পথে তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন:

তোমাদের এই রম্যভূমিতে সত্যি সত্যি সন্ত্রাসবাদের সমাপ্তি ঘটেছে?

আমি এই প্রশ্নটির সঠিক উত্তর দিতে পারিনি।

আসার পথে আমরা বেশ কয়েকটি জায়গায় মিলিটারি চেকপোস্ট পার হয়ে এসেছি। আসার সময় তারা টর্চ জ্বালিয়ে আমাদের তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করেছে। কোন জায়গায় কাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল ড্রাইভারটি আমাদের এই কথা বলছিল।

....অত্যন্ত সুন্দর পথ দিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। দূরের আলোয় ওইগুলি কি বাঁশ? কাজিরাঙ্গার ট্যুরিস্ট লজের বারান্দায় বসে আমি বাঁশ ঝাড় থেকে আসা ঝরঝর শব্দ শুনেছিলাম। মনে হয়েছিল যেন কেউ একটা মুগার কাপড়ের থান খুলে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। .... 'চতিয়না' গাছের বাঁকা হয়ে আসা একটি ডালে খুব বড় একটা পেঁচা বসে ছিল। জ্যোৎস্নারাতে তার গোলমাথাটি সদ্যোজাত শিশুর গোল মাথার মতো দেখাচ্ছিল।

মীরাজকার সাহেবের বদ্ধমূল ধারণা ছিল এই উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদ এখনও শেষ হয়নি। কে যেন তাকে খবর দিয়েছিল জে. কে.এল.এফ ও বাবর খালসার দলের কিছু সন্ত্রাসবাদী এই অঞ্চলের অরণ্যেও ঢুকেছে।

আমি মীরাজকার সাহেবকে বুঝিয়ে ছিলাম — গুয়াহাটিতে পৌঁছুতে আমাদের দেরি হলেও আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সন্ত্রাসবাদ আস্তে আস্তে শেষ হয়ে আসবেই। হয়ত হয়ে গেছেও।

...আমরা জাতীয় সড়কের দু'দিকে সবুজের অপূর্ব শোভা দেখছিলাম। দুপুরের সোনালি রোদ যেন একখানা রেশমের কাপড় হয়ে এসে ফুল, ধান, পাতা সবকিছুকেই আরও উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ করে তুলেছিল। ধানের খেতগুলি যেন এক উন্মত্ত যৌবনের কাহিনির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

মীরাজকার সাহেব মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দূরের পাহাড়শ্রেণীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কোথাও ছায়া পড়ে গভীর নীল ধারণ করা, কোথাও রোদ পড়ে সোনালি পাহাড়ের রূপ ধারণ করা, আর কোথাও আধো আলো, আধো অন্ধকারের রহস্যময় রূপ ধারণ করা পাহাড় যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল।

... তবুও মাঝে মাঝে তিনি উৎকর্ণ হয়ে ছিলেন।

কি জানি কোথায় তিনি সন্ত্রাসবাদীর বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পাবেন। কিছু সময় পর এই ভাবনা তার মন থেকে দূর হল। এই সময় সন্ত্রাসবাদী নেই আমার এই কথা তিনি বিশ্বাস করলেন।

শিমুল, খয়রা, শিশু, হলং, পমা, বগীপমা, বকুল, জাম আর সেগুন গাছে ভরা অরণ্যের পথে আমরা এগিয়ে গেলাম। অস্তগামী সূর্যের শেষ আলো গাছ-গাছালির সারিতে ঢুকে পড়ল। আলোর টুকরো যেন রেশমের একটি চাদর। এই চাদর ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গাছগুলির মধ্যে যেন ফালিফালি হয়ে ঢুকে গেছে। গাছের যে ঝাড় এই চাদরের টুকরো গায়ে জড়িয়েছে সেই ঝাড়ের মধ্যে এখন ছোপ ছোপ দাগ দেখা গেল। যেন রোদের নয় হরিণের ফুটকি ফুটকি ছাল গাছগুলি শরীরে জড়িয়েছে। .... রেশমের চাদর এখন হরিণের ফুটফুটে ছাল।

ধানখেতের সবুজ রংও এখন এক অনন্য রূপ নিয়েছে। এই রং কোনওখানে অন্ধকারের আঁচলে কাঁচুমাচু হয়ে ঢুকবার তোড়জোড় করছে। কোথাও রোদের আলোয় গা ধুয়ে যেন পরিচ্ছন্ন হয়ে আছে, কোথাও যেন সোনালি সুতোর সঙ্গে জট পাকিয়ে আছে এই রং, আবার কোথাও যেন এই রং বৌদ্ধ ভিক্ষুর শরীরের কাপড় টানাটানি ক'রে আনার চেষ্টা করছে।

গাড়ি এগিয়ে গেল। ড্রাইভার বলল:

এই অঞ্চলে এখন আর কারও হাতে বন্দুক নেই। গতবার এখানেই গোলাগুলি হয়েছিল।

বন্দুক নেই? আঃ, একটি মোলায়েম গালিচা যেন সবকিছু ঢেকে রেখেছে। .... ঢেকে রেখেছে বারুদের ধোঁয়া, ঢেকে রেখেছে রক্তের দাগ....!!

মীরাজকার সাহেব বললেন, এই অঞ্চল থেকে বন্দুকগুলি উধাও হয়েছে, যদিও চোরাকারবারিদের হাতে বিভিন্ন ধরনের বন্দুকের আদান-প্রদান হচ্ছে।

কাজিরাঙ্গায় বন-বিভাগের আধিকারিক আহমেদ সাহেব বলেছিলেন, চোরা-কারবারীরা পয়েন্ট থ্রি-জিরো, থ্রি-ইউ এস কার্বাইন, ফাইভ হানড্রেড ডাবল ব্যারেল, ফোর সেভেন জিরো ডাবল ব্যারেল ব্যবহার করছে। মারিডিফুতে দু'জন চোরাকারবারি ধরা পড়েছে। গুলি খেয়েও মরেছে কয়েকজন।

মীরাজকার সাহেবের বন্দুকের প্রতি একটি জন্মগত কৌতূহল ছিল। তিনি বন্দুক, খার-বারুদ ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেন। বইপত্রও পড়েছিলেন। এই বার তিনি প্রথম মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে এই রকম কিছু বন্দুক সম্পর্কে কয়েকটি সরস কাহিনি বলতে আরম্ভ করলেন। রমাকান্ত ড্রাইভারও খুব কৌতূহলের সঙ্গে মীরাজকারের কথা শুনল। সে তার অর্ধেক বয়েসি। চুল না থাকার জন্য সে মাথায় একটা নেপালি টুপি পরে। ছোটখাটো শক্ত চেহারা। ঘাড়-গলা প্রায় নেই বললেই চলে। চোখ দু'টিও তেমনই ছোট। নাকের নীচে জম্পেশ গোঁফ। সে বিজ্ঞ ড্রাইভার, ক্লাচ ও ব্রেক বেশি ব্যবহার করে না।

দূরের অপূর্ব প্রকৃতির শোভা থেকে কোনও মতেও আমি চোখ সরিয়ে নিতে পারছিলাম না। মাঝে মাঝে মীরাজকার সাহেবের কথা থেকে আমার মন সরে যাচ্ছিল। দূরের বড় বড় ভেলেউ গাছগুলিতে লেগে থাকা শ্যাওলা চোখে পড়ছিল। সেইগুলোকে বানরের শরীরের লোমের মতো লাগছিল। আঃ, কত ধরনের গাছ ওইগুলি? কিছু কিছু গাছকে মুগা লতার মতো দেখতে বন্যলতা আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। যেন মাকড়সার জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দি কোনও অর্বাচীন খগুহর। .... আঃ, ওইগুলি কোন বর্ণের পাতা? কাঁঠাল গাছের পাতার মতো? আর ওই গাছগুলি? পুঁটি মাছের শরীরের মতো পাতা? কিছু কিছু গাছের ভিক্টোরিয়ার ছবি থাকা রূপার টাকার মতো গোলগোল পাতা? কিছু কিছু ঝোপের গাছের পাতা নারিকেল গাছের পাতা আবার অন্য গাছকে ছায়া দিচ্ছে। কি গাছ? কি গাছ? এইগুলি.... আর ওইগুলি? মনে হয় ওইগুলি যেন বিরিণ গাছ নয় মাটিতে খেলা করছে মেঘ।

মাটিতে পড়ে থাকা এইরকম সাদা মেঘের খেলা মীরাজকার সাহেবও বহুদিন দেখেননি। দিল্লির এক বিষম আবহাওয়া থেকে এসে যেন তিনি এক অনুপম স্বর্গরাজ্যে উপস্থিত হয়েছেন। এখানে বন্দুকের শব্দ? হাতিমারা বন্দুক!

পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি?

ফাইভ হানড্রেড ডাবল ব্যারেল?

পয়েন্ট ফোর সেভেন জিরো?

ইউ.এস. কারবাইন, উইথ এ সাইলেন্সার

... না, না এইসব অস্ত্র এখানে থাকা অসম্ভব? দিল্লির আবহাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা যায় না এটি এ রকম এক মধুর ভূমি। স্বর্গরাজ্য! দিল্লি আর মানুষ থাকার যোগ্য নয়। আফগান, তুর্কি কবির যমুনা এখন দুর্গন্ধ নর্দমায় পরিণত হয়েছে। মানুষের ভিড়ে সদরবাজার যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। রিং রোডে অ্যাকসিডেন্ট হয়ে পড়ে থাকা মৃত মানুষের শব বাসি হয়ে থাকার মতো অবস্থা হয়েছে।

... আস্তে আস্তে দিনের আলো সম্পূর্ণরূপে নিস্তেজ হয়ে এল। এক প্রকাণ্ড অজগর সাপ যেন নিজের চকচকে ছাল ফেলে অদৃশ্যের দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করেছে...। দিন সাপ হয়ে অন্তর্ধাণ করল।

....হুর হুর হুরাৎ.... গাড়ি শব্দ করে রাস্তার কিনারে চা ও ডাবের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। রমাকান্ত সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে গেল। বনেট খুলে দেখল। রেডিয়েটার লিক হয়ে জল শুকিয়ে গেছে। প্রচণ্ড গরমও হয়েছে। লিকেজ বন্ধ করার জন্য গাড়ি গ্যারেজে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

আমরা দু'জনেই নামলাম। ... ছোট ছোট কয়েকটি দোকান কাছে থাকায় আমার মন্দ লাগল না। মীরাজকার সাহেব বললেন:

জঙ্গলের মধ্যে খারাপ হলে খুব মুশকিল হত। অন্ধকার হয়ে আসছে। আমিও তাঁর কথায় সায় দিলাম। ইতিমধ্যে রমাকান্ত ওয়ার্কশপের খোঁজ নিতে রাস্তার কিনারের ছোট ছোট দোকানগুলিতে ঘোরাফেরা করতে লাগল।

হঠাৎ দেখলাম জাতীয় সড়কের একটু ভিতরের একটা দোকান থেকে একটি মানবমূর্তি আমাদের গাড়িটিকে লক্ষ ক'রে এগিয়ে আসছে। হাতে একটা কেরোসিনের বাতি। ঢিলে পাঞ্জাবি, হাঁটুর গোড়ায় ধুতি। পায়ে সেন্ডেল আছে কি না বোঝা যায় না।....

তিনি এগিয়ে এসে একেবারে গাড়ির সামনে দাঁড়ালেন। .... আমি ভালভাবে লক্ষ করে দেখলাম তাঁর চুলের গুচ্ছ দীঘল। খোঁপা করে বেঁধে রেখেছেন। বয়স হয়েছে। সত্তরের চৌকাঠ পার হয়েছেন বলে মনে হয়। ... বাতিটা উপরে তুলে তিনি বললেন:

সম্ভবত গাড়ি ব্রেকডাউন হয়েছে — ওয়ার্কশপ সাতমাইল দূরে। .... দাঁড়ান, আমি হাত তুলে গাড়ি একটা দাঁড় করাই। ড্রাইভার গিয়ে ওয়ার্কশপ থেকে একজন মেকানিক আনতে পারবে। এই সময়টুকু আপনারা আমার দোকানে কিছুক্ষণ বসতে পারেন। চা-পান খেতে পারেন।

এইবার তিনি গিয়ে মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেরোসিনের বাতিটি উপরে তুলে ধরলেন। বেঁধে রাখা খোপাটি খুলে কাঁধের উপর চুলগুলি ছড়িয়ে পড়ল।

দীঘল চুল, হাঁটুর উপর ধুতিতে তাকে ওজাপালির ওঝার মতো লাগছে। রাস্তার মাঝখানে গাড়ি থামানোর জন্য তিনি বিচিত্র ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

মীরাজকার সাহেব ও আমি শেডের নীচের দোকানটিতে ঢুকলাম। ছোট হ্যারিকেন ল্যাম্প, তা-ও বাঁশের খুটার উপর ঝুলিয়ে রাখা আছে। ল্যাম্পটির চিমনি ফাটা ও মলিন। কেরোসিনের স্টোভ, কিম্ভূতকিমাকার চেহারার একটা সসপেনে আধা করে রাখা চা আর কয়েকটি জংধরা টিন একটি কাঠের বেঞ্চের নীচে ফেলে রাখা হয়েছে। বেড়ায় সিগারেট ফুঁকতে থাকা চিত্র-তারকার একটি ফোটো ঝুলিয়ে রাখা আছে। পেট্রলের গেলন, ছেঁড়া কাপড়, নারিকেলের খুলি ইত্যাদি কাঠের বেঞ্চের চৌকাণে ছত্রাখান হয়ে পড়ে আছে। জল ও ওষুধের বোতল কয়েকটিও জড়ো হয়ে পড়ে আছে। চারিদিকে এক হতাশাজনক দৃশ্য। আমরা দু'জন কাঠের বেঞ্চটিতে বসলাম। আমরা বসার সঙ্গে সঙ্গে কেরোসিনের বাতি একটা নিয়ে একজন বৃদ্ধাও এসে হাজির হলেন। তিনি বললেনঃ

উঃ! আজ সারাটা দিন আমি যেন সাগরে মাছ ধরছিলাম। একটাও খদ্দের নেই।

খদ্দের নেই?

আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম। বৃদ্ধা বললেনঃ রাস্তার কিনারে অনেকগুলি দোকান হয়েছে। খদ্দেরকে আকর্ষণ করার কারসাজি তারা জানে। লাউড স্পিকার লাগিয়ে রেখেছে। গান-বাজনা করে...

এইবার আমার কানের কাছে এসে বুড়ি বললেন : ওইসব দোকানে খারাপ জিনিসও বিক্রি হয়। আমরা হচ্ছি ভক্ত মানুষ। ওই ধুমপানরত মেয়েটির ছবি এখানে রাখা নিয়ে ছেলের সঙ্গে ঝুটঝামেলা হয়ে গেছে।

বুড়ি এইবার কাঁপা কাঁপা হাতে চায়ের সসপেনটি তুলে নিলেন। বাতি ও সসপেন নিয়ে দোকানের পিছন দিকে গিয়ে সসপেনটি ধুয়ে নিয়ে এলেন। স্টোভটিতে বোধহয় কেরোসিন ছিল না। জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে একটা উগ্র গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

মীরাজকার ও আমি এক কাপ গরম চায়ের অভাব খুব বেশি করে অনুভব করছিলাম। বুড়ি কাঁপা কাঁপা হাতে কাঁচের গেলাস, দুধ ইত্যাদি সরঞ্জাম সাজিয়ে নিচ্ছিলেন দেখে আমার একটু খারাপ লাগল। দুটি বাতির আলোয় এবার বুড়ির পরনের পোশাক-আশাক বড় স্পষ্ট হয়ে উঠল। সুতির মেখেলা। পাড় দেওয়া চাদরের এখানে-ওখানে সুপুরির পিকের দাগ। ব্লাউজে অনেক তালি। ছিঁড়ে যাওয়া খানিকটা জায়গা দিয়ে বৃদ্ধার শরীরের শিথিল মাংস যেন স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলামঃ দিদিমা, এই বয়সে আপনাকে যে এইরকম করতে হচ্ছে, সাহায্য করার মতো কেউ কি নেই?

ছিল, ছিল, সাহায্য করার জন্য আমার বউমা ছিল। গতবছর বন্যার সময় আমার বড় ছেলেটি মারা গেছে। অজানা এক ব্যাধি হয়েছিল, চিকিৎসা করা হয়নি। ডাক্তাররা ডাকাত হয়ে গেছে কিনা। সে মারা যাবার সময় ও অন্তঃসত্ত্বা ছিল। এখন একটি ছেলে জন্মেছে। মেয়েটি খুব দুর্বল। এখানে এসে সাহায্য করা দূরের কথা, পেট ও পিঠ এক হয়ে গেছে। ভালমতো খাওয়া-দাওয়া তো হয়ই না!

আমি প্রশ্ন করলাম, বাড়িতে আর কে আছে দিদিমা?

দু'টি ছেলে ও দু'টি মেয়েও আছে। তারা স্কুলে পড়ছিল। একটি উগ্রপন্থীদের দলে যোগ দিয়েছে। অন্যটি কোথায় উধাও হয়েছে জানি না।... অথচ আজ সাত বছর ধরে নদীর উপদ্রব। ভূমি একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে। দিদিমা এবার ফিসফিস করে বললেনঃ

আমার বড় মেয়ে নির্মলীর একজন মিলিটারির সঙ্গে গণ্ডগোল হয়েছিল। পাড়ার ছেলেরা তাকে মেরে শরীরের হাড় ভেঙে দিয়েছে। মিলিটারি বেঁচে গেল। দায়ের কোপ একটা কিন্তু খেয়েছে।

.... এই সময় হাতে কেরোসিনের বাতি নিয়ে বুড়ো রাস্তা থেকে ফিরে এলেন। তিনি বোধহয় গাড়ি দাঁড় করিয়ে মেকানিক আনার জন্য ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিয়ে এখন ফিরে এসেছেন। দূর থেকেই তিনি চিৎকার করছিলেন।

ও নির্মলীর মা! শ্রান্ত হয়ে আসা পথিকদের নিজের দুঃখের কাহিনি শুনাস না; চা দে চা দে....!

হঠাৎ বুড়ি উঠে গিয়ে বৃদ্ধের কাছে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বললেনঃ

আজ রেললাইনের কাছে মনোহরারা ওকে দেখেছে।

বুড়ো আশ্চর্য হয়ে কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর হালকা করে দেবার জন্য বললেনঃ

গতবারও মানুষ তাকে রেললাইনের কাছে দেখেছে বলে বলেছিল। এই সব কথায় মন-কান দিস না। ... যা যা কাজিরাঙ্গা দেখে ক্লান্ত হয়ে আসা খদ্দেরদের চা দে!

বিস্কুট আছে না-কি?

নেই, বিস্কুট কোথায় থাকবে? গত সপ্তাহ থেকে চিনি চা-পাতা আনতেই ভাঁড়ার খালি!

মীরাজকার সাহেব ও আমি একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললামঃ

না-না আমরা গরম চা-ই শুধু খাব।

চা করে একেবারে ঢেলে দেওয়া পর্যন্ত বুড়ি দিদিমা মনমরা ও অসন্তুষ্ট হয়ে রইলেন ও বলতে থাকলেন ....

বুড়ো কি চিন্তা করবে। আমি জানি আর কী ঘটবে — হরি হরি আর কী ঘটবে। বন্যার সাহায্য সমিতি কোথায় মিটিং করেছে ... পথের কিনারে দপ্তর সাজিয়ে সরকারি মানুষ থেকেছে... এই মেয়েটি শুনেছিল আজ সাতবছর কত কত জমি খেয়েছে — সরকারি লোক একজন টাকা একশো দিয়ে খেল খতম করে দিল...

বুড়ো দাদু গর্জে উঠলেন : এই বুড়ি চুপ করে থাক!

সরকারি অফিসারের পায়ে পড়তে লজ্জা করে বুড়োর। বন্যায় নাজেহাল হওয়া মানুষকে দেবার জন্য সরকারের দেওয়া টাকা পয়সা খেয়ে ফুলে ফেঁপে ওঠা অফিসারদের পায়ে ধরতে বুড়ো যায় না ... বাড়িটি আজ সাত বছরে ... আঃ, অহংকার ছাড়েনি — বংশের কেউ একজন প্রতাপশালী লোক ছিলেন, সোনার বেড় দেওয়া রূপোর হাতল-ওলা লাঠি নিয়ে তিনি ঘোরাফেরা করতেন... বসতের দামি কারুকার্যময় গালিচায়.... সেইসব পুরনো কথায় মাথা ভার হয়ে আছে .... ঠেলে ঠেলে আমি সরকারি মানুষের কাছে পাঠাতে পারিনি — সাতবছর ধরে ভুগছি...আমার অবস্থা দেখে আসবে এবার অন্তত সরকারকে বলবে... কাজিরাঙ্গার জন্তুগুলি দেখতে এলে তোমরা আমাদের গ্রামের মানুষগুলির অবস্থাও দেখে আসবে। বুড়ো দাদু এবার হাতজোড় করে বললেনঃ

বাবারা, আপনারা মনে কিছু করবেন না ...খদ্দের এলেই বুড়ি এরকম বকবক আরম্ভ করে।

বুড়ির দিকে তাকিয়ে এবার ধমক দিয়ে উঠলেন।

দে দে চায়ের সঙ্গে অল্প আদাও থেঁতলিয়ে দে। আদা যদি না থাকে তেজ পাতা দু'টুকরো ফেলে দে....

হঠাৎ আমার চোখ পড়ল বেড়ায় ঝুলিয়ে রাখা একটা দোতারার দিকে। আমরা বসে ছিলাম যে বেঞ্চে তার পেছন দিকে ঝুলিয়ে রাখা ছিল বলে এতক্ষণ ভাল করে আমার চোখে পড়েনি। বস্তা, টিন, নারিকেলের খুলি ইত্যাদি নানারকম জিনিসের স্তূপের মধ্যে আমি এই দোতারাটি লক্ষ করে খুব আশ্চর্য হলাম। কারুকার্যও করা আছে। খুব যত্ন করে রাখা বলে মনে হল।

দাদু, এই দোতারাটি কে বাজায়?

প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঐশ্বরিক হাসি দাদুর মুখে ছড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ আগেও বৃদ্ধের মুখে যে এ ধরনের হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠতে পারে এ বিষয়ে আমার ধারণা ছিল না। তিনি বললেন :

ডিফলুর পাড়ে যতগুলি নামঘর আছে সবকটিই আমার এই বাদ্য চিনত। ডিফলুর পাড়ের অনেকগুলি নামঘর নদী গ্রাস করেছে, আমিরাহ, হোলাপার, কোহরার, মিহিমুখ সবকটিই একসময় আমার এই দোতারাটিকে চিনত। ডিফলুর পাড় দূরের কথা ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে একেবারে বেহালি পর্যন্ত মানুষ আমার গানের প্রশংসা করত।

কোণায় পড়ে থাকা একটি বেলনায় আদা থেঁতলাতে থাকা বুড়ি দিদিমা আবার রেগে উঠলেন —

বুড়ো এখন পুরনো কালের ইতিহাস বলবে। দুইমাস ধরে উধাও হয়ে থাকা ছেলেটি যে খাই খাই মূর্তি ধরে রেল লাইনের কাছে দাঁড়িয়ে আছে সে সব কথা, হায়, সে সব কথা বুড়োর ভাল লাগে না।

চুপ থাক, চুপ থাক বুড়ি। দু'গ্লাস চা করতেই এত দেরি করছিস!

অধ্যাপক মীরাজকার মধ্যস্থতা করে বললেনঃ

আমার কিন্তু একটা গান শোনার খুব ইচ্ছে হয়েছে!

দাদু যেন এই কথা শোনার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ শোনাব শোনাব, আপনাদের মেকানিক এখন এসে পৌঁছানি, কিছুক্ষণ বসতেই হবে। যত খদ্দের আসে, সবাই আমার গান শোনে .... বুড়ি আবার রেগে ধমক দিয়ে উঠলেন—

গত সপ্তাহ থেকে খদ্দের আসেনি বললেই হয়। দেখলেন তো কতগুলি গাড়ি পার হয়ে গেল। বুড়োর দিকে তাকিয়ে আবার বললেনঃ আমি খদ্দেরদের চা দিচ্ছি। আপনি বাতিটি নিয়ে রেল লাইনে গিয়ে দেখে আসুন। গল্প করতে আর গান গাইতে বসলে বুড়ো আর উঠবেই না।

রাখ! রাখ! বুড়ি! গতবারও কে একজন বলেছিল না সে রেললাইনে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে?

বুড়ির হাত থেকে গ্লাস দুটো নিয়ে দাদু সাবধানে আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে দাদু বললেনঃ

চাটুকু খেয়ে নিন। আমি গান শুনাবই।

আমরা দু'জনেই খুব আগ্রহের সঙ্গে ধোঁয়া-ওঠা চায়ের গ্লাস হাতে তুলে নিলাম।

দাদু বললেন : কাজিরাঙ্গায় বাঘ দেখেছেন কি? শুনেছি ১৯৬৬ সনে কাজিরাঙ্গায় কুড়িটা মাত্র বাঘ ছিল, এখন ষাটটার মতো না-কি আছে... গন্ডারও তিনশো' থেকে দেড়হাজারের মতো হয়েছে, হাতিও পাঁচশো-র বেশি না-কি হয়েছে ...

আমি উৎসাহের সঙ্গে বললামঃ আমরা একটা হাতির পাল দেখেছি। এদিকেও কখনও সখনও হাতি বেরোয় না-কি?

যানবাহনের শব্দের জন্য এইদিকে হাতির দল আর বেরোয় না। আগে খেতে মাঠে নামা হাতিকে আমাদের জাল পেতে তাড়াতে হত ... কিন্তু বাঘ বেরোয়। এই তো সেদিন একটি ঘটনা ঘটে গেল। ডিমৌগুরির মহন্তের হাতিটি রাস্তার পাশের পুকুরের পাড়ে বেঁধে রেখেছিল। খুব শান্ত হাতি। ডিফলুতে ধোয়ানোর জন্য নিলে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলাধূলা করত। দুপুরবেলা পুকুরের পাড়ে হাতিটি শুয়ে ছিল।

হঠাৎ কখন বাঘ এসে পাছা কামড়ে নিয়ে গেল আমরা টেরই পেলাম না। 'ইস্! ইস্!' আমরা আর্তনাদ করে উঠলাম। বুড়ো দাদু এবার হাতির গল্প বলতে আরম্ভ করলেন :

হাতি অন্তর্যামী জন্তু! শুনেছিলাম বেশ কয়েকটি মহাসমর না-কি হাতির জন্যই হয়েছিল... আমাদের লক্ষ্মী সিংহের দিনের মোয়ামারিয়া বিদ্রোহ না-কি একটি হাতির জন্যই হয়েছিল।

একটা হাতির জন্য?

হ্যাঁ, একটা রোগা হাতির জন্যই। পড়েননি না-কি মা জননী? লক্ষ্মীনাথ সিংহের সময়ের কথা? বুড়ো বয়সে রাজ্যপাট পেয়েছিলেন—কীর্তিনাথ বরবরুয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। আমাদের রাজাদের মধ্যে এই লক্ষ্মী সিংহ আর গৌরীকান্ত সিংহ দেখতে খুবই কদাকার ছিলেন। গৌরীকান্ত সিংহ আফিম খেয়ে চোখ মেলতে পারতেন না।

শুনুন, শুনুন

হাতির গল্প.....! বরবরুয়ার আবার মোয়ামারিয়া মহন্তের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল না! এই ঝগড়ার বীজ অবশ্য অন্য জায়গায় ছিল।... বছরের শেষে হাতি পরিশোধ করতে হত, পর্বত মোয়ামারিয়া মহন্ত বরবরুয়াকে একটা ক্ষীণকায় হাতি উপহার দিলেন। হাতি দিতে গিয়েছিলেন নাহর খুড়া। বরবরুয়া ভয়ংকর ক্রোধে নাহরের কান দুটি কেটে ফেললেন।

.... এইসময় বুড়ি দিদিমা আবার একবার ধমক দিয়ে উঠলেন—

কান-কাটা ছাড় এই বুড়ো... বাতিটি নিয়ে দেখে আয় কোথাও মিলিটারির গুলি খেয়ে পড়ে থাকে যদি...

বুড়ো দাদু সেইদিকে খুব একটা মন দিলেন না। বললেন:

এই অঘ্রান মাসে ন'হাজার মোয়ামারিয়া সেনা রংপুর পর্যন্ত গিয়ে কীর্তিচন্দ্রকে শূলে চড়াল, এইসব কাহিনির গোড়াতেই সেই ক্ষীণকায় হাতিটিইতো ছিল?

আমি দাদুর কথা শুনতে শুনতে চা খাচ্ছিলাম। মাঝখানে ড্রাইভার রমাকান্ত এসে চটপট একপ্লাস চা খেয়ে গেল। সঙ্গে বলেও গেল যে 'কাজ শেষ হতে খুব কম করে আরও ঘণ্টা দেড়েক লাগবে। রেডিয়েটারটি খুলে ওয়ার্কশপে নিয়ে চলে গেছে।'

বুড়ি দিদিমা বললেন:

আজ দু'জন মাত্র খদ্দের এসেছে। মা জননী আরও এক গ্লাস করে চা যদি খান তাহলে খুব ভাল হয়। চিনি, চা-পাতা তো আছেই!

আমরা দু'জনে খুব উৎসাহের সঙ্গে দিদিমাকে আরও এক গ্লাস করে চায়ের অর্ডার দিলাম।

দাদু ইতিমধ্যে দোতারার তার দুটি ঠিক করে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলেও গেলেন—

বন্যার কবল থেকে কোনওরকমে আমি এই দোতারাটি রক্ষা করেছি। এইরকম দোতারা বানানোর কারিগর এখানে আর নেই। এটি আমার খুব আদরের....

বুড়ি দিদিমা আবার মনে করিয়ে দিলেন—খদ্দেরদের আমি যত্ন করে দেখছি! বাতিটি নিয়ে রেল লাইনের দিকে গিয়ে দেখে এস...কিছু বলা যায় কি। কিছু বলা যায় কি!!

বুড়ো দাদু এবার ধমক দিয়ে উঠলেন।

চুপ্ কর বুড়ি! আমাকে খদ্দেরদের সঙ্গে কথা বলতে দেখলে তোর কলিজা পোড়ে, তাই না? সঙ্গের সবাই মরে..হেজে শেষ হয়ে গেছে। গল্পের সঙ্গী আর নেই....।

বুড়ি দিদিমা চাদরের আঁচল দিয়ে চোখ দু'টি মুছলেন। চায়ের ছাকনি আর সসপেন নিয়ে তিনি ধীরে ধীরে বাইরে চলে গেলেন। সম্ভবত পুরনো সব চা-পাতা ফেলে দিয়ে তিনি একেবারে নতুন করে আবার চা করবেন।

এবার বুড়ো দাদু বেড়ার পেরেকে ঝুলিয়ে রাখা পুরনো নোংরা গামছা দিয়ে দোতারাটি মুছতে আরম্ভ করলেন। তিনি আমাদের খুব কাছে বেড়ায় হেলান দিয়ে বসলেন। বললেন, 'ইস্ আমাদের রাজা-রাজড়াদের কত কাহিনি আমি জানতাম। জোনাক রাতে লুইতকে কেমন দেখাত। জানেন তো মা জননী?'

কি রকম?

ইস্, নদী নয় যেন বুড়ি দিদিমার একগোছা সাদা চুল উড়ছে। শুনছেন মা জননী?

এইবার গলা বাড়িয়ে কপাল কুঁচকিয়ে দাদু একটা বিচিত্র ভঙ্গি করে বললেন: আমার এই বুড়ি এখন এইরকম খিঁচিখিটে হয়েছে। আগে এরকম ছিল না। ... গৌরীনাথ সিংহের সময়ের দশটা 'বানবাটি' (পুরনো দিনের অভিজাত বাটি) ছিল। সেগুলি তেঁতুল দিয়ে ধুয়ে মুছে চকচকে করে রাখত, যাতে সন্ধ্যেবেলা অতিথিরা এলে আপ্যায়ন করতে পারে.... উঃ দিনকাল একেবারে অন্যরকম ছিল...একেবারে অন্যরকম ছিল।

গামছাখানি বুকের কাছে নিয়ে কিছুসময় দাদু কি একটা যন্ত্রণা রুদ্ধ করে রাখতে চাইলেন।

....এক মুহূর্তমাত্র। তারপর হঠাৎ তিনি যে আবার উৎসাহিত হয়ে উঠলেন...

'শুনুন মা জননী! গৌরীনাথ সিংহের কাহিনি আমি যতটা জানতাম এই খণ্ডের কেউ তা জানত না। .... আফিমের নেশায় রাজা চোখ মেলতে পারতেন না।' দাদু আবার মাথা বাড়িয়ে দিয়ে চোখ দু'টি ছোট ক'রে খুব কৌতূহলের সঙ্গে আমার দিকে তাকালেন, আর ফিস ফিস করে বললেন:

স্বভাবও খুব ভাল ছিল না। তারা মাসির ঘরের সামনে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকতেন। অপেক্ষার ধরন দেখেই সবাই বুঝতে পারত। ... তাছাড়া আমাদের ডিফলুর দিকের একজন মহিলাও ছিল। তাকে রাজার সোনার অলংকার পাঠানোর কাহিনি এই খণ্ডে সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল .... বরাহি, চুড়িয়া, কলিতা, কায়স্থের মেয়েও রাজকন্যা হয়েছিল, যদিও একে নিয়েছিলেন কিনা জানতে পারিনি। এই তো সেদিনও সব কথা চটপট মনে পড়ত। আজকাল মনে থাকে না।

আমি প্রশ্ন করলাম—

শুনেছিলাম একজন রাজা খুব আফিমখোর ছিলেন। আফিমের সঙ্গে মুগা-পোকা ভেজে খেতে ভালবাসতেন ... তাই না?

দাদু জোরে জোরে হাসতে লাগলেন, শুনুন, মা জননী আমার ইনি মহিষের মাংসে খেতে পারা গদাধরের মতো ছিলেন না। ... হঠাৎ যেন একটা ভূমিকা কষা হল।

হয়েছে হয়েছে, মোষের মাংসের কথা ছেড়ে রেল লাইনের কাছে যা, রেল লাইনের ..... বুড়ি দিদিমা আমাদের হাতে চায়ের গ্লাস তুলে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন।

—আমি লক্ষ করলাম দাদু বুড়ি দিদিমার কথায় এইবারও খুব একটা মনোযোগ দিলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি দো-তারাটির দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি কাঁধে একটা গামছা নিয়ে ঘোরাফেরা করছিলেন। সেটি দিয়ে দোতারাটি মুছতে মুছতে বললেন : চোখেও ভাল করে দেখতে পাই না। বুড়ি তো বাতি নিয়ে গিয়ে দেখে আসতে বলে ... সেদিনও রেললাইনের ধারে হঠাৎ পড়ে গেলাম। বুকে এখনও ব্যথা আছে... শুনছেন মা। আমার অবস্থা এইরকম ছিল না। বন্যায় খেয়ে খেয়ে এমন অবস্থা করেছে ... আমার এ রকম অবস্থা হওয়ার কথা ছিল কি? সত্যি, আমার এই রকম পথে দাঁড়ানোর মতো অবস্থা হওয়ার কথা ছিল কি? খদ্দের আসবে আসবে বলে অপেক্ষা করে থাকার মতো এই অবস্থা। দু'টো বড়াল ছিল। অচেনা পথিকও পুকুরের মাছ দিয়ে জহা চালের ভাত খেয়ে যেত। আমরা বরবুয়া বংশের মানুষ। রাজার ছিল গুরুতর অপরাধীকে বাঁশের খাঁচায় পুরে জলে ফেলে প্রাণদণ্ড দেবার অধিকার। আমার পূর্বপুরুষ বরবরুয়াও অপরাধীকে হাঁটুর খিলা কেড়ে নেবার মতো শাস্তি দিতে পারতেন। তিনি আবার দয়ার সাগর ছিলেন। চিহ্নস্বরূপ তার রূপার ছাতা এখনও আছে। দিনে বা সকালবেলা হলে দেখিয়ে আনতে পারতাম। কারুকার্যময় গালিচা, রূপোর পানের বাটা, সোনার মতো ভাল গুণমানের ধান হয় এমন বুকের মাংসের মতো জমি এসব এখন কিছুই নেই।

বুড়ি দিদিমা আবার রেগে উঠলেন।

হয়েছে হয়েছে মরা-পোঁতার গর্তগুলো কেন খুড়ছ। একবার রেললাইনের পাশে গিয়ে দেখে এস।

দাদু আবার চিৎকার করে উঠল....।

চুপ থাক্। চুপ্ থাক্ বুড়ি। আগেও দু'তিনবার এরকম উড়ো খবর শুনিস্নি? আমাদের চায়ের দোকানে আজ গণ্যমান্য মানুষ এসেছেন। দাদু এবার বেপরোয়া হয়ে দোতারা বাজাতে শুরু করলেন। কুপির আলোয় এইবার দাদুর মুখখানা একেবারে স্পষ্ট হয়ে পড়ল। দাদুর নাকটি লম্বা। ভেতরের দাঁতগুলি পড়ে যাওয়ায় গাল তোবড়ানো। চোখের নীচে মাকড়সার জালের মতো অজস্র রেখা। তার রং অত্যন্ত কালো, তাই শুধু কুপির আলোয় এই রেখাগুলি স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল। কপালের বলিরেখাগুলি কিসের সংকেত দিচ্ছে? চিন্তা, জিজ্ঞাসা, দুঃখ আর?

অত্যন্ত সুললিত সুরে দাদু পদ্মপ্রিয়ার গীত গাইতে আরম্ভ করলেন —

"পুত্র পতিধন সকলই অকারণ
যেন জলবিম্ব হাসে।
এই আছে নেই সব হবে ছাই
সব কিছু কালগ্রাসে।
জীবন যৌবন সব অকারণ
যেন স্বপনের নিধি।...

শুধু পদ্মাপ্রিয়াই না-কি? গোপাল দত্ত শ্রী শংকর রাজা প্রভুরও গীত দাদু আমাকে গেয়ে শোনাতে আরম্ভ করলেন। আমাদের হাতে সময় বড় কম। কিন্তু দাদু আমাদের ছাড়ছেন কই। বললেন, এরকম খদ্দের আমি কোথায় পাব? মনের আনন্দে তিনি গীত গাইবেন।

—আমরা প্রায় একঘণ্টা ধরে দাদুর সুললিত সুরের গীত শুনলাম। দিদিমার উশখুশ ভাবের জন্য আমাদের রস আস্বাদনে বাধা পড়ল। ... এবার দিদিমা যেন রণচণ্ডী মূর্তি ধরে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন:

তাকে রেললাইনের কাছে দেখেছে বলে কিছু মানুষ বলে গেল ... বুড়োর কানে ঢোকে না। মিলিটারিরা গুলি মেরে তার প্রাণ নিলেও বুড়োর বুক ভেঙে যাবে না....

আমরা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, আমাদের গাড়ি ভাল হবার সময় হয়েছে। এখন আমরা গাড়িতে গিয়েই বসি। দাদুর

গান শুনে আমরা যেন স্বর্গরাজ্যেই ছিলাম। জ্যোৎস্নার পোশাক যেন শরীরে পরেছিলাম।

কেউ যেন ফুলের হাতা দিয়ে আমাদের মুখে একফোঁটা দুফোঁটা করে মধু ঢালছিল। শেফালি ফুলের নীচে পরিষ্কার করে রাখা আসনে যেন আমরা বসেছিলাম। মীরাজকার সাহেব এইবার কোটের পকেট থেকে বেশ কিছু নোট বের করে দাদুর সম্মুখে রাখলেন। দাদু খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন।

এই নির্মলীর মা, চায়ের পয়সা হিসেব করে রাখ। বাকি টাকা সাহেবদের ফিরিয়ে দে। অতটাকা কেন দিয়েছেন বাবা? ...আমরা টোকো পাতার ঝাঁপি মাথায় দিয়ে ফেরা বরবরুয়ারা বংশের মানুষ ... এই সঙ্গীত। ... এই সঙ্গীত। গুরুজনদের আত্মার প্রতিধ্বনি এই সঙ্গীতের জন্য কেউ আমাকে টাকা দিলে আমি হৃদয়ে বড় কষ্ট পাব ... এইসব কথা কেউ বোঝে না... আজকাল কেউই বোঝে না।

বুড়ি দিদিমা টাকাগুলির দিকে টো টো করে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি কোনও প্রশ্ন করছিলেন না, টাকাগুলি গুনেও দেখছিলেন না। .... ঠিক এই সময়ে একজন যুবতী মেয়ে ল্যাংড়াতে ল্যাংড়াতে এসে দরজায় হাত রেখে ভিতরের দিকে উঁকি দিয়ে দেখল। বুড়ো-বুড়ি দু'জনেই চেঁচিয়ে উঠল—

এই হতশ্রী এখানে কেন এসেছিস।

ও কোনও উচ্চবাচ্য করল না। আমাদের সামনে দিয়ে পার হয়ে গিয়েও পেছনের বাসন ধোয়ার জায়গায় ফেলে রাখা একটি কাঠের টুলে গিয়ে বসল। আমরা বুঝতে পারলাম যে ও-ই ভারতীয় সেনাটির সঙ্গে প্রেমের লেনদেন করে পরিবারটির মুখ-কালো-করা নির্মলী।

....এই মুহূর্তটুকু বুড়ো দাদু ও বুড়ি দিদিমা নিজেদের কাজে মন দিল। বুড়ি দিদিমার দৃষ্টি আবার টাকাগুলির উপর পড়ল। এত টাকা সম্ভবত বহুদিন তারা দেখেনি।

ঠিক এই সময় হঠাৎ যেন একটি বিস্ফোরণ-ই হল। আমরা চারটে মানুষ কিছুদূর গিয়ে যেন ছিটকে পড়লাম। পাশের গাছ-গাছালির ঝাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে এসে কি করে যেন একটা জবরজং পুরুষমূর্তি আমার কাছে দাঁড়াল। আমি বুঝতেই পারলাম না। কেরোসিনের বাতির আলোয় আমি তাকে স্পষ্টভাবে দেখলাম। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। ... তরুণ যুবক, ঠোঁট ও চোখের এক অংশ বন্দুকের ধারালো অস্ত্রের আঘাত লেগে এক ভয়ংকর জখম। ভুরুর নীচ থেকে চোখের কিনারা পর্যন্ত এক টুকরো মাংস ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে মুখটি এত বেশি ভয়ংকর ও কুৎসিত হয়েছে যে আমি দিদিমার হাতটি খামচা মেরে ধরলাম।

পরে এসেছে একটা বিবর্ণ কালো জিন্স। ঠিক এই রকম বিবর্ণ একটা খাকি জেকেট। মাথার লম্বা কালো চুল এলোমেলো। থুতনির নীচে দীঘল দাড়ি। হাতে ওটা? ওটা রিভলবার ... কেরোসিনের বাতির আলোয় ঝিকমিক করছে ওটির বেরেল?

হঠাৎ ছেলেটি বেড়ার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকা নির্মালীকে দেখল। সে ছুটে গিয়ে তার পেটে একটি লাঠির খোঁচা দিয়ে চিৎকার করে উঠল।

'শালী বেশ্যা! ছেলেগুলি কুপিয়ে তোর পা ভাঙেনি তাহলে... সেনাটিকেও না-কি দু'টুকরো ক'রে কাটতে পারেনি ... ফু!' সে থুতু ফেলল। দিদিমা অনুনয় বিনয় করে তার হাত ধরে টানাটানি করে ভিতরে নিয়ে আসার চেষ্টা ক'রে কাঁদতে লাগলেন।

ও আমার আদরের বাবা! ও আমার আদরের বাবা! আমি তোর বাবার কাছে কাকুতিমিনতি করেছি বাতিটি নিয়ে গিয়ে তোকে রেল লাইন থেকে নিয়ে আসুক... ডিফলু থেকে আসা দু'জন মানুষ তোর দেখা পেয়েছে বলে আমাকে বলে গেছে — ও আমার আদরের বাবা ....

দিদিমা এইবার চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। ছেলেটি কিন্তু এইদিকে বেশি ভ্রুক্ষেপ করল না। সে কিছুসময় বাতির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে থাকা টাটকা নোটগুলির দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল। তার দৃষ্টি শিকারের আশায় উড়ে উড়ে বেড়ানো শ্যেন পাখির দৃষ্টিতে রূপান্তরিত হল। সে ছুটে গিয়ে নোটগুলির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল :

দিদিমা চিৎকার করে উঠলেন—

এগুলি অতিথিদের পয়সা বাবা, ফিরিয়ে দে, ফিরিয়ে দে ....

জবরজং ছেলেটি এ কথায় ভ্রুক্ষেপ করল না। সে বকবক করতে লাগল — চোরাশিকারিরা দুটো ইউ.এস. কারবাইন বিক্রি করবে। আমার কাছে মাত্র কুড়ি টাকা কম আছে। টাকার দরকার, টাকার দরকার .....

সে যেমন ঝড়ের মতো এসেছিল ঠিক তেমনই অন্ধকারের বুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দাদুর মুখে একটা হাসির ঝিলিক দেখা গেল। মানুষের হাসি যে এমন হৃদয়-বিদারক হতে পারে এই কথা আমি আগে জানতাম না।

গুয়াহাটি পর্যন্ত ফিরে আসার বাকি পথটুকু মীরাজকার আমাকে আর কোনও প্রশ্ন করেননি। অন্ধকারের বুকে আমাদের গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছিল।

অনুবাদ : মনোতোষ চক্রবর্তী

জ্ঞানপীঠ বিজয়িনী ইন্দিরা গোস্বামী

সঞ্জিত চক্রবর্তী

যশস্বিনী অসমিয়া লেখিকা শ্রীমতী ইন্দিরা গোস্বামী ভারতীয় সাহিত্যের আঙিনায় গত দু'দশক ধরে এক সুপরিচিত নাম। তাঁর আর একটি নাম মামণি — মামণি রয়সম গোস্বামী। রয়সম পদবি বৈবাহিক সূত্রে প্রাপ্ত। ইন্দিরা দেবীর স্বামী প্রয়াত মাধবন রয়সম আয়েঙ্গার পেশায় ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। পরিজন ও বন্ধু-পরিবৃত্তে ইন্দিরা মামণি নামেই বেশি পরিচিত। এ নামে তিনি লেখালেখিও করেছেন। এবার ইন্দিরা গোস্বামী তাঁর সাহিত্যকৃতির জন্য জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। এ দেশে পুরস্কারটি বেসরকারি মহল থেকে দেওয়া হলেও অদ্যাবধি সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সম্মান হিসাবে স্বীকৃত।

অসম থেকে প্রথম জ্ঞানপীঠ বিজয়ী ছিলেন শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য। তিনি একদা সাংবাদিকতা করেছেন। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগে অধ্যাপনায় বৃত ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে শ্রী ভট্টাচার্যকে চিনতাম। স্থিতধী অমায়িক মানুষ। ইন্দিরা দ্বিতীয় অসমিয়া সাহিত্যিক যিনি জ্ঞানপীঠ পেলেন। মামণি ওরফে ইন্দিরার সঙ্গে আমার সামান্য যোগাযোগ ঘটেছিল। আমি তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাসত্রয়ী (মা মরে ধরা তরোয়াল) মরচে ধরা তরোয়াল-এর বাংলা অনুবাদ করেছি। সাহিত্য অকাদেমি থেকে ১৯৯২ সালে বইটি অনুবাদ করবার জন্য প্রস্তাব এসেছিল। আমি তখন সেন্টিনেল গোষ্ঠীর বাংলা দৈনিক সময় প্রবাহর নিয়মিত লেখক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য - "মা মরে ধরা তরোয়াল" ১৯৮২ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার এনে দেয়। তাঁর লেখা আত্মজৈবনিক "আধা লেখা দস্তাবেজ" বইটি আমার পড়া ছিল। শুধু অসমিয়া কেন বাংলাসহ ভারতের অন্যান্য ভাষাসমূহে তার আগে এত অকপট স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ হয়নি বলে আমার ধারণা। বইটিতে ১৯৭০ সাল অবধি সংঘটিত কিছু ঘটনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন — "মোর অত্যন্ত প্রিয় ভ্রাতৃ-ভগ্নী বন্ধু বান্ধব আদির ছবি এই গ্রন্থত অঙ্কিত হোয়া নাই"। যদিচ নাতি প্রশস্ত ক্যানভাসে লেখার আখরে তিনি যে হার্দিক ছবি এঁকেছেন — তাতে পরতে পরতে ফুটে উঠেছে তাঁর কোমল সংবেদনশীল মনের চেহারা। তিনি রোমান্টিক, সৌন্দর্যপ্রিয় আবার মিস্টিক ধর্মী, আত্মমুখী ও ভাবালু প্রকৃতির। যে পারিবারিক ও সামাজিক আবহমণ্ডলে তিনি মানুষ হয়েছেন সেখানে পুরনো ঐতিহ্য ও ধ্যানধারণা বা মূল্যবোধের প্রভাব বিস্তর। অথচ সে সব প্রয়োজনে কাটিয়ে সত্য ও শ্রেয়বোধের আলোকে জগতকে নির্মোহভাবে বোঝার চেষ্টা করেছেন। তাই পুরনো ঐতিহ্যের ভালটুকু গ্রহণ করেছেন। মন্দকে মন্দ বলার সাহস দেখিয়েছেন। এ সবই তাঁর বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসে নানা চরিত্রে চিত্রায়িত হয়েছে।

ইন্দিরা দেবীর "মা মরে ধরা তরোয়াল"এর বাংলা অনুবাদ শেষপর্যন্ত ১৯৯৮ সালে কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছিল ওই সাহিত্য অকাদেমি থেকেই। মূল অসমিয়া উপন্যাস সংকলনটি আমার আগে পড়া ছিল না। "আধা লেখা দস্তাবেজ" পড়ে এতটা প্রভাবিত হই যে তাঁর লেখা বলেই অপঠিত বই "মা মরে ধরা তরোয়াল" অনুবাদ করতে খুশি মনে সম্মত হয়েছিলাম।

ইন্দিরা গোস্বামীর কৃতি ও কৃতিত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর বিচিত্র জীবনরেখার কিছুটা আভাস দেওয়াটা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তাঁকে যতটুকু জেনেছি ও তাঁর লেখালেখির সঙ্গে বর্তমান নিবন্ধকারের যতটুকু পরিচয় রয়েছে তাতে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে জীবনে চলার পথে বস্তুমুখীন অবস্থা লব্ধ অভিজ্ঞতা (যাতে তিনি নিজে ততটা জড়িত নন) যেমন তাঁকে সৃষ্টিধর্মী রচনায় অনুপ্রেরিত করেছে তেমনই ব্যক্তিগত সুখদুঃখ সম্ভূত ভাব বিভাব ও একান্ত জীবনযন্ত্রণা তাঁর কলমকে ঋদ্ধ করেছে।

ইন্দিরা গোস্বামীর জন্ম ১৯৪২ সালে গুয়াহাটি শহরে, অসমের অন্যতম সম্ভ্রান্ত এক পরিবারে। বাবা উমাকান্ত গোস্বামী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। অর্থনীতিতে এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। নামী অধ্যাপক। পরে তিনি অসম সরকারের শিক্ষা বিভাগের বরিষ্ঠ পদাধিকারী ছিলেন। সেই সুবাদে অবিভক্ত অসমের রাজধানী চমৎকার শৈলশহর শিলংয়ে ইন্দিরার কৈশোরের দিনগুলি কেটেছে। সেখান বিখ্যাত পাইন মাউন্ট মিশনারি স্কুলে পড়াশুনা করেছেন। ফের পড়াশুনার জন্য বাবার ইচ্ছায় পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে গুয়াহাটি ফিরে যান নিজেদের বাড়িতে। তাঁর কৃতবিদ্য বাবা ছিলেন স্নেহশীল মানুষ। ইন্দিরার জীবনে বাবার প্রভাব ছিল বিরাট। ন'দশ বছর বয়সে ভাবতেন বাবা মরে গেলে তিনি কী করে বেঁচে থাকবেন। অথচ দুঃখের কথা হল তিল তিল করে দুরারোগ্য ক্যান্সারে তিনি বাবাকে মরতে

দেখেছেন। অকালেই উমাকান্ত মারা যান। ইন্দিরার জীবনে এ ছিল বিরাট আঘাত। তখন থেকেই নেমে এল তার জীবনে শূন্যতার প্রচ্ছায়া।

ইন্দিরা ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যপিপাসু ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় গল্পলেখার মক্‌সো করেছেন। সাহিত্য পাঠে মনোযোগ ছিল। তবে সে সময় প্রথাগত পড়াশুনার প্রতি তাঁর তেমন আগ্রহ ছিল না। অবশ্য পরে সাহিত্যে স্নাতকোত্তর হয়েছেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরবর্তীকালে অসমিয়া প্রভাষিকা হিসাবে যোগ দিয়ে রামায়ণ নিয়ে গবেষণাও করেছেন। ডক্টরেট ডিগ্রিধারী ইন্দিরা ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের অধ্যাপিকা। অথচ অতীতে কোনও এক পরীক্ষায়, অকৃতকার্য হওয়ায় তিনি আত্মহননের চেষ্টাও করেছিলেন। অসমিয়া তথা ভারতীয় সাহিত্যের সৌভাগ্য তাঁর সে চেষ্টা সফল হয়নি। আধালেখা দস্তাবেজ-এ এ সম্পর্কে অকপটে বিশদ লিখেছেন। আমাদের সমাজে কুমারী মেয়ের আত্মহত্যার প্রয়াস কি মানুষ ভাল নজরে দেখবে! সময়টা ছিল আজ থেকে চার দশক আগে। শুরু হল পথে ঘাটে গুঞ্জন কখনও বা তাকে সরাসরি টিটকারি। গুয়াহাটি ষাটের দশকে এত বড় শহর ছিল না। সুতরাং গুজব নানাভাবে দ্রুত পল্লবিত হত ও ছড়াত। যাই হোক, ইন্দিরা ছিলেন মূলত ভাবপ্রবণ। শিলং বাসের সময় তাঁদের বাংলোর পেছনে ছোট একটি জলপ্রপাত ছিল (আমিও সেটা দেখেছি)। নাম ক্রিনোলিন। তার জল পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে নীচে গহীন জলাশয় তৈরি করেছিল। প্রতিবেশী ব্রিটিশ মহিলা মিসেস জেমস্‌কে তিনি ন' দশ বছর বয়সে প্রশ্ন করতেন - কতটুকু গভীর এই ছোট্ট জলাশয়টি। মিসেস জেমস্ আশ্চর্য হয়ে শুধাতেন — "আমার সাথে দেখা হলেই এ প্রশ্ন কর কেন বাছা।" আসলে বাবার মৃত্যু হলে তিনি এই জলাশয়ে ডুবে ঐহিক মুক্তির কথা সে বয়সেই ভাবতেন। সুতরাং সকলের মধ্যে থেকেও ইন্দিরা ছিলেন নিঃসঙ্গ জীবন পথিক। প্রিয় বাবার অকাল ও শোচনীয় মৃত্যু, পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা আর নিন্দুকের নিষ্ঠুর পরিহাস তাকে বিবশ করে তুলেছিল। মা ও নিকটজনের পছন্দমতো বিয়ের পাত্র তার জন্য জুটছিল না। রক্ষণশীল সমাজে অনেক বাছবিচার রয়েছে। ইন্দিরার তখন বিধ্বস্ত অবস্থা। মা তাকে নিয়ে অদৃষ্ট বিচারের জন্য এক বিখ্যাত জ্যোতিষীর কাছে যান। মেয়ের ভাগ্যচক্র দেখে গণক বলেছিলেন, "বিয়ে দেওয়ার চাইতে একে দু'টুকরো করে ব্রহ্মপুত্রের জলে ভাসিয়ে দিন।" অর্থাৎ বিবাহ যোগে প্রবল বিড়ম্বনা। তবে ইন্দিরার বিয়ে হয়েছিল স্বনির্বাচিত এক যোগ্য পাত্রের সঙ্গে। সেই দক্ষিণী ইঞ্জিনিয়ার মাধবনের নাম গোড়ায় উল্লেখ করেছি। কর্ণাটকের এই প্রযুক্তিবিদ হিন্দুস্থান কনস্ট্রাকশনের হয়ে গুয়াহাটিতে ব্রহ্মপুত্রের উপর সরাইঘাট সেতু নির্মাণের জন্য এসেছিলেন। থাকতেন ইন্দিরাদের পাড়ায়। ১৯৬২ সালে পরিচয় আর ১৯৬৫ সালে একটি সত্রে তাঁদের বিয়ে হয়। সত্র হল অসমিয়া সমাজে ধর্মচর্চা, সংস্কৃতির অনুশীলন সর্বোপরি সামাজিক মেলবন্ধনের আদর্শ স্থল। (সংক্ষেপ মিলনমন্দিরও বলা যায়)। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মহাপুরুষ শঙ্করদেব প্রবর্তিত নববৈষ্ণব (এক মরমীয়া) ধর্মভাবনা ছিল সত্র স্থাপনের মূলে। পরবর্তীকালে দক্ষিণ কামরূপের এক সত্রকেন্দ্রিক অবক্ষয়ী প্রতিবেশ নিখুঁতভাবে ইন্দিরা গোস্বামীর "উয়ে খোয়া হাওদা" উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায় ইন্দিরার পূর্বপুরুষও সত্রাধিকারী ছিলেন। তাঁদের বহু একর জমির স্বত্ব ছিল।

ইন্দিরার জবানিতে জানা যায় তাঁর স্বামী ছিলেন বিবেকী বুদ্ধিমান এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ইন্দিরার লেখা লেখালেখির স্পৃহা এবং ক্ষমতা ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন। লেখার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত স্ত্রীকে উৎসাহ দিয়েছেন। বস্তুত বিয়ের পর অসমের বাইরে বিভিন্ন স্থানে স্বামীর সঙ্গে থাকার সুবাদে ইন্দিরার সামনে লেখালেখির জন্য এক বিশাল পটভূমি উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন স্থানে সেতু ও বাঁধ নির্মাণের কাজে নিয়োজিত হাজার হাজার শ্রমিক কারিগর ও অন্যান্য কর্মচারীদের সংগ্রাম মুখর জীবনকে লেখিকা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাদের জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করে একাধিক উপন্যাস লিখেছেন। যেমন "চেনাবের স্রোত" ও "মা মরে ধরা তরোয়াল"।

স্বামীর সঙ্গে ইন্দিরা গেছেন পাক সীমান্তে কচ্ছের মরুভূমিতে। কাশ্মীরের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল চন্দ্রভাগার তীরে ও পুঞ্চ সেক্টরের দিকে প্রবাহিত ঠান্ডা পানি তাবি নদীর কাছে। বিশেষ ধরনের সেতু নির্মাণের কাজ ন্যস্ত ছিল মাধবনের উপর। বরিষ্ঠ অফিসার বটে কিন্তু অধস্তনদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ঠান্ডাপানি তাবির কাছ থাকার কালে একটি ছোট্ট ঘটনা লেখিকা ও তার স্বামীর বিচারবোধের এক সুন্দর উদ্‌ভাসন। "ঠান্ডা পানি তাবির" ধারে সীমান্ত সড়ক বাহিনী রাস্তা তৈরির কাজে ব্যাপৃত। সে এক বৃহৎ কর্মকান্ড। ওখানে বি আর টি এফ-এর একটি অফিস রয়েছে যার মুখ্য আধিকারিক একজন মেজর। মেজর সিং। মূলত বি আর টি এফ হল অসামরিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু নানা কারণে সামরিক আদবকায়দা মানা হয়। সামরিক বিভাগের অফিসার ও নিম্নবর্গের কর্মীরাও এখানে ডেপুটেশনে স্বল্পকালের মেয়াদে আসেন। বি আর টি এফ-এর জন্য এটি ছিল নন-ফ্যামিলি স্টেশন। কিন্তু মাধবনদের নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে তো হাজার হাজার কর্মী ওই স্টেশনে রয়েছেন। মেজর সিং মাধবন ও ইন্দিরাকে ব্যাডমিন্টন খেলতে নব নির্মিত কোর্টে আসতে বললেন। ইন্দিরার ইচ্ছা সব ভেদাভেদ ঘুচিয়ে জুনিয়ারদেরও এখানে ডাকা হোক। মাধবন স্ত্রীর সদিচ্ছার কথা এ ভাবে ব্যক্ত করলেন — she will play if you allow the junior engineer, overseer foremen and crane driver to play.

বলাবাহুল্য ব্যাডমিন্টন কোর্ট সকলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল। উচ্চ নীচের সামাজিক ভেদরেখা কত সহজেই না মুছে ফেলা যায়!

ইন্দিরার জীবনে আবার ঘনিয়ে এল আঁধার। বর্ষণমুখর দিনে উধমপুর যাবার পথে পাহাড়ি রাস্তায় জিপ দুর্ঘটনায় মাধবনের মৃত্যু হয়। স্বামীর মহাপ্রস্থান — এমন আচমকা—যুবতী ইন্দিরাকে, তাঁর সমস্ত সত্তাকে, প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে যায়।

মানুষ প্রবল দুঃখে যেমন ফুরিয়ে যায় আবার নিজের মূল্যায়নও করতে পারে। অতলান্ত এক খাদের কিনারে এসে ইন্দিরা যেন নির্গমনের রাস্তা ধরার চেষ্টা করছেন। তিনি কিছুদিন গোয়ালপাড়ার সৈনিক স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। কিছুকাল পর সেখানে ইস্তফা দেন। তার উদ্দিষ্ট স্থান এখন বৃন্দাবন। সেখানে অসমিয়া অধ্যাপক পণ্ডিত প্রবর উপেন্দ্র চন্দ্র লেখারার সৌজন্যে ওরিয়েন্টাল স্টাডিজের কেন্দ্রে উচ্চতর শিক্ষা শুরু হয়। ছোট্ট খুপরি জাতীয় ঘরে দমবন্ধ করা পরিবেশে শুরু হয় তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায়। সেখানে প্রবল কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে তিনি কালাতিপাত করতেন। তখন তাঁর বয়স ত্রিশ ছোঁয়নি। বৃন্দাবনে তাঁর রাধেশ্যামীদের নিদারুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছিল। এঁদের বেশির ভাগই পূর্ববঙ্গ থেকে আসা। পারিবারিক অশান্তির জেরে আর অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা না থাকায় অনেকে ব্রজধামে আসতেন। বালবিধবাদের গলগ্রহ মনে করে অনেকে ঘাড়ের বোঝা নামাতেন এই পুণ্যধামে ফেলে দিয়ে। সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য মন্দির/আখড়ায় মহিলাদের নামকীর্তন করতে হয় নিয়মিত। তাদের থাকা খাওয়ার অবস্থা মোটেই ভাল নয়। বিনা চিকিৎসায় অসুখে ভুগে অনেকে মারা যান। সব চেয়ে মারাত্মক কথা হল মৃত্যুর পর যাতে পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করা যায় তার জন্য নিজেরাই টাকা পয়সার সংস্থান করে যেতেন। যে মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধা বা অশক্ত রোগীর জমানো টাকা নেই তাকে কুটুরি থেকে বের করে রাস্তায় উন্মুক্ত আকাশের তলায় ফেলে দেওয়া হত। ঝড় বৃষ্টি ও দাবদাহ — এ সবের মধ্যে বিপদভঞ্জনের লীলাক্ষেত্রে তাঁরা মৃত্যুর প্রহর গুনতেন। কুটুরিতে মৃত্যু হলে যে শ্রাদ্ধশান্তির খরচ রয়েছে! পুণ্যার্থী কুটুরি - অধিকারী বা মন্দির আখড়া কি সে দায়ভার নেবে! শ্রাদ্ধশান্তি না করলে ভূতের ভয়ও রয়েছে। হায়রে ধর্মাচার! (এ সব অবশ্য আমি নিজে ১৯৮৬ সালে প্রত্যক্ষ করেছি এবং কিছু লেখার বাসনাও ছিল)। যাই হোক ইন্দিরা গোস্বামী এদের দুঃখদুর্দশায় বিচলিত হয়েছেন। আর বৃন্দাবনের এই নিঃস্ব অসহায়দের নিয়ে লিখেছেন কালজয়ী উপন্যাস "নীলকণ্ঠ ব্রজ"। প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৬ সালে। সেই উপন্যাসে সৌদামিণী নামে এক প্রতিবাদী চরিত্র রয়েছে যে বৃন্দাবনে আসার আগে খ্রিস্টান যুবককে ভালবেসেও ধর্মীয় বাধার জন্য জীবনসাথী করতে পারেনি। শান্তির খোঁজে সে এসেছিল ব্রজধামে। এখানে সে যৌনব্যভিচার আর নানা ধরনের লাঞ্ছনার সাক্ষী। সৌদামিণীর প্রশ্ন ছিল সমাজের কাছে – একজন পুরুষ স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিয়ে করার হকদার হলেও একজন নারীর স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিয়ে করতে আপত্তি কেন?

এখানে একটি উল্লেখনীয় বিষয় হল ইন্দিরা গোস্বামীর সাহিত্যসত্তার প্রধানত দু'ধরনের। প্রথমত, তিনি একজন গল্পকার। তাঁর গল্পগুলির অধিকাংশ অসমের পটভূমিতে লেখা। তিনি উপন্যাস লিখেছেন প্রায় এক ডজন। সেগুলির পটভূমি অসমের বাইরে। শুধু "উঁয়ে খোয়া হাওদা" পরিপূর্ণভাবে দক্ষিণ কামরূপের এক সত্রকে কেন্দ্র করে স্থিত ক্ষয়িষ্ণু সমাজের এক মরমি চিত্র। মা মরে ধরা তরোয়াল উপন্যাসটি সাই নদীতে (রায়বেরিলির কাছে) বাঁধ নির্মাণে আসা ডানকান কোম্পানির শ্রমিকদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ন্যায্য দাবি আদায়ের আন্দোলন কিছু নেতাদের হঠকারিতায় সফল হতে পারেনি। এতে রয়েছে আদর্শবাদী যুবক যশোবন্ত, শ্রমিক আন্দোলনে নিম্নবর্গ থেকে উঠে আসা এক উচ্চকোটির মানুষ। নারায়ণী নামে এক নম্রস্বভাবা সুন্দরী অল্পবয়সি মেথরানি। মেয়েটি সুখী সংসারের স্বপ্ন দেখত। অথচ রুগ্ন স্বামী লিচু ল্যাংড়া এবং একমাত্র শিশুপুত্রটির জন্য কোম্পানির লম্পট সাহেবকে দেহদান করতে হয়েছে। নারায়ণীর প্রতি যশোবন্তের নিরুচ্চার প্রেম এই উপন্যাসটির অন্যতম আকর। মজদুরদের অভিভাবক স্বরূপ শম্ভু পাশোয়ান ও রাজনীতির কুচক্রী দালাল শাস্ত্রীজি ও অনামী এক ইউনিয়ন লিডার — যে শ্রমিকদের কষ্টার্জিত টাকায় মাংস ভাত খেতে চায়নি অথচ শ্রমিকরাই তার মাথা ফাটিয়ে দেয় ঢিল মেরে — এ রকম কত চরিত্র এই উপন্যাসে বর্ণিত। "মরচে ধরা তরোয়াল"—এর সঙ্গে আরও যে দুটি অণু উপন্যাস সঙ্কলিত এগুলি যথাক্রমে "উদোম শহর" এবং "বুদ্ধসাগর, মোহিনী গাইসা ও মহম্মদ মুসা"। প্রথমটি রাজধানীর রুক্ষ কংক্রিটের জঙ্গলে মানবতার এক দুর্লভ আখ্যান যার কেন্দ্রীয় চরিত্র উর্মিলা নামে স্বামী বিচ্ছিন্না যুবতী অধ্যাপিকা ও জগন্নাথ নামে বস্তী ঝুগ্‌গির ছেলে। দ্বিতীয়টি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও জাপান ভ্রমণের কিছু টুকরো ছবি ও মানুষের মুখ। তাতে লেখিকা স্বয়ং, ওয়াজ নামে একটি ছেলে ও মহম্মদ মুশার মতো উদারহৃদয় চরিত্র — সব মিলিয়ে এই ভ্রমণ কাহিনি এক অন্যতর বিরল মানবিক দলিল।

আমি ইন্দিরা গোস্বামীর অসংখ্য বাছাই গল্পের মধ্যে অবিস্মরণীয় তিনটি গল্পের কথা উল্লেখ করব। প্রথমটি 'যাত্রা' দ্বিতীয়টি 'পশু' ও তৃতীয় গল্প 'সংস্কার'। পশু গল্পটিতে রানি রিজার্ভের হাতি মহলকে কেন্দ্র করে প্রকৃতি ও মানুষের কথা সংবদ্ধ করেছেন। 'যাত্রা' গল্পে লেখিকার গভীর প্রকৃতিপ্রেম

লিপিবদ্ধ হয়েছে। মীরাঝকার নামে অধ্যাপকের মনে অসমের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সম্পর্কিত শঙ্কা ছিল। পরে প্রকৃতির শোভারাজি আর গ্রামের নয়নশোভন চিত্র গল্পে প্রাধান্য পায়। অথচ গল্পের অন্যতম উপজীব্য সন্ত্রাসবাদজর্জরিত অসমের একটি খণ্ড কিন্তু মর্মস্পর্শী দিক। বহু মাত্রিক কাহিনিটি অতি সুন্দর কুশলী হাতে সুগ্রথিত করেছেন।

'সংস্কার' গল্পটি লেখিকার এক সাহসী পদক্ষেপের পরিচয় বহন করে। দময়ন্তী নামে এক ব্রাহ্মণ যুবতী দু'দুটি মেয়েকে নিয়ে বৈধব্য জীবন কাটাচ্ছে। অন্নসংস্থানের জন্য সে কলেজ পড়ুয়া ছেলেকে দেহদান করে। একাধিক বার তার গর্ভপাতও হয়েছে। গ্রামের সম্পন্ন ব্যবসায়ী পীতাম্বরের বংশরক্ষার সম্ভাবনা নেই। তাঁর স্ত্রী চিররুগ্না। এক চতুর ব্রাহ্মণ মধ্যস্বত্বভোগীর দাবি নিয়ে পীতাম্বরের কাছে টোপ দিল — আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব, তুমি দময়ন্তীকে বিয়ে করো। সুন্দরী উদ্ভিন্নযৌবনা দময়ন্তীকে স্ত্রী হিসাবে পাবে, তার বংশ রক্ষা হবে। কৃষ্ণকান্ত তাকে চমৎকার স্বপ্নের সন্ধান দিয়েছে। কৃষ্ণকান্তের মধ্যস্থতায় এক রাতে দৈহিক মিলনের ব্যবস্থা হয়েছিল। দময়ন্তী কুশলী কলগার্লের মতো প্রশ্ন করেছিল — "টাকা পইসা কিবা আনিছনে?" পীতাম্বর প্রথমে হতচকিত হয়ে পড়ে। পরে সামলে বলে, "মোর যি আছে সকলো তোমার"। পীতাম্বর তক্ষুণি একটি ছোট ব্যাগে তাকে টাকা পয়সা দেয়। এবং দময়ন্তী গর্ভবতী হয়। পীতাম্বর তাকে সংক্ষিপ্ত ধর্মাচারের মাধ্যমে বিয়ে করতে আগ্রহী। দময়ন্তী আগে রাজি ছিল। সে অনিশ্চিত জীবন থেকে নিরাপদ পঙ্কপুট চেয়েছিল। কিন্তু কালে কালে তার মনে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তার আবাল্যলালিত অন্তরস্থিত মূল্যবোধ বাধা হয়ে দাড়ায়। সে অব্রাহ্মণ বানিয়ার ঘরনি হতে আর চায়নি। সে গোপনে গর্ভপাত করে। হঠাৎ এই সংবাদ শুনে পীতাম্বর ঋটিতি চলে আসে। উন্মাদের মতো রাতের অন্ধকারে এসে গর্ত খুঁড়ে দময়ন্তীর অদূরে যে মাংস পিণ্ডটি তুলে ধরল তা দেখে অপ্রস্তুত দময়ন্তী শুধালো, "এ দিয়ে কী করবে?" "ছুঁয়ে দেখবো, প্রাণ ভরে দেখবো, এ যে আমার বংশধর!" পীতাম্বরের হৃদয় থেকে অব্যক্ত আকুতি হাহাকার হয়ে ঝরে পড়ল!

ইন্দিরা গোস্বামীর সমস্ত সৃষ্টিসম্ভার যে রসোত্তীর্ণ তা নয়। অতি নাটকীয় মুহূর্ত, চমক, পুনঃপৌণিকতার ছায়া বিভিন্ন কাহিনিতে লক্ষ করেছি। কিন্তু সবচেয়ে লক্ষণীয় দিক হল মিস্টিক ধর্মীতা, ধর্মজিজ্ঞাসা, রামায়ণ সাহিত্য নিয়ে পঠনপাঠন তাঁর বৌদ্ধিক জগতকে একদিকদর্শী করেনি। এর মূলে রয়েছে সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি ইন্দিরার অপার ভালবাসা ও অবিমিশ্র সহমর্মিতাবোধ। তাই তিনি মানুষের জীবনযন্ত্রণা, দুর্মর আশা ও সুখ দুঃখের নানা দিক তার সহজ অননুকরণীয় শৈলীতে তুলে ধরেছেন। নির্মোহ ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে জীবনের জটিলতাকে হৃদয়ঙ্গম করেছেন ও অনায়াস মুনশিয়ানায় এ সবের ছবি এঁকেছেন।

চতুরঙ্গ পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিবরণী

১। প্রকাশস্থান — ৫৪, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা — ৭০০ ০১৩

২। প্রকাশের ব্যবধানকাল — ত্রৈমাসিক

৩। মুদ্রক — নীরা রহমান, জাতীয়তা — ভারতীয়। ঠিকানা — ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০১৩

৪। প্রকাশক — নীরা রহমান, জাতীয়তা — ভারতীয়। ঠিকানা — ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০১৩

৫। সম্পাদক — আবদুর রাউফ, জাতীয়তা — ভারতীয়

৬। স্বাত্বাধিকারীদের নাম ও ঠিকানা — নীরা রহমান। ঠিকানা — ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০১৩

আমি নীরা রহমান, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উল্লিখিত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

নীরা রহমান
স্বাক্ষর

ছোটগল্প

কপিরাইট

অমিতাভ রায়

আগস্টের বিষণ্ণ সকাল। গত কয়েক দিনের মতো আজও আকাশ কালো মেঘে আবৃত। তবে আজকের পরিবেশ কিঞ্চিৎ ভিন্ন। মেঘের পরে মেঘ এসে আকাশটাকে ঢেকে দেওয়ার সময় পূর্ব দিকের পলেস্তারাগুলো হয়ত ঠিক মতো একের পর আর একটা পরেনি। সামান্য ফাঁকফোকর বোধ হয় থেকে গেছে। অথবা ওদিককার মেঘের ঘনত্ব একটু কম। এমনও হতে পারে যে সদ্য হয়ে যাওয়া বৃষ্টির পশলায় আকাশের পুব কোণটার গাঢ় ভাবটা কিছুটা হাল্কা হয়ে গেছে। যেভাবেই হোক না কেন এই সুবাদে এক চিলতে চকচকে রোদ বেরিয়ে পড়েছে। ভাল-ই দেখাচ্ছে। দন্ত বিকশিত কালো ভালুকের সঙ্গে বিষয়টার বেশ মিল আছে। কিংবা সোনালি পাড়ের কালো রঙের শাড়ি। তবে শান্ততা বিদ্যমান। রবিরশ্মির আবির্ভাবে বিষণ্ণ সকালের বিষাদের মাত্রাহানি হয়নি। রাস্তার দু'পাশের নবীন-প্রাচীন গাছপালাগুলোকেও বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। বৃষ্টিতে ধুলো-ময়লা সাফ-সুথরো হয়ে গেছে। বৃষ্টি বিধৌত গল্ফ লিংক-এর কালো পিচের রাস্তাটাও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন লাগছে। গল্ফ লিংক-এর বাড়িগুলোর অধিকাংশই সাধারণভাবে পূর্বমুখী। রাস্তার পশ্চিম পারে মাঝারি আয়তনের এক ঝাঁক অভিজাত আবাসগৃহ। আর রাস্তার পূর্ব সীমানা জুড়ে পড়ে রয়েছে দিল্লির ঐতিহ্যশালী গল্ফ কোর্স। সযত্ন লালন-পালনে রচিত সবুজ ঘাসের এক দিগন্তপ্রসারী কার্পেট। এই সকালে বর্ষণস্নাত ঘাসের পাতায় জমে থাকা জলবিন্দু রোদের ছটায় ঝিকমিকিয়ে উঠেছে। এখনও এখানে নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা বিরাজমান। প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে সোজা রাস্তায় অথবা পেছনের দরজা দিয়ে সংগৃহীত সদস্যপদের মালিকেরা এত সকালে গল্ফ কোর্সে সদর্প পদক্ষেপণে অভ্যস্ত নয়।

তবে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। প্রায় প্রতিটি বাড়ির দোতলার অলিন্দে একাধিক প্রভাতী সংবাদপত্র রাবার ব্যান্ড-এর বন্ধনীতে কুণ্ডলী পাকিয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আইনের বাঁধনে কিংবা কোনও অজ্ঞাত কারণে গল্ফ লিংক-এ প্রায় সব বাড়িই দ্বিতল। চিলেকোঠা বা বর্ষাতি ছাড়া তিনতলার ছাদে অন্য কোনও ঘরের অস্তিত্ব এ পাড়ার কোনও বাড়িতে না থাকায় গল্ফ লিংকের একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা আছে। এই উচ্চতার নামই কি আভিজাত্য—বলা মুশকিল। আভিজাত্যজনিত কারণে অথবা অন্য কোনও প্রয়োজনে এ পাড়ার অধিকাংশ বাড়িরই একতলায় সাধারণত কেউ বসবাস করে না। পরিবর্তনের উন্মাদনায় মত্ত পৃথিবীতে গল্ফ লিংক যেন এক বিশিষ্ট ব্যতিক্রম।

বোধ হয় আরও বড় ব্যতিক্রম এ পাড়া তথা এই বাড়ির প্রবীণতম ব্যক্তিত্ব—প্রবাসজীবন। এখানকার এই একটি মাত্র বাড়ির নেমপ্লেটে এখনও বাংলা ভাষার অস্তিত্ব বর্তমান। শ্বেত প্রস্তরখণ্ডের উপর বাংলা ও ইংরেজিতে 'রায়চৌধুরি' শব্দটা জ্বলজ্বলে হয়ে ফুটে আছে। বাড়ির ভেতরে প্রবাসজীবনের গুরুগম্ভীর আচরণের ছাতার নীচে বসবাস করে রায়চৌধুরি পরিবার, মানে,-উননবই বছরের বিপত্নীক প্রবাসজীবন, তাঁর একমাত্র পুত্র পার্থসারথি এবং তার স্ত্রী সুজাতা।

বিগত সত্তর বছরের ধারাবাহিকতায় আজও সকাল পাঁচটায় প্রবাসজীবন শয্যা ত্যাগ করেছেন। গত ষাট বছরের প্রতিটি দিনের মতো আজও ব্যতিক্রমবিহীন বিধিতে জল গরম করে সুদৃশ্য টি-পটে ঢেলেছেন। সেরা মানের চা। ভিজতে একটু সময় না দিলে সুবাস পাওয়া যায় না। কাজেই টি-পটের ওপর টি-কোজি চাপিয়ে দিয়ে প্রবাসজীবন বাথরুমে গেলেন। দাঁতের ব্যাপারে এই বয়সেও তিনি স্বয়ম্ভর। কৃত্রিম নয়, এখনও একটি দাঁতও পড়েনি।

এক এক করে চিনির পাত্র, পিরিচ, পেয়ালা একটি ঝকঝকে ট্রে-র উপর সাজিয়ে রাখার পর প্রবাসজীবন ফ্রিজ খুলে দুধের পাত্র বের করলেন। ছোট একটি পাত্রে সামান্য দুধ ঢেলে নিয়ে গ্যাস-স্টোভে বসিয়ে দিলেন। বিয়ের পর থেকে স্ত্রী মারা যাওয়া পর্যন্ত বারো বছরও তিনি এই কাজটুকু নিয়মিত করে গেছেন। তখন শুধু একটা বাড়তি পেয়ালা-পিরিচ ট্রে-তে সাজানো হত।

পাঁচটা কুড়ি। চা-এর ট্রে হাতে করে উননববই বছরের প্রবাসজীবন বসার ঘরে উপস্থিত। সেন্টার টেবিলে ধীরেসুস্থে ট্রে-টা রাখলেন। বারান্দার দিকের পর্দাটা টেনে একটু সরিয়ে দিয়ে নিচু সোফাটায় আয়েস করে বসলেন। এতদিন ধরে কীভাবে যে প্রতিদিন সময় মেপে নিয়ম রক্ষা করে চলেছেন তা ভেবে মাঝে মাঝে নিজেই আশ্চর্য হন। বিয়ের পর প্রথম প্রথম ওঁর স্ত্রী অঞ্জলি ঘড়ি ধরে এমন বিচিত্র আচরণের কারণ বুঝতে পারতেন না। তবে কিছু দিনের মধ্যেই অঞ্জলি নিজেকে স্বামীর নিয়মতান্ত্রিকতার

হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। প্রথম পেয়ালা চা শেষ হতে না হতেই ফোনটা বেজে উঠল। প্রবাসজীবন হ্যালো বলার আগেই ওপাশ থেকে ভেসে এল, - বাবা, তোমার নাতির নামকরণ করো। কলকাতা থেকে পার্থসারথির ফোন।

-এঁড়েটা কখন হল? বউমা কেমন আছেন?

পিতৃদেবের এমন মন্তব্যে সম্ভবত কথার খেই হারিয়ে ফেলে পার্থসারথি বলে বসল,-মা-ছেলে দু'জনেই ভাল আছে।

প্রবাসজীবন বোধ হয় নিজের রসিকতাকে সংশোধনের জন্যই প্রশ্ন করলেন,-জন্ম সময়? কলকাতা থেকে উত্তর এল,- ভোর পাঁচটা।

-ব্যাটা আর সময় পেল না! দিনের প্রথম চায়ের সময়টাতেই হানা। হাসতে হাসতে প্রবাসজীবন মন্তব্য করলেন,- কন্‌গ্র্যাচুলেশনস্!

দুই

বাবা সত্যেন্দ্রনাথের চাকরি কলকাতা থেকে দিল্লিতে বদলি হওয়ার জন্য ১৯১১-য় মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় প্রবাসজীবনের দেশের নতুন রাজধানীতে আগমন। সুদূর যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার রায়চৌধুরি বাড়ির দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ কী করে কলকাতায় সরকারি চাকরি পেয়েছিলেন নড়াইলের ডাকসাইটে উকিল সতীশচন্দ্র মানে প্রবাসজীবনের ঠাকুরদা জানতেন না। তবে তিনি খুশি হয়েছিলেন।

অবশ্য খুশি হওয়ার কারণ ছিল ভিন্ন। সতীশচন্দ্রের বড় ছেলে সুরেন্দ্রনাথ ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তারপর থেকেই দেশসেবার নেশায় মশগুল। দেশের কাজে আরও অনেক বড় দায়িত্ব পালনের জন্যই হয়ত বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পরেই সুরেন্দ্রনাথ কলকাতায় ঘাঁটি গাড়েন। অছিলা ছিল যে তিনি স্বদেশি শিল্প গড়ে তুলবেন। অজুহাতটা সতীশচন্দ্রের পছন্দ হয়নি। সেই জন্য অল্প কিছু দিন বাদেই যখন সত্যেন্দ্রনাথ দাদার অনুগামী না হয়ে ব্রিটিশ সরকারের চাকরি নিয়ে কলকাতা যাত্রা করেন তখন সতীশচন্দ্র মানসিক ভাবে সন্তুষ্টই হয়েছিলেন। নড়াইলের মহকুমা আদালতের জমজমাট আঙিনায় দাঁড়িয়ে তিনি কলকাতাবাসী দ্বিতীয় পুত্রের কথা গর্বভরে উচ্চারণ করতেন। গর্বিত সতীশচন্দ্র সেই আনন্দে তৃতীয় পুত্র সৌরীন্দ্রনাথকে আইন পড়ার জন্য কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন।

সৌরীন্দ্রনাথকে কলকাতায় পাঠানোর আগেই অবশ্য সতীশচন্দ্র মধ্য কলকাতার ফকির দে লেন এলাকায় ঢাকার বিখ্যাত দাস পরিবারের কাছ থেকে একটা বাড়ি বেশ সস্তায় কিনে নিয়েছিলেন। বাড়ি কেনার কিছু দিনের মধ্যেই সতীশচন্দ্র দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের বিয়ের আয়োজন করলেন। খটা করেই বিয়ে হল। বিয়ের পর সদলবলে নড়াইল থেকে রওনা হওয়ার আগে সতীশচন্দ্র স্থির করলেন চতুর্থ পুত্র সত্যেন্দ্রনাথও এবার কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করুক। আরও পরে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছু দিন আগে, বাজারে আগুন লাগা আরম্ভ হতেই তিনি নিজেও সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন। তবে সে তো অন্য কাহিনি।

সত্যেন্দ্রনাথের বিয়ের কিছু দিনের মধ্যেই স্থির হল দেশের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে চলে যাবে। সত্যেন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছিলেন যাতে কলকাতায় থেকে যাওয়া যায়। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। ভাইয়েদের কলকাতায় রেখে সস্ত্রীক সত্যেন্দ্রনাথকে দিল্লি চলে যেতে হল। নিজের প্রবাস জীবন শুরুর অল্প কিছুদিন বাদেই জন্ম হওয়ায় সত্যেন্দ্রনাথ ছেলের নাম রাখেন প্রবাসজীবন। এ সব গল্প প্রবাসজীবন শৈশবে মায়ের কাছে শুনেছেন। আজ এই মুহূর্তে এসব কথাই তাঁর ভীষণভাবে মনে পড়ছে। অথচ, এতক্ষণে টি-পট থেকে দ্বিতীয়বার পেয়ালায় চা ঢালার কথা। সুদীর্ঘ ষাট বছরের অভ্যাসে এহেন ব্যতিক্রমের কারণ সম্ভবত সংসারে নতুন প্রজন্মের আবির্ভাব। উত্তরসূরির উপস্থিতির খবর পাওয়ার পরের এই মুহূর্তগুলোতে প্রবাসজীবনের মনের ভেতরে পূর্বসূরিদের কথা যেন ঢেউ-এর পর ঢেউ-এর মতো আলোড়িত হচ্ছে। তিনি যে খুব সচেতনভাবে এত কিছু ভাবছেন, তা নয়।

ঠাকুরদা সতীশচন্দ্রের নির্দেশে ডাক্তার হওয়ার পরেই প্রবাসজীবনকে বিদেশ যেতে হয়। প্রায় একই সঙ্গে অথবা একটু আগে-পরে বুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাইদেরও উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যেতে হয়েছিল। অন্য নাতিদেরও সতীশচন্দ্রই আইন অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য বিদেশ পাঠিয়েছিলেন। সতীশচন্দ্রের একটা ধারণা ছিল যে শিক্ষিত লোকের গায়ে একটা বিলিতি ছাপ না থাকলে দাম বাড়ে না। প্রবাসজীবন ভাবেন, আজও কথাটা কত বড় সত্যি। সতীশচন্দ্রের বুদ্ধি-বিবেচনা-দূরদর্শিতায় তিনি আজ এই এতদিন পরেও মুগ্ধ হন। এডিনবরা থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চ শিক্ষা শেষ করার পরই দেখা দিল এক কঠিন সমস্যা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। দেশে ফেরা যাচ্ছে না। ওদিকে ব্রিটিশ সরকার তরুণ ডাক্তারদের সেনাবাহিনীতে জুড়ে দিতে ব্যস্ত। দেশে যখন ফেরাই যাচ্ছে না তখন যুদ্ধে গেলে ক্ষতি কী, এমন একটা ভাবনা থেকেই সেনাবাহিনীতে যোগ দিলের ডাক্তার প্রবাসজীবন রায়চৌধুরি। খবরটা দিল্লিতে আগেই পৌঁছেছিল। কয়েকদিন বাদে এল কলকাতায়। ততদিনে সতীশচন্দ্র পাকাপাকিভাবে কলকাতার বাসিন্দা। প্রবাসজীবন পরে জেনেছিলেন যে যুদ্ধে যাওয়ায় সতীশচন্দ্র অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সতীশচন্দ্রকে না জানিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ায় নাকি যুদ্ধে যাওয়ার জন্যই বিরক্তি, তা প্রবাসজীবনের জানা হয়নি। কারণ যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে দ্বিধাবিভক্ত স্বাধীন দেশে প্রবাসজীবন ফিরে আসার আগেই সতীশচন্দ্রের মৃত্যু ঘটে।

দিব্যি সুস্থ সবল মানুষটা ছেলে-মেয়ে-নাতি-নাতনি নিয়ে হই চই করে দিন কাটাচ্ছিলেন। মাঝে-মধ্যে নড়াইল যান। জমি-জমার তদরকি করে আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। বাংলাকে দু'ভাগ করার খবরটা রেডিওতে শোনা মাত্রই তাঁর বুকে শুরু হল অসহনীয় ব্যথা। ডাক্তার এসে ব্যথার কারণ অনুসন্ধানের সুযোগ পায়নি। তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রবাসজীবনের মনে পড়ল, জ্যাঠামশাই সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুটাও বেশ আকস্মিক। পিতার মৃত্যুজনিত শোকের চাপ সুরেন্দ্রনাথ সহ্য করতে পারলেও জাতির জনকের হত্যার খবরটা মেনে নিতে পারেননি। এমনইতেই স্বাধীনতার পর থেকে সুরেন্দ্রনাথ কেমন যেন নির্বাক হয়ে পড়েছিলেন। ভীষণভাবে মুষড়ে পড়া মানুষটা সাধারণত কারও সঙ্গেই কথা বলতেন না। মাঝে মাঝে শুধু নিজের মনে বিড়বিড় করতেন,-ওরা ক্ষমতার জন্যে দেশটাকে ভাগ করে দিল। তাঁর অত সাধের স্বদেশি শিল্পের বারোটা বেজে গেল। দেশভাগের বিভীষিকায় আচ্ছন্ন সুরেন্দ্রনাথ গান্ধীজির মৃত্যু সংবাদ শোনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একই রকম ভাবে বিড়বিড় করতে করতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। স্বাধীন দেশে স্বদেশি শিল্পের সমৃদ্ধি-শ্রীবৃদ্ধি তাঁর আর দেখা হল না।

পর পর দুটি আকস্মিক মৃত্যুতে নড়াইলের রায়চৌধুরি পরিবার একটু থমকে গিয়েছিল। এতকালের ছন্দোবদ্ধ জীবনযাপন প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক গতি হঠাৎই যেন একটু রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। বিশেষত মাথার উপর অমন বটগাছের মতো ছাতা মেলে থাকা সতীশচন্দ্রের জীবনাবসানে পুরো রায়চৌধুরি পরিবারটাই একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। সামাল দিতে প্রবাসজীবনের বাবা সত্যেন্দ্রনাথ দিল্লির পাট উঠিয়ে দিয়ে চলে এলেন কলকাতায়। তা ছাড়া চাকরির মেয়াদও প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে যাওয়ায় এবং প্রবাসজীবন ছাড়া অন্য ছেলে-মেয়েরা দিল্লিতেই নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে পড়ায় সত্যেন্দ্রনাথ কোনও পিছুটান না রেখেই কলকাতায় চলে আসতে পেরেছিলেন। কয়েক মাস পরেই দেশে ফিরে এলেন প্রবাসজীবন। ততদিনে তিনি পুরোপুরি সাহেব। মিলিটারি শৃঙ্খলায় বাঁধা পড়ে গেছে তাঁর আচার-আচরণ, চলন-বলন, এক কথায় সবকিছু। তবু তিনি প্রথম সুযোগেই ফিরে এলেন কলকাতায় — মা-বাবার কাছে — ফকির দে লেন-এর সেই যৌথ সংসারে।

প্রবাসজীবনের মনে পড়ে, কী অশান্তি-অস্থিরতার মধ্যেই না কেটেছিল সেই দিনগুলো। সরকারি চাকরিতে ঢুকবেন নাকি নিজেই চেম্বার সাজিয়ে বসবেন। ওদিকে বড়দের মত, সবার আগে বিয়েটা সেরে ফেলা উচিত; এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু সরাসরি কথাটা কেউ তাঁকে বলতে সাহস করছেন না। একেই সাহেবদের দেশে লেখাপড়া শেখা ডাক্তার তায় মিলিটারি-কী বলতে কি বোঝে — কে জানে। আবার এতদিনে বিদেশ-বিভূঁয়ে পড়ে থাকার জন্য গড়ে ওঠা দূরত্বটা ভেঙে প্রবাসজীবনও বেরিয়ে আসতে পারছেন না। সব কিছু মিলেমিশে সে এক বিচিত্র পরিস্থিতি।

ঠিক সেই সময়ে আচমকাই একটা যোগাযোগ হয়ে গেল। প্রবাসজীবনের প্রয়াত জ্যাঠামশাই সুরেন্দ্রনাথের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু দিল্লি থেকে কলকাতায় এসেই ফকির দে লেনের রায়চৌধুরি বাড়িতে উপস্থিত। লাল বাতি জ্বালানো সরকারি গাড়ি, আগে-পিছে পুলিশ। সবাই একটু ঘাবড়েই গেছিল। প্রবাসজীবনের বাবা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে কথাবার্তার পর কী হল কে জানে,- যে ক'দিন কলকাতায় ছিলেন, রোজই একবার নিয়ম করে রায়চৌধুরি বাড়িতে টু মারতেন।

বিলিতি কেতায় অভ্যস্ত প্রবাসজীবন বাইরের লোকেদের সঙ্গে সচরাচর আগ বাড়িয়ে কথা বলা পছন্দ করতেন না। ক্ষমতার সওয়ারি ভদ্রলোকও উদ্যোগী হয়ে প্রবাসজীবনের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে যাননি। তবে একেবারে শেষ দিনে, মানে সেই যাত্রায় কলকাতা থেকে দিল্লি ফিরে যাওয়ার দিন সকালে রায়চৌধুরি বাড়িতে পদার্পণের পর তিনি এমন ভঙ্গিতে প্রবাসজীবনের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলেন, তা-তে মনে হল-প্রবাসজীবন তাঁর অনেক কালের চেনা। সদ্য বিদেশ প্রত্যাগত তায় ফৌজি, প্রবাসজীবনও ভদ্রলোকের মুখের উপর সেদিন বেশি কথা বলতে পারেননি। — তা হলে ডাক্তারবাবু, এবার তুমি ঠিক করে ফেল,- কোথায় বসে কাজ করবে? কলকাতা না দিল্লি? কোনটা তোমার পছন্দ? এখানে থাকলে ডাক্তার রায় তোমায় কাজে লাগাবেন। আর দিল্লি এলে পণ্ডিতজি তোমার কাঁধে অনেক বড় দায়িত্ব চাপিয়ে দেবেন। তোমার ব্যাপারে দু'জনেই ভীষণ উৎসাহী। এখন তোমায় ঠিক করতে হবে, কোথায় কাজ করবে? তবে আমার মতে বিশ্বযুদ্ধ ঘুরে আসা বিলিতি ডাক্তারের চওড়া কাঁধে রাজ্যের নয়, সারা দেশের দায়িত্বটাই মানাবে ভাল। ভদ্রলোক গাঁক গাঁক করে এমন দাপিয়ে কথাগুলো বলেছিলেন যে সেদিন প্রবাসজীবন একটাও কথা ভালভাবে বলতে পারেননি।

আজও প্রবাসজীবনের মনে পড়ে সেদিন কী অস্বস্তিটাই না হয়েছিল। কোনও রকমে আমতা আমতা করে বলেছিলেন, এতদিন বাদে দেশে ফিরলাম। আর কয়েকটা দিন যাক, তারপর কিছু একটা ভেবে-চিন্তে ঠিক করা যাবে।

জ্যাঠামশাই-এর বাল্যবন্ধু হয়ত এমন একটা উত্তরই আশা করেছিলেন। প্রবাসজীবনের মুখের কথা প্রায় কেড়ে নিয়েই বলেছিলেন, ঠিকই তো। সময় নাও না। এতদিন পরে দেশে ফিরেছ, বিশ্রাম নেবে বইকি। বিশ্রাম নিয়ে যখন ক্লান্তি আসবে তখন না হয় ভেবে দেখবে। তবে আমি বলছিলাম যে দুটো শহরই তোমার চেনা। দিল্লিতে তোমার ছোটবেলা কেটেছে। কলেজ জীবন

কলকাতায়। তার উপর এতদিন বিদেশে ছিলে। সব চেয়ে বড় কথা যে সে যুদ্ধ নয় রীতিমতো বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তোমার আছে। আজ দেশ গড়ার যুদ্ধে তোমার মতো সৈন্যই তো দরকার। ডাক্তার রায়, পণ্ডিতজি দু'জনেই তোমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

ডাক্তার রায় বা পণ্ডিতজি শব্দগুলো ভদ্রলোক এমন সহজভাবে উচ্চারণ করেছিলেন যে প্রবাসজীবন বুঝতেও পারেননি উনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা দেশের প্রধানমন্ত্রীর কথা বলছিলেন। প্রবাসজীবন কিন্তু আত্মবিশ্বাস না হারিয়ে সংক্ষেপে বলেছিলেন,- সরকারি চাকরি করলে আপনাকে নিশ্চয়ই জানাব। কলকাতা না দিল্লি করতে করতে অবশেষে মায়ের ইচ্ছাতে দিল্লিতেই চলে এলেন। ভাই-বোনেরা ততদিনে দিল্লিতে দাঁড়িয়ে গেলেও মায়ের ধারণা হয়েছিল যে প্রবাসজীবন দিল্লি গেলে সকলের মাথার উপর একটা ছাতা হবে।

তিন

উনিশশো পঞ্চাশের জানুয়ারি থেকে ডাক্তার প্রবাসজীবন রায়চৌধুরি আবার দিল্লিবাসী। কৈশোর-যৌবনের সীমানায় যে প্রবাসজীবন একদা ঘটনাচক্রে কলকাতা বেড়াতে গিয়ে দিল্লি ছেড়েছিলেন তার সঙ্গে প্রায় তিরিশ বছর পরের ডাক্তার প্রবাসজীবনের বয়স-শিক্ষা-জ্ঞান-অভিজ্ঞতার ফারাক তো থাকারই কথা। তবে সবচেয়ে বড় পার্থক্যটা ছিল নিয়মানুবর্তিতা। ফৌজি নিয়ম-কানুনের শৃঙ্খলায় বাঁধা প্রবাসজীবন দেশ গঠনের দায়িত্ব নিয়ে দিল্লিতে কর্মজীবন শুরু করলেন। ভাই-বোনেদের উপরে নজর রাখার জন্য মায়ের পরামর্শে দিল্লিতে নতুন করে বসবাস শুরু করলেও ডাক্তার প্রবাসজীবন রায়চৌধুরি সারা দেশের স্বাস্থ্যের উপর নজর রাখার কাজেই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়লেন।

না, তিনি রাজনীতি করেননি। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একটানা ডাক্তারি করার পর বিকেলের দিকে সরকারি দপ্তরে বসতে হত। সাম্মানিক পদ। দেশের স্বাস্থ্য-নীতি প্রণয়নের জন্য রাত নটা-দশটা এমনকী কোনও কোনও দিন রাত এগারোটা-বারোটা পর্যন্ত কাজ করে যেতেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ডাক্তার-অধ্যাপক-প্রশাসকদের ডেকে পাঠিয়ে জেনে নিতে হত দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল-হকিকত। সেই সব খবরের ভিত্তিতে আলোচনা করতে হত নীতি-নির্ধারকদের সঙ্গে। কারণ বিশেজ্ঞরা যত ভাল ভাল পরামর্শই দিন না কেন শেষ পর্যন্ত নীতি-নির্ধারণের দায়িত্বপ্রাপ্ত জনপ্রতিনিধিরাই এ দেশে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সুতরাং সেই সব পদাধিকারীদের সামনে কঠিন-জটিল সমস্যাগুলি সহজ-সরলভাবে পেশ করে বাস্তবানুগ নীতি প্রণয়নকেই তিনি নিজের দায়িত্ব বলে মনে করে কাজ করে যেতেন। স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রকৃত পরিস্থিতির সঙ্গে দিল্লির চিন্তার কত ফারাক তাও তাঁকে মন দিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সমাধানের পথ খুঁজতে হত। তা ছাড়া সরকারি সিদ্ধান্ত দেশের কোথায় কী রকম ভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে বা রূপায়ণের ক্ষেত্রে কী কী সমস্যা দেখা দিচ্ছে সে সব খুঁজে বের করাটাও ছিল তাঁর অন্যতম কাজ। এর সঙ্গে তো পড়াশোনার পাট ছিলই। তাঁর ধারণা, চিকিৎসাশাস্ত্রের আধুনিকতম তথ্য নখদর্পণে না থাকলে পেশার প্রতি অবিচার করা হয়। অতএব, নিয়মের নিগড়ে নিজেকে বেঁধে রেখেও প্রবাসজীবন ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চললেন। স্বভাবতই ভাই-বোন, আত্মীয়-পরিজন সব কিছু জীবন থেকে হারিয়ে গেল। নিয়ম মেনে দায়িত্ব পালনের দাপটে নড়াইলের সুবিশাল রায়চৌধুরি পরিবারের অন্যতম সদস্য প্রবাসজীবন সমাজ-সংসার বিচ্ছিন্ন এক নিঃসঙ্গ মানুষে পরিণত হলেন।

মা-বাবা অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি। এবং প্রবাসজীবনও মা-বাবার কথা মেনে নিয়ে অঞ্জলিকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু তা-তে তাঁর জীবনযাপন প্রক্রিয়ায় কি কোনও পরিবর্তন এসেছিল?

অগস্টের এই বৃষ্টি ভেজা সকালে এ সব কথাই বারে বারে প্রবাসজীবনের মনে পড়ছিল। হয়ত সে জন্যই একটু নিয়মের ব্যতিক্রমও হয়ে গেল। হঠাৎই দ্বিতীয় পেয়ালা চায়ের কথা খেয়াল হল। পটের থেকে দ্বিতীয়বার চা পেয়ালায় ঢালতে গিয়ে বুঝতে পারলেন যে ঢাকাচুকি দেওয়া সত্ত্বেও পটের চা-টা আর গরম নেই। ওটা আর মুখে দেওয়া যাবে না, তবে আজকের এই ব্যতিক্রমে তিনি দুঃখ পেয়েছেন বলে মনে হল না। একই ভাবে বসে তিনি ভাবনার অকূল সাগরে ভেসে চলেছেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর মনে হল, নবজাতক এবং তার মায়ের যত্ন-পরিচর্যা ঠিক মতো হচ্ছে তো! চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান এবং নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বিষয়টাকে এই মুহূর্তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে তাঁর মনে হল। একবার ভাবলেন কলকাতায় ফোন করে এ ব্যাপারে পার্থসারথিকে একবার বলে দিলে কেমন হয়। পরের মুহূর্তেই মনে হল, এটা বোধ হয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। পার্থসারথি শুধু শিক্ষিতই নয় বুদ্ধিমান ছেলে। তা ছাড়া বেয়াইমশাইও অভিজ্ঞ ডাক্তার। আসলে তাঁর মনে পড়ছিল যে এই বিষয়টার উপর যথাযথ নজর দিলে পার্থসারথি হয়ত জন্মলগ্নেই মাতৃহারা হত না।

অন্য অনেক অবসর সময়ে যেমন স্মৃতির গহনে ডুব দিয়ে প্রবাসজীবন পুরনো দিনগুলোতে বিলীন হয়ে যান আজও তেমনই ভাবেই তাঁর মনে হল, বিয়ের পরে কাজের জোয়ারে অমন ভাবে কাঁপিয়ে না পড়ে, ঘর-সংসারের জন্য কিছুটা সময় দিলে আজ হয়ত এই আনন্দের মুহূর্তে জীবনসঙ্গিনী অঞ্জলি পাশেই থাকতেন। ক্ষণেকের জন্য স্ত্রীর মুখটাও প্রবাসজীবনের স্মৃতিতে ভেসে উঠল। হঠাৎই তাঁর মনে হল, সত্যিই অঞ্জলির দিকে একটু নজর দেওয়া উচিত ছিল। আজ এতদিন পরে, ঠিক এই মুহূর্তে স্ত্রীর মৃত্যুর

জন্য তাঁর একটু অনুশোচনাও হল। এতটুকু যত্ন নিলে অঞ্জলিকে হয়ত বাঁচানো যেত। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রবাসজীবনকে চাবুক মেরে বলিয়ে নিল, হয়ত কেন, নিশ্চয়ই বাঁচানো যেত। কিন্তু অঞ্জলিকে বাঁচানো যায়নি, এটাই বাস্তব। কাজ আর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যেই হারিয়ে গেছিল দাম্পত্য জীবনের সুখ-প্রেম-আবেগ-দায়িত্ব। না হলে পার্থসারথির জন্মের আগে অঞ্জলির শরীরের অবস্থা কেমন ছিল সে বিষয়ে তিনি নিশ্চয়ই খোঁজ-খবর নিতেন। ব্যস্ততার জালে জড়িয়ে গিয়ে তিনি ভুলে গেছিলেন যে বিয়ের বারো বছর বাদে অঞ্জলি প্রথম মা হতে চলেছেন। যথেষ্ট সাবধান হওয়া দরকার। অঞ্জলির চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্রে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে প্রবাসজীবন বুঝতে পারতেন কী কী পদক্ষেপ আগেভাগে নিয়ে রাখা দরকার। আর তা হলেই সেই মারাত্মক অঘটন, নিশ্চয়ই এড়ানো যেত।

মাতৃহারা শিশুর দায়িত্ব কাঁধে পড়তেই প্রবাসজীবনের পরিচিত প্রাত্যহিকতায় যে খুব একটা পরিবর্তন এসেছিল, তেমন নয়। তবে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি আস্তে আস্তে সব কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে কেবলমাত্র অন্নসংস্থানের জন্য সীমিত সময়ের চিকিৎসাচর্চা চালু রেখে একেবারে চার দেওয়ালের মধ্যেই নিজেকে গুটিয়ে ফেলেন।

পারিবারিক দায়দায়িত্ব তেমন কিছু ছিল না। ভাই-বোনেরা তাঁর অনেক আগেই দিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত। সরকারি পেনশন নির্ভর সত্যেন্দ্রনাথ প্রায় দু'দশক ধরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কলকাতায় গৃহকর্তার দায়িত্ব পালন করে এবং দিল্লিতে অতিথির মতো ছেলে-মেয়েদের বাড়িতে আপ্যায়িত হয়ে যাটের দশকের শেষ বেলায় এক সন্ধ্যায় জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রবাসজীবনের কোলে মাথা রেখে প্রবাসেই জীবন সমাপ্ত করলেন।

ছোটকাকা তথা বাল্যবন্ধু সুধীন্দ্রনাথের মুখটাও হঠাৎই প্রবাসজীবনের স্মৃতির আকাশে ভেসে এল। সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরির অষ্টম সন্তান সুধীন্দ্রনাথ বয়সে প্রবাসজীবনের থেকে বোধ হয় কয়েক মাসের বড় ছিলেন। সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কী চমৎকার একটা সম্পর্কই না ছিল। মনে পড়ছে বালক সুধীন্দ্রনাথ নড়াইল থেকে তাঁকে দিল্লিতে প্রথম যে চিঠি লিখেছিল তার শেষ পংক্তিটি, ভাতিজা, সর্বশেষে লিখি তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। আজ এতদিন পরেও সেই চিঠিটার কথা প্রবাসজীবনের মনে পড়ে যাওয়াতে তিনি নিজের মনেই হেসে ফেললেন। তখন তাঁদের কত বয়স? এগারো অথবা বারো। বিশাল সেই চিঠিতে বালক সুধীন্দ্রনাথ নিজের মতো করে সদ্য ঘটে যাওয়া 'সসহযোগ আন্দোলনের খবর দিয়েছিল। আর বালক প্রবাসজীবন ও বুঝেছিল এমন চিঠি সাবধানে রাখা দরকার। তাঁর মনে হয়েছিল এই চিঠি অন্য কারও হাতে পড়লে বাবার চাকরির সমস্যা হতে পারে।

সেই শুরু। তারপর থেকে নিয়মিত তাঁদের চিঠিপত্র চালাচালি হত। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের চিঠির মান ও আয়তন বাড়ছিল। সুদীর্ঘ চিঠিতে সুধীন্দ্রনাথ লিখতেন ব্রিটিশ শাসনের পরিণাম, কংগ্রেসের আন্দোলনের অসারতা এই রকম আরও কত কিছু। তুলনায় প্রবাসজীবনের উত্তর হত অনেক সংক্ষিপ্ত। এমনকী বিদেশে থাকাকালীন সময়েও সুধীন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়মিত চিঠি লিখতেন। ছোট কাকার অনুরোধে বিলেত থেকে তিরিশের দশকে অনেক বই প্রবাসজীবন কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। বেশিরভাগই কমিউনিস্ট আন্দোলন সংক্রান্ত। দেশে তখন দারুণ কড়াকড়ি। প্রবাসজীবন জেনেছিলেন যে তাঁর পাঠানো একেকটি বই নাকি অন্তত একশো জন পড়ে। সে সব কথা ভেবে এখন প্রবাসজীবনের হাসি পায়। কারণ, আজকাল সব রকমের বই-ই সব জায়গায় পাওয়া যায় ঠিকই, তবে আগ্রহী পাঠক কোথায়।

অঞ্জলি মারা যাওয়ার কয়েক দিন বাদেই সুধীন্দ্রনাথ মারা যান। জীবনসঙ্গিনীর জীবনাবসানের অব্যবহিত পরেই বাল্যবন্ধুর প্রয়াণে প্রবাসজীবন কার্যত মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। সামলে ওঠার পর প্রবাসজীবন জীবনে প্রথমবার ভেবেছিলেন, এরই নাম কি ভবিতব্য? তা না হলে দেশের একেকটা দুর্ঘটনা নড়াইলের রায়চৌধুরি পরিবারে একটা করে মৃত্যু কেন টেনে আনে! দেশভাগের খবর পেয়েই ঠাকুরদা সতীশচন্দ্র মারা গিয়েছিলেন। গান্ধিজির মৃত্যুর খবর পেয়েই জ্যাঠামশাই সুরেন্দ্রনাথের জীবনাবসান হয়। আর কমিউনিস্ট পার্টির ভাগাভাগি সহ্য করতে না পেরে পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী সুধীন্দ্রনাথ মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে মারা যান।

চার

পার্থসারথি জন্ম থেকেই ঠাকুমার হাতেই মানুষ। নাওয়া-খাওয়া থেকে শুরু করে বেড়াতে যিয়ে যাওয়া, গল্প শোনা অর্থাৎ পার্থসারথির জগৎ ঠাকুরমার সঙ্গে মিশে আছে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই সে দেখে আসছে বাবা প্রবাসজীবন এক ছাদের তলায় বসবাস করলেও তিনি যেন অনেক দূরের এক অচেনা ব্যক্তিত্ব। তুলনায় ঠাকুরদা সত্যেন্দ্রনাথ অনেক কাছের মানুষ হলেও তাঁর কাছে সব কথা বলা যায় না। ঠাকুরদাও মাঝে মাঝে বেড়াতে যিয়ে যান। কিন্তু অনেক সময়ই তিনি একা একাই বেরিয়ে পড়েন। তা ছাড়া মাঝে মাঝেই তো তাঁকে আবার কলকাতায় ছুটতে হয়। ঠাকুমা কিন্তু তাকে ছাড়া কখনও কোথাও যায় না। এমনকী কাকা বা পিসিদের বাড়ি গেলেও তাকে নিয়েই যায়।

প্রবাসজীবনও এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট। একই বাড়িতে থেকেও তিনি যেন বহু দূর থেকে লক্ষ করেন কীভাবে তাঁর মায়ের জিম্মায় পুত্র পার্থসারথি বড় হয়ে উঠছে। তিনি দেখেন ছেলেটা স্কুলের বন্ধু, খড়তুতো-পিসতুতো ভাই-বোনদের সঙ্গে ঝরঝরে ইংরেজিতে কথা বলছে। আবার বাড়ির কাজের লোক বা

দোকানদারদের সঙ্গে শুদ্ধ হিন্দিতে কথা বলে। আবার সেই একই শিশু কী করে যে তাঁর মায়ের সঙ্গে দিব্যি বাংলায় গড় গড় করে কথা বলে প্রবাসজীবনের কাছে তা বিচিত্র বিস্ময়।

পার্থসারথি ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছে যে তার বাবা সারা দিন কাজ নিয়েই ব্যস্ত। নিয়মিত নানা রকমের বই পড়াটাও তাঁর অন্যতম কাজ। পার্থসারথি খেয়াল করেছে যে তার বাবা কারও বাড়িতে যান না। কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানেও নয়। নিজের বাড়িতে বসে কারও সঙ্গে প্রবাসজীবন আড্ডা দিচ্ছেন—এমন দৃশ্য পার্থসারথি কোনও দিন দেখেছে কি? মনে পড়ে না। সব মিলিয়ে পার্থসারথির চোখে তার বাবা সংসারে এক সন্ন্যাসী ছাড়া কিছুই নয়।

পার্থসারথি বরাবরই লক্ষ করেছে যে তার বাবা কখনও কোনও ব্যাপারেই তা সে যত ছোট-ই হোক বা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, কোনও অভিমত কিংবা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া পছন্দ করেন না। বায়োলোজিতে অত ভাল ফল করে স্কুল ছাড়ার সময় সবাই ধরেই নিয়েছিল যে পার্থসারথিও বাবার মতো ডাক্তারিই পড়বে। তার বদলে সে যখন বটানি নিয়ে পড়া শুরু করল তখন সবাই বিস্মিত হলেও প্রবাসজীবন কোনও বিরূপ মন্তব্য করেননি। বরং বটানির ভবিষ্যৎ, আগামী দিনে বায়োটেকনোলোজির সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রবাসজীবন ছেলের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। পার্থসারথি আশ্চর্য হয়ে শুনেছিল তার বাবা নির্বিকারভাবে অথচ সাদা-মাটা ভাষায় উদ্ভিদবিদ্যার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বর্ণনা করে যাচ্ছেন। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখা, প্রযুক্তি প্রসঙ্গে নানান আলোচনায় পার্থসারথি পিতার জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে আগেই অবহিত ছিল। এমনকী অন্য অনেক বিষয়েও প্রবাসজীবন যে জ্ঞানের আকর বিশেষ এটাও পার্থসারথির জানা ছিল। তিনি যে বটানি সম্পর্কেও সমান খবরাখবর রাখেন তা পার্থসারথির জানা ছিল না। কাজেই একেবারে নতুন একটা বিষয় নিয়ে প্রবাসজীবনের গভীরতায় স্বাভাবিক কারণেই পুত্র রীতিমত বিস্মিত হয়েছিল। অনেক দিন বাদে, আরও একবার বাবার সঙ্গে কথা বলে পার্থসারথি এমনই, হয়ত বা একটু বেশিই বিস্মিত হয়েছিল।

সে তখন বিদেশের গবেষণাগারে ধান-চাল সংক্রান্ত গবেষণায় ভীষণ ব্যস্ত। গবেষণালব্ধ ফলাফল এ দেশের মাটিতে প্রয়োগের জন্য দেশে আসার সুযোগ মিলেছিল। সেই সময় কয়েক দিনের ছুটিতে পার্থসারথি বাবার কাছে চলে আসে। প্রথমে সে বুঝতে পারেনি, বাবা খুশি হয়েছেন না বিরক্ত। ক'দিন বাদেই পার্থসারথি বুঝেছিল যে প্রবাসজীবন ছেলের গবেষণার উপর কড়া নজর রেখেছেন।

একদিন রাতে খেতে বসে প্রবাসজীবন ছেলেকে প্রশ্ন করেছিলেন কোন ধরনের ধান নিয়ে তুমি কাজ করছ? তুমি কি জান আমার পিতামহ সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরি অন্তত শতখানেক বিভিন্ন জাতের ধানের খবরাখবর রাখতেন? যদিও তাঁর পেশা ছিল ওকালতি, মানুষটা কিন্তু সারা জীবন ধরে একটাই স্বপ্ন দেখে গেছেন, কবে আমাদের দেশে ধানের ফলন বাড়বে, চাষের সময় কম লাগবে, কম সেচেও চাষ করা যাবে আর বাড়বে চালের স্বাদ-গন্ধ। স্মৃতি হাতড়ে প্রবাসজীবন বলে যাচ্ছিলেন, বাসকামিনী, বাসমতী, গোলাপসরু, বাদ্‌শাভোগ, গোবিন্দতুলসী, পর্বতজিরে, মাগুরডিমে, কর্পূরশাল, পেশোয়ারী, দেরাদুন আর কনকচূড়া ধানের চাল দিয়ে ভাত, পিঠে, পায়েস, পোলাও হয়। তাছাড়া এইসব ধান থেকে সরাসরি চিঁড়ে, খই-ও হয়।

পার্থসারথির ঘোর কাটার আগেই প্রবাসজীবন আবার শুরু করেছিলেন, সতীশচন্দ্র আরও বলেছিলেন যে কাটারীভোগ, কমলভোগ, দুর্গাভোগ, গোপালভোগ, কিশোরীভোগ, বাঁকতুলসী, দাদখানি, চামরমণি, সীতাশাল, রূপাশাল, ঝিঙেশাল, রাজঝিঙেশাল, কেউটেশাল, সাবানশাল, কুমড়োশাল, কলমিশাল, মরিচশাল, আঙুরশাল, নাজানি, অর্জুনশাল, কালাশাল, লাঠিশাল, পালকশাল, ওড়াশাল, জিরেশাল, ছিলেট, কোটে ছিলেট, কার্তিকে ছিলেট, ট্যাংরা ছিলেট, ভুঁড়ো ছিলেট, রাঙ্গিময়ূরলতা, ময়ূরপঙ্খী, মউলতা, মউলো, কলমকাটি, ঝাঁটিকমল, দুধকমল, দুধেশ্বর, দুধসাগর, বালাম, মুগিবালাম, শশীবালাম, হরকুলি, ধোবিলুচি, জামাইনাড়ু, লক্ষ্মীকাজল, আকাশপালি, বনকামিনী, বনরাঙি, মোষেরাঙি, কার্তিকেরাঙি, চেঙোরাঙি, চিত্তরাঙি, মতিচূড়, ভজ্‌না, কাঁচ, গয়াবালি, রাজসাহেব, ধলে, গাঁদি, পাটনাই, ধুলোগোড়, কুমড়োগোড়, কোটেছড়ো, নোনাগাজি, নোনাবোগড়া, আগুনবান, হরিমতী, বাগ্‌দিসাবান, রাশফুলি আর চন্দ্রফুলি ধান থেকে ভাত রান্নার চাল ছাড়াও চিঁড়ে, খইও হয়। এর মধ্যে আবার পালকশালের প্রতিটা ধানের মধ্যে দুটো করে চাল থাকে।

পিতার স্মৃতিশক্তির দাপট দেখে চমকে উঠেছিল পার্থসারথি। কাজের সূত্রে এই নামগুলোর সঙ্গে তখন সে পরিচিত। কিন্তু তাকে কোনও প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়েই প্রবাসজীবন আবার শুরু করেছিলেন,-তবে, এই সব চাল দিয়ে মুড়ি হয় না। মুড়ির জন্য দরকার হামাই, হোগলা, পানবাটি, পানকলস, ভাসাকলম, ভাসামানিক, বাছাকলম, কলামোচা, দোরাঙি, রাবণ, ঘোটাব্যানা, পোলবিড়ে, গৌড়িমুটি, রামকানাই, পাতাবাহার, বাঁশকাঠ, কালিন্দী, সাদামোটা, কালাহেঁড়ে, সোমরা, মালাপাতি জাতের ধান।

পার্থসারথিকে হাঁ করার অবসর না দিয়েই প্রবাসজীবন বলেছিলেন,- আর সবুজ বিপ্লব মানে তোমাদের গ্রিন রেভেল্যুশনের দৌলতে অবশ্য বারোশো-একাশি বা মাসিপিসি, আই-আর-এইট বা সোহাগী, জয়া, তাইচুঙ বা বামনঝাঁটি আর তাইনান ধানের চাষও আজকাল খুবই জনপ্রিয়।

এক দমে এতগুলো কথা বলেও শান্তি নেই। হঠাৎই প্রবাসজীবন পুরনো প্রশ্নে ফিরে গিয়ে জানতে চাইলেন,-তুমি কোন্ ধরনের ধান নিয়ে কাজ করছ? ধানের জিন কাঠামো অন্য রকম ভাবে সাজিয়ে ফলন বাড়ানোর চেষ্টা করছ না কি চালের স্বাদ-গন্ধ বাড়ানোর বিষয়ে জোর দিয়েছ? আরেকটা কাজও হতে পারে,- আমাদের দেশের মাটিতে যে ধরনের ধান হয় জিন কাঠামো পাল্টিয়ে দিয়ে তাকে অন্য রকমের মাটিতেও ফলানো যেতে পারে। তুমি কোন দিকটার ওপর নজর দিয়েছ?

একসঙ্গে এক ঝাঁক প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে বায়ো-টেকনোলজির নবীন ছাত্র পার্থসারথি সামান্য বিব্রত বোধ করলেও এক এক করে, ধীরে ধীরে প্রতিটি প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছিল। বাবার মতো সহজ ভাষাতেই নিজের গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত এবং অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা দিয়েছিল।

বাসমতী চাল নিয়ে ছেলে কাজ করছে শুনে প্রবাসজীবন প্রশ্ন করেছিলেন, বাসমতীর কোন দিকটা দেখছ?

পার্থসারথি বিনীতভাবেই বলেছিল, প্রথমে বাসমতীর জিন-ডি.এন.এ কাঠামো বিশ্লেষণ করে দেখতে চাই একেবারে অন্য আবহাওয়ায়, একেবারে অন্য মাটিতে অমন সুগন্ধী ধান ফলানোর জন্য কী কী জেনেটিক পরিবর্তন করা দরকার। তারপর দেখতে চাই বাসমতীর সুগন্ধ-স্বাদ-বাড়ানোর জন্যে জিন কাঠামোয় আরও কোন ধরনের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আর সবশেষে দেখার ইচ্ছে আছে, স্বাদ-গন্ধের সঙ্গে সমঝোতা না করেও কী ভাবে ফলন বাড়ানো যায়।

ছেলের গবেষণার ধারা-প্রকৃতি অনুধাবন করে প্রবাসজীবন আনন্দিত হয়েছিলেন। ছেলেকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, চমৎকার! এমনটাই তো চাই। তোমার গবেষণাটা সত্যি সত্যিই যদি ল্যাবোরেটরির বাইরে সফল হয়, দেশের চেহারাই পাল্টিয়ে যাবে। চাষিরা অন্য কোনও জাতের ধান আর বুনবেই না। দেশের লোক সস্তায় ভাল চাল পাবে। চাষিদের হাতেও দুটো পয়সা বেশি আসবে।

পিতার চোখে-মুখে এবং কথায় আনন্দের বহিঃপ্রকাশ দেখে পার্থসারথি মুগ্ধ হয়েছিল। আসলে এর আগে তো কোনও দিন পার্থসারথি বাবাকে দুঃখে উদ্বেল বা আনন্দে আত্মহারা হতে দেখেনি। ঠাকুরদা-ঠাকুমার মৃত্যুর সময় সে দেখেছে কাকারা, পিসিরা কান্নায় ভেঙে পড়েছে। কিন্তু প্রবাসজীবন পাথরের মতো নিশ্চল থেকে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। পার্থসারথির বিয়ের সময় যখন গল্ফ লিংকের বাড়ি আলোয় ঝলমল করছিল, লোকজনের কোলাহল, সানাই-গান-বাজনায় চারদিকে গমগম করছে, বাঁধনছাড়া আনন্দে নড়াইলের রায়চৌধুরি পরিবারের সবাই মাতোয়ারা, সেদিনও প্রবাসজীবন শান্তভাবেই আমন্ত্রিতদের আপ্যায়ন করেছেন।

যান্ত্রিকভাবে নিয়ম মেনে দায়িত্ব পালন ছাড়া প্রবাসজীবন গত ছত্রিশ বছরে সত্যি সত্যিই আর কিছু করেননি। সমাজ-সংসার পরিত্যাগ না করেও কীভাবে এমন আবেগ বিবর্জিত অথচ সংযত জীবনযাপন করা যায় তা রীতিমত গবেষণার বিষয়। তবে প্রবাসজীবনের একান্ত ঘনিষ্ঠ কয়েকজন প্রথম দিকে নিজেদের মধ্যে মজা করে বলাবলি করতেন, আধখানা শতাব্দী পেরিয়ে প্রবাসজীবন বুড়ো বয়সে বাবা হয়েছে; আমাদের নাতি-নাতনিরা ওর ছেলের সমবয়সি। সেই লজ্জায়ই হয়ত বেচারি আর মুখ দেখাতে পারছে না। কেউ কেউ বলতেন, বউয়ের শোকে মুহ্যমান। আবার অনেকে আরও তির্যক ভঙ্গিতে বলতেন-বউ বেঁচে থাকতে তো এত দরদ দেখিনি। এ সব কথা অবশ্য কোনও দিনই প্রবাসজীবনের কানে আসেনি। আর এলেও তাঁর কিছুই কি যেত আসত?

পাঁচ

আজ প্রবাসজীবনের মন বড় চঞ্চল। পার্থসারথি ভোরবেলায় শুভ সংবাদটা দেওয়ার পর থেকেই তাঁর মন স্মৃতির গভীরে প্রবেশ করে অনেক কালের কথা, অনেকের কথা খুঁজে বের করে আনলেও আসলে সব কিছুর সঙ্গে একটা খুশির প্রলেপ জড়িয়ে আছে। অনেক, অ-নে-ক দিন বাদে আজ তাঁর হই চই করে আনন্দ করতে ইচ্ছে করছে। শেষ কবে তিনি হই হুল্লোড় করেছিলেন মনে করতে পারলেন না। হয়ত সেই কারণেই উত্তেজনার মাত্রাটা কিঞ্চিৎ বেশি। একা একা আনন্দে মেতে ওঠা যায় কি? একটা-দুটো ফোন করে নড়াইলের রায়চৌধুরি পরিবারের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় এ বাড়ির নবতম সদস্য সংযোজনের বার্তাটা হয়ত দেওয়া যায়। কিন্তু অব্যক্ত দ্বিধায়, এক অজানা সংকোচে তিনি নিজেকে বিরত করলেন। কিছু একটা করা উচিত, তবে কী করবেন বুঝে উঠতে না পেরে তিনি ঘরের মধ্যেই পায়চারি শুরু করলেন।

এ বাড়ির তৃতীয় প্রজন্মের আবির্ভাবের খবর পাওয়ার পরেই নিজের উর্ধ্বতন তৃতীয় পুরুষের মুখখানি বারে বারে প্রবাসজীবনের স্মৃতির দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে এই শুভক্ষণে এতদিনকার একাকিত্বে অভ্যস্ত মানুষ প্রবাসজীবন জীবনে প্রথমবার নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করলেন।

বেদনার যন্ত্রণায় একা একা গুমরানো গেলেও আনন্দ উপভোগ করতে হলে মানুষ দরকার। প্রবাসজীবন একবার ভাবলেন বিকেলের বিমানে কলকাতা গেলে কেমন হয়। ছেলের শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সঙ্গে আনন্দে মেতে ওঠা যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, তাঁর গুরুগম্ভীর চেহারাটা দেখতে যারা অভ্যস্ত তাদের সামনে নিজেকে কীভাবে খুলে ধরবেন। তারাও কি এমন খোলামেলা প্রবাসজীবনকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাবার পর তাঁর মুখোমুখি হতে পারবে? একবার মনে হল দিল্লিরই বিভিন্ন প্রান্তে

থাকা আত্মীয়-স্বজনদের বিকেলের দিকে বাড়িতে ডেকে এনে মিষ্টি খাওয়ালে তো হয়। ঠিক পরমুহূর্তেই মনে হল, যাদের সঙ্গে এতদিন সম্পর্ক নেই, এমনকী দীর্ঘকাল বাক্যালাপও বন্ধ, আজ হঠাৎ ফোন করলে তারা কি চমকে উঠবে না? প্রবাসজীবন বেশ বুঝতে পারছিলেন যে এতকাল ধরে গড়ে তোলা নিয়মের এবং নির্বাসনের বেড়াজালটি একটানে ছিঁড়তে ছিঁড়ে ফেলা সম্ভব নয়। তাঁর আরও মনে হল যে পার্থসারথি নিশ্চয়ই এতক্ষণে শুধু দিল্লি কেন পৃথিবীর সব প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সব আত্মীয়-স্বজনদের খবরটা পৌঁছে দিয়েছে। ঠাকুরমার কল্যাণে সবার সঙ্গেই ছোটোবেলা থেকে পার্থসারথির সুসম্পর্ক। মন ভরা আনন্দ আর অব্যক্ত যন্ত্রণা বুকে করে প্রবাসজীবন আবারও নতুন উদ্যমে পায়চারি শুরু করলেন।

ছয়

আচমকা কলিং বেলের আওয়াজে প্রবীণ ডাক্তার প্রবাসজীবনের স্মৃতি রোমন্থন অথবা আনন্দ প্রকাশের পন্থা অনুসন্ধান সংক্রান্ত চিন্তার ধারাবাহিকতা হোঁচট খেল। এখন তো কারও আসার সময় নয়। কাজের লোকেরা কলিং বেল বাজায় না। তারা পেছনের দরজা দিয়ে এসে নীরবে কাজ করে চলে যায়। বাড়ির পিছন দিকেই ওদের থাকার ব্যবস্থা। আর সবসময়ের ফাই-ফরমাশ খাটে যে মহিলা, আপাতত সে-ও পুত্রবধূ সুজাতার সঙ্গে কলকাতায়। অগত্যা প্রবাসজীবনকেই নীচে নেমে সদর খুলতে হল।

ও! ক্যুরিয়ার! প্রবাসজীবনের চিন্তা দূর হয়। বিদেশ থেকে আসা চিঠি। সইসাবুদ করে চিঠিটা হাতে নিয়ে আবার চিন্তায় পড়ে গেলেন। খামের উপর পরিষ্কার ভাবে পি রায়চৌধুরি লেখা আছে। নামের আগে সংক্ষেপে বড় হাতের ডি এবং ছোট হাতের আর-ও লেখা আছে। কিন্তু এই ডি আর (Dr) এর মানে কী? ডাক্তার না ডক্টর? প্রেরক সংস্থা থেকে তাঁর কাছেও চিঠি আসে। আবার এই সংস্থাতে পার্থসারথিও অনেক দিন কাজ করেছে। তা হলে চিঠিটি কার? ডাক্তার প্রবাসজীবন রায়চৌধুরি নাকি ডক্টর পার্থসারথি রায়চৌধুরি — কার কাছে এসেছে এই চিঠি?

খামটা খোলা উচিত হবে কি হবে না ভাবতে ভাবতেই দোতলায় পৌঁছে গেলেন। শেষ পর্যন্ত কী ভেবে খামটা খুলেই ফেললেন। অথচ এমনটা তিনি সাধারণত করেন না। কোনও বিষয়েই নিশ্চিন্ত না হয়ে কাজ করাটা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। খামটা

খুলেই বুঝলেন ভুল হয়েছে। চিঠিটা পার্থসারথির। ভাঁজ করে তাড়াতাড়িতে চিঠিটা খামে ঢোকাতে গিয়ে হঠাৎই 'বাসমতী' শব্দটার উপর নজর পড়তেই তিনি আবার চিঠিটা খুললেন। গত দু'তিনদিনের কাগজে বাসমতী নিয়ে কয়েকটা খবর ছাপা হয়েছে। হয়ত সেই জন্যেই তাঁর কৌতূহল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যত্ন করে চিঠিটা পড়লেন। একবার নয়, দু'বার নয় বেশ কয়েকবার তিনি চিঠিটা পড়লেন। এবার সত্যি সত্যিই তিনি চিঠিটা আস্তে আস্তে ভাঁজ করে খামে ভরে ফেললেন। এবং তাঁর চোখ থেকে দু'ফোঁটা জল খামটার উপর ঝরে পড়ল।

পার্থসারথিকে ওরা অভিনন্দন জানিয়েছে। বাসমতী নিয়ে পার্থসারথি যে কাজটা করছিল তা পেটেন্ট পেয়ে গেছে। জিন কাঠামোয় সামান্য পরিবর্তন করে যে কোনও মাটিতে আর যে কোনও আবহাওয়ায় বাসমতীর উৎপাদন সম্ভব, পার্থসারথি তা বহুদিন আগেই দেখিয়ে দিয়েছিল। দেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তির প্রাক-মুহূর্তে প্রবাসজীবন খবর পেয়েছিলেন যে তাঁর ছেলের গবেষণার ফলাফল পেটেন্ট করার বন্দোবস্ত হচ্ছে।

আজ, আরেক অগস্টের সকালে, আরেকটা স্বাধীনতা দিবসের দিন কয়েক আগে, চোখের জল মুছতে মুছতে প্রবাসজীবন ভাবলেন তাঁর জ্যাঠামশাই স্বদেশি শিল্প গড়ার জন্য সারা জীবনে কতই না ত্যাগ স্বীকার করেছেন। অন্য রকমের আদর্শে দেশ গড়ার জন্যে তাঁর ছোট কাকা সারাটা জীবন কী কষ্টই না ভোগ করে গেছেন। তিনি নিজে তেমনভাবে দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ না হলেও দেশ গড়ার একটা দৃঢ় চেতনা তাঁর মধ্যে বরাবরই কাজ করেছে। তা না হলে কি বিদেশের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিলাস ত্যাগ করে জীবনের সেরা সময়ে অমন ভাবে কাজের পিছনে দৌড়ে বেড়াতে পারতেন?

প্রবাসজীবন বুঝতে পারছেন না এই খবরটায় তিনি দুঃখ পেয়েছেন বা ছেলের কাজের জন্যে তাঁর মনে কোনও অনুতাপ-অনুশোচনার শীতল স্রোত বহে চলেছে অথবা চাপা গর্বে তিনি আবেগরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন কি না, তবে তিনি বুকের গভীরে একটা মোচড় অনুভব করলেন। একই সঙ্গে, প্রায় সমস্তরালভাবে চিন্তার আরেকটি ধারা তাঁর মাথায় বয়ে গেল, নড়াইলের সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরির সারা জীবনের স্বপ্ন তাঁরই চতুর্থ প্রজন্মের হাতে বাস্তবায়িত হয়েও মাত্র কয়েক লক্ষ ডলারের বিনিময়ে চিরতরে হাতছাড়া হয়ে গেল!

অপ্রকাশিত রচনা

বিপ্লবীর স্মৃতিকথা

বিভূতিভূষণ সরকার

বাংলার অগ্নিযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান আলিপুর বোমার মামলার আসামি বিভূতিভূষণ সরকার আন্দামানে কারাবাসের থেকে ফিরে তাঁর বাকি জীবন সপরিবারে বাঁকুড়া শহরে অতিবাহিত করেছিলেন। অত্যন্ত প্রচারবিমুখ, নির্জনতাপ্রিয় মানুষ ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন বিষয়ক নানা গ্রন্থে ও পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে তাঁর অমর কীর্তির কথা লেখা আছে। নিজে এ প্রসঙ্গে বিশেষ কিছু বলতে বা লিখতে চাইতেন না। তবুও তাঁর এক বন্ধুসুতিয়া আত্মীয় বাঁকুড়া নিবাসী অধ্যাপক গোপাল দের (প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দের বাবা) জোরাজুরিতে একদা এই ছোট স্মৃতিচারণ করেছিলেন। গোপাল দে মহাশয় তা স্বহস্তে লিখে রাখেন। বিভূতিভূষণের কনিষ্ঠ পুত্র জয়ন্ত সরকার এবং পার্থ দের উৎসাহে আর মেঘ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় সেই অপ্রকাশিত সংক্ষিপ্ত অথচ অমূল্য পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে চতুরঙ্গে প্রকাশ করা হল। স. চ.

প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে। আমি যুগান্তর বোর্ডিংয়ে (৪১ নং চাঁপাতলা ফার্স্ট লেন) থাকিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়িতে ছিলাম। আমাদের বোর্ডিংয়ে অনেক ছেলেই থাকিত। আমার মামাতো ভাই ডা. কালীকৃষ্ণ মিত্র ও হরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র, অবিনাশ ভট্টাচার্য এবং ওই সময়ের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (পরে মানবেন্দ্রনাথ রায় নাম নিয়া ছিলেন) প্রত্যেকের নাম করা চলে না। তবে পরে যে সমস্ত ছেলে সমিতিতে যোগ দিয়াছিল তাহাদের নাম না করা ভাল দেখায় না। প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গে প্রফুল্ল চক্রবর্তীও ছিল, নলিনী কান্ত সরকার ৪৪ নং হ্যারিশন রোডের মেসে থাকিয়া প্রেসিডেন্সিতে পড়িতেন। আমি মাঝে মাঝে ওই মেসে যাইতাম এবং অনেকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল। সুধীরকুমার সরকারও মাঝে মাঝে আসিতেন, কিন্তু তিনি এখানে থাকিতেন না। চাকী রংপুর জাতীয় বিদ্যালয় ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া ছিলেন। আমরা নামে মাত্র স্কুলের পড়য়া ছিলাম কিন্তু আমাদের মন পড়িয়া থাকিত অন্য জায়গায়। আমি সমিতির বাহিরে থাকিয়া কিছু কিছু কাজ করিতাম। ১৯০৪ সালে আমি বিপ্লবী সমিতিতে প্রবেশ করি। ১৯০৬ সালে আমি বোর্ডিং ছাড়িয়া যোগেন্দ্রনাথ সরকারের সহিত মেদিনীপুরে যাই। সেখানে সত্যেন্দ্রবাবুর অধীনে বন্দেমাতরম তাঁতশালায় কার্য করিতাম। আমরা তথায় পাঁচজন ছাত্র থাকিতাম। দ্বিজেন্দ্র বিশ্বাস, জ্ঞান পরামাণিক, নিরাপদ রায়, ক্ষুদিরাম ও আমি। এখানেও দেখি একদিন চাকী, বারীন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দ গিয়া উপস্থিত। সত্যেন্দ্র আমার সম্বন্ধে বারীন ও অরবিন্দের নিকট গিয়া বলিল এ ছেলেটিকে তোমরা নিয়া যাও। এ তোমাদের কাজের অর্থাৎ সক্রিয় বিপ্লবীকার্যের উপযোগী। তখন আমি চাকী সমেত কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই হইতেই মুরারীপুকুর বাগানে থাকিতাম। আমাদের নাম ধাম জাতি প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করার কোনও রীতি ছিল না। বাগানে আমি, প্রফুল্ল চাকী, হরিশ, শান্তি ও বারীন্দ্র থাকিতাম। সুধীর মাঝে মাঝে আসিত আবার পরদিনই চলিয়া যাইত। বাংলার বহু জেলা হইতে বহু ছেলে এ বাগানে আসিয়াছিল। সব ছেলেগুলিই যেন এক একটি রত্ন ছিল। আমি ও প্রফুল্ল চাকী দুইজনাই এক রকম বন্ধু হইয়া দাঁড়াইলাম। নিজেরা বাজার করা, রাঁধা, গীতা ও অন্যান্য বই পড়িয়া আমাদের দিন কাটিত। বাহিরে আমাদের ধ্যান করিবার জন্য একটি আলাদা কুঠরি ছিল। সেখানে নিয়মিতভাবে সকাল সন্ধ্যায় ধ্যান করিতে হইত। এক হিসাবে প্রফুল্ল শক্তিশালী যুবক ছিল। বারীনদাকে প্রফুল্ল সুকুদা বলিয়া ডাকিত। আমাদের মাছ মাংস খাইবার প্রথা ছিল না বলিয়া রান্নার কোনও ঝামেলা ছিল না। রান্না ১১/১২ জন হইতে ২০/২১ জনার পর্যন্ত করিতে হইত। তবে রান্না খুব সহজও ছিল না। কারণ বারীনদার একটি আদেশ ছিল যে রান্না এমনই ভাবে রাঁধিবে যাতে সকলে খাইতে পারে। সেই জন্য খুব সাবধানে রাঁধিতে হইত, যাহাতে পুড়িয়া না যায় এবং কোনও দোষ না ঘটে। দিনের বেলায় ডাল ভাত একটি তরকারি আলুভাতে ও মাঝে মাঝে চাটনি। রাত্রিতে চপাটি ও ডাল। ডালে আলু ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া দেওয়া হইত। কোনও দিন বা চপাটি ও তরকারি। রান্নার পরীক্ষায় আমরা দুইজনাই পাশ করিয়াছিলাম। নভেম্বর মাসে সমিতির দুই সভ্য একটি কাজে অকৃতকার্য হওয়ায় সেই কাজটি আমার উপর ন্যস্ত করা হইল। নেতারা আদেশ দিলেন, যাকে সঙ্গে লইলে তোমার সুবিধা হয় তাহাকেই নিতে পার। আমার সুবিধা হইল প্রফুল্ল চাকীকে। আদেশের পর দিন আমরা দুজনই পুরী প্যাসেঞ্জারে রওনা হইলাম এবং বেনাপুর স্টেশনে নামিয়া হাঁটিয়া পরের স্টেশন নারানগড়ের দিকে রওনা হইলাম। দুই-তিন মাইল যাইয়া একটি জায়গা মনোনীত করিলাম। ইহার পর সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। রাত্রি ৮/৯ টার সময় একজন কনক করিতে লাগিল আর একজন পাহারা দিতে লাগিল। ঘণ্টা খানিকের মধ্যে লাইনের নীচে গর্ত করিয়া তাতে খেজুর ডগা কাটিয়া গর্তের মধ্যে দিয়া পাথর তাহার পর পিচবোর্ড দিয়া উপরে পাথর সাজাইয়া আমরা কলিকাতার দিকে রওনা হইলাম। বাগানে তিনটি বিষয় পড়ান হইত। যুদ্ধ সম্বন্ধীয় বহিগুলি বারীনদা পড়াইতেন, বৈষ্ণব পদাবলী

উপেনদা (বিখ্যাত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) পড়াইতেন। আর গীতা উপনিষদ হৃষিদা (হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল) পড়াইতেন। ফলে আমরা যে নিছক শরীর নই, আমাদের যে মৃত্যু নাই — এই সব বিষয়ে আমাদের খানিকটা ধারণা হইয়াছিল। উপেনদা রাধা কৃষ্ণের প্রেম যেমন, সেইরূপ দেশের প্রতি আমাদের ভালবাসা চাই— এইটি বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন। স্বাধীনতার জন্য আমাদের প্রাণ এইরূপ হইবে যেন দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমরা জীবন্মৃত হইয়া থাকিব। একদিন চাকী ও আমি বাগানে বসিয়া গীতা পড়িতে ছিলাম, হঠাৎ সে আমার নিকট হইতে সরিয়া গিয়া ১টি গাছের ৫/৬ হাত উঁচু ডালে বসিয়া গীতা পড়িতে লাগিল। হঠাৎ হাত পা ছাড়িয়া গাছের উপর হইতে পড়িয়া গেল এবং চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, ইহাকে কয় 'বেদনা' — ইহা আমার নয়। ইহা শরীরের ধর্ম, আমার বেদনা নাই ইত্যাদি।

এর পরই আমাদের লাট নিধন যজ্ঞে যাইবার হুকুম আসিল। আমি, বারীনদা, উল্লাসদা (উল্লাসকর দত্ত) ও প্রফুল্ল মেদিনীপুর রওনা হইলাম। সেদিন ৩রা ডিসেম্বর ১৯০৭ সাল। খড়গপুরে যাইয়া জানিলাম যে লাটসাহেব ৪ঠা পুরী হইতে ফিরিবেন। সেই অনুযায়ী আমরা ৪ জনায় ৪ঠা খড়গপুরে আসিলাম, কিন্তু তথায় আসিয়া জানিলাম ৫ই রাত্রি ৮টার সময় পুরী হইতে লাট রওনা হইবেন। আর মেদিনীপুরে না ফিরিয়া আমরা ৪জন নারানগড়ের টিকিট কাটিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম। বেলা ৩টা নাগাদ আমরা নারানগড়ে আসিয়া নামিলাম। আমরা ৪ জনা আবার কটক রোড ধরিয়া ডাউনে বেনাপুরের দিকে যাইতে আরম্ভ করিলাম। আন্দাজ আড়াই মাইল যাইবার পর একটি সানে-বাঁধানো পুকুর ঘাটে গিয়া বসিলাম। তখন বেলা প্রায় ৫টা। আমরা ৪জনায় কিছু জলযোগ করিয়া লইলাম। যদিও আমাদের সঞ্চয়ের রীতি ছিল না, তবুও আমি ৪খানি লুচি ও দুইটি মিষ্টি গামছাস্থ করিলাম। আমার আর প্রফুল্লর পরনে একটি করিয়া মোটা ধুতি, গায়ে মোটা গেঞ্জি ও একটি সাধারণ সুতি কোট ছিল। আমার কাছে একটি টেক ঘড়ি আর দুইজনার দুইটি 'খোকা' (অর্থাৎ রিভলবার) ছিল। সন্ধ্যা প্রায় ৭টার সময় আমরা সকলে লাইনের ধারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। নির্দিষ্ট স্থানটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম সব ঠিকই আছে। তারপর পাথর সরাইয়া পিচ বোর্ড খানি তুলিয়া খেজুর ডাল দূরে ফেলিয়া দিলাম। তারপর গর্ততে মাইনটি বসাইয়া দিলাম। পরে সিসার পাইপের মধ্য দিয়া পলিতাটি বাহির করিয়া আনিলাম এবং পলিতার অপর প্রান্ত যাহাতে ডিটোনিটার ছিল তাহা মাইনের মধ্যে লাগাইয়া দিলাম। তারপর পাথর সাজাইয়া, তুলা বিছাইয়া তার উপর পলিতা রাখিয়া আবার তুলা বিছাইয়া তার উপর আবার পাথর দিয়া চাপা দিলাম, যাহাতে তুলা উড়িয়া না যায় বা অন্য ট্রেন যাইলে ক্ষতি না হয়। আমাদের দুইজনার কাছে ট্রেন পৌঁছাইবার সময় ও ঘড়ি রহিল। বারীনদা ও উল্লাসদা নারানগড়ে ফিরিয়া মাদ্রাজ মেল ধরিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন। আমরা ১টা ২৫ মিনিটের সময় লাইনের উপর পলিতা রাখিয়া একটি সুতার দুই ধারে দুইটি পাথর বাঁধিয়া পলিতা লাইনের উপর দিয়া দিলাম, যাতে গাড়ি আসিবার সময় লাইনের উপর হইতে পলিতা পড়িয়া না যায়। তারপর আমরা দু'জনাই খড়গপুরের দিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলাম।

আমরা যখন দুই মাইল আন্দাজ আসিলাম, তখন গাড়ি আসার শব্দ শুনিতে পাইলাম এবং পর মুহূর্তেই এক বিরাট কামান গর্জনের শব্দ শুনিতে পাইলাম। প্রফুল্ল লাইন পার হইতে যাইতেছিল, তাহাকে যাইতে না দিয়া একটু অপেক্ষা করিতে বলিলাম। এমন সময় রেলের ফটকওয়ালা বলিতেছে শুনিলাম, কিরে বাবা গাড়ি আসতে আসতে থেমে গেল কেনে? আমরা যথা সময়ে লাইন পার হইয়া কটক রোড ধরিয়া খড়গপুরের দিকে দৌড়াইতে লাগিলাম, কারণ ৫/৬ মাইল দূরে আর একটি ফটক আছে। সেটি পার হইয়া যাইতে না পারিলে আমাদের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা আছে। যাহা হউক আমরা বিপদ সীমার প্রায় ৮ মাইল পথ মাত্র ২৯ মিনিটে পার হইয়াছিলাম। ওই সময় লাটের গাড়ি যাইতেছে আমাদের নজরে পড়িল। আমরা দুইজনাই ধানখেতের মধ্যে বসিয়া পড়িলাম। গাড়ি পার হইয়া যাইবার পর আমরা মেদিনীপুরের দিকে রওনা হইলাম। সকাল ৫.৩০ টার সময় ২৩ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া কংসাবতীর তীরে উপনীত হইলাম। সেখানে আসিয়া, প্রফুল্ল বলিল, 'ওরে আমার খিদে পেয়েছে'। আমার পূর্ব দিনের সঞ্চিত খাবার বার করিয়া তিন খানি লুচি ও ১টি মিঠাই তাহাকে দিলাম। আমি ১ খানি লুচি ও ১টি মিঠাই খাইলাম। অন্ধকার থাকিতে থাকিতে আমাদের নদী পার হওয়া দরকার। সেই ডিসেম্বর মাসের নদীর জল যে কি মনোরম তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। যথারীতি কাপড় জামা মাথায় বাঁধিয়া নদী পার হইলাম। নদী পার হওয়ার পরই চাকী বলিল, 'আমার বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে, আমাকে ৪টি পয়সা দাও'। ৪টি পয়সার কী খাওয়া হইতে পারে বুঝিলাম না, তবু তাহাকে পয়সা চারিটি দিলাম। তখন সকাল হইয়াছে এবং আমরা ইস্কুল বাজারে ঢুকিয়াছি। সে দুই পয়সায় ছয়টা মূলা এবং দুই পয়সার বনকুল কিনিয়া লইল। পাশের দোকানে একটু লবণ চাহিয়া লইয়া সে আমাকে দু'টা মূলা ও কিছু কুল দিয়া বলিল, 'নে খা'। সে নিজে চারিটা মূলা ও বাকি কুল খাইল। আমি দশ বারোটি কুল এবং ১টি মাত্র মূলার কতকটা খাইতে পারিলাম। কিন্তু সে অবলীলাক্রমে চারিটা মূলা ও কুল খাইয়া ফেলিল।

ইহার পর আমরা মেদিনীপুর ছাত্র ভাণ্ডারের দিকে রওনা হইলাম। সেদিন ৬ই ডিসেম্বর মেদিনীপুরে জাতীয় কংগ্রেসের, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন ছিল। সভাপতি ছিলেন স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি বহু নেতাই সেখানে উপস্থিত হইয়া ছিলেন। আমরা ছাত্র ভাণ্ডারে যাইবা মাত্র ক্ষুদিরাম আমাদের কাছে আসিয়া বলিল, 'ওরে লাটতো মরে নাই, আমি যে দেখিলাম

গাড়ি থামিয়া গেল'। এ কথা শুনিয়া আমরা অতিশয় বিস্মিত হইলাম। কারণ ক্ষুদিরাম সেখানে যায় নাই। এত শীঘ্র সংবাদ আসিবার সম্ভবনা ছিল না। সে স্বপ্নে এই দৃশ্য দেখিয়াছিল বলিল। বুঝিতে পারিলাম আমরা যাইবার সময় হইতে তাহার মনপ্রাণ চিন্তা আমাদের সঙ্গে এবং আমাদের কাজেই ছিল। যাহা হউক আমরা স্বীকার করিলাম যে লাট মরে নাই এবং গাড়ি দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। ইহার পর আমরা গোপনীয় জিনিসপত্র ছাত্র ভাণ্ডার বোর্ডিংয়ে রাখিয়া সাবান লইয়া স্নানের ঘাটে গেলাম, ধূলাকাদায় ভরা আমাদের শরীর এবং ধূলায় লাল আমাদের কাপড় জামা ধুইলাম। কাপড় জামা শুকাইয়া হোটেলে খাইতে গেলাম, খাওয়া শেষ হইলে কলিকাতা ফিরিবার জন্য মেদিনীপুর স্টেশনে রওয়ানা হইলাম। স্টেশনে আসিয়া টিকিট করিয়া এদিক ওদিক ঘুরিতেছি, নজরে পড়িল সরকার বিজ্ঞাপন দিয়াছে গোয়ালন্দে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট অ্যালেন সাহেবকে কেহ বা কাহারা গুলি করিয়া মারিয়াছে। যে বা যাহারা অপরাধীর সন্ধান দিতে পারিবে তাহাদিগকে সরকার ১০ হাজার টাকা পুরস্কার দিবে। সেদিকে নজর দিতে প্রফুল্ল আমাকে নিষেধ করায় আমরা ফিরিলাম এবং গোমো প্যাসেঞ্জার আসিলে তাহাতে চাপিয়া আমরা কলিকাতা ফিরিলাম। মেচেদায় ট্রামভাড়ার পয়সা হইতে ক্ষুধার্ত প্রফুল্লকে কিছু খাইবার জন্য আরও ৪ পয়সা দিতে হইল। বাসায় আসিলে বারীনদা ও উল্লাসকর খবর দিল যে লাট মরে নাই, তবে তাহারা হাওড়া স্টেশনে দেখিয়াছে লাটের মুখ ভয়ে শুকাইয়া গিয়াছে। পরদিন সকালে দেখি দু'জনেরই শরীর এবং পা আর চলে না। প্রফুল্লর পা হইতে সাতাশটা আর আমার পা হইতে তেইশটা কাঁটা বাহির হইল। আবার পুরাতন রীতিতে জীবন চলিতে লাগিল।

দিন দশেক পরে পাটনা বাঁকিপুর, সেখানের স্বদেশি ইংরাজি কাগজ মাদারল্যান্ডের সম্পাদক জ্ঞান মিত্র, সতীশচন্দ্র সরকার (বর্তমানে স্বামী নির্ধাণানন্দ) মারফত সংবাদ পাঠাইলেন যে, তাহার সংঘভুক্ত এক ভদ্রলোক মৃত্যুকালে ২৫ হাজার টাকা দেশের কাজে ব্যয় করিবার জন্য দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যুগান্তর দলকে উপযুক্ত মনে করায় ওই টাকা লইতে বারীনদার নির্দেশে উপেনদা, উল্লাসকর, প্রফুল্ল চাকী, সতীশ সরকার ও আমি বাঁকিপুর গেলাম। কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানের অ্যাডভোকেট ছিলেন, তাঁহার গৃহে আমরা উঠিলাম। তাঁহার স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবী (ইঁহাকে আমরা 'মা' বলিতাম) আমাদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। ইঁহারা সকলেই উদাসী সম্প্রদায়ের শিষ্য শিষ্যা ছিলেন। তাঁহাদের গুরু আসিলে কয়েক দিন পরে গুরু নির্দেশ দিলেন আমাদের পাঁচজনকে নেপালে ধুনিসাহেব মঠে গিয়া দীক্ষা ও শিক্ষা লইতে হইবে। আমরা যোগ্য হইলে ওই টাকা দেওয়া হইবে। আমরা পাঁচজন, কেদারবাবু, তাঁর স্ত্রী এবং জ্ঞান মিত্র অপরিসীম কষ্টে বন্য পশু দাবানল ইত্যাদি বিপদ পার হইয়া পদব্রজে সেখানে গেলাম। মন্ত্রদীক্ষা ও দশ দিন সাধনা হইল। তখন গুরু আদেশ দিলেন বুদ্ধগয়ায় গিয়া তথাকার শতগুহার মধ্যে ৬টি গুহা বাছিয়া একটিকে পাঠাগার করিয়া অন্য পাঁচটিতে থাকিয়া আমরা ধ্যান সাধন ভজন করিতে থাকিব। গুরু পরে পরীক্ষা করিয়া যোগ্য ভাবিলে ওই টাকা আমাদের দিবেন। তদনুসারে আমরা বাঁকিপুর ফিরিলাম এবং সক্রিয় কর্মত্যাগ করিয়া ওই পথে যাওয়া বর্তমানে অনুচিত বিবেচনা করিয়া কলিকাতায় ফিরিলাম। এই সময় আমার তরাই জ্বর (Terai fever) হয়। প্রফুল্ল চাকী আমাকে লইয়া দেওঘর যায় এবং বহু সেবাশুশ্রূষা করে। ১৫/২০ দিনে আমি সারিয়া উঠিলে ওইখানে বোমা তৈয়ারির কাজ আরম্ভ করা হয়। এই কালে এখানে কখনও প্রফুল্ল চাকী আসিয়া থাকিত এবং সে কার্যোপলক্ষে কলিকাতা গেলে প্রফুল্ল চক্রবর্তী (ইনি পণ্ডিচেরী আশ্রমের সুরেশ চক্রবর্তীর দাদা ছিলেন) সেখানে যাইতেন। এক দিন একটি সাংঘাতিক ধরনের বোমার কার্যকারিতা পরীক্ষা করিবার জন্য নিকটস্থ ডিগরিয়া পাহাড়ে ওঠা হইল। উল্লাসকর, বারীন, প্রফুল্ল চক্রবর্তী ও আমি ছিলাম। তখন চাকী কলিকাতায়। বোমটা যখন উল্লাসকর লক্ষ্য বস্তুর দিকে নিক্ষেপ করে তখন যে কারণেই হোক শূন্যে উহা ফাটিয়া গেল। উহা হইতে একটি পিতলের টুকরা প্রফুল্ল চক্রবর্তীর রগে লাগিল, সে পড়িয়া গেল, পরে আমরা গিয়া দেখিলাম সে মারা গিয়াছে। বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের মধ্যে প্রফুল্ল চক্রবর্তীই প্রথম শহিদ হইল। তাহাকে আমরা একটি পাথরের আড়ালে শোয়াইয়া নীচে নামিলাম। তৃতীয় দিনে উপেনদা ইহার মৃতদেহ দেখিতে কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন। এমন সময়ে প্রফুল্ল চাকী আবার দেওঘরে আসিল। শ্রীঅরবিন্দের জীবনকথায় বিখ্যাত লেলে মহারাজ এই কালে দেওঘরে আসেন এবং চাকীর ও আমার সেবাযত্নে প্রীত হইয়া আমাদিগকে প্রথম শ্রেণীর শিষ্য করিবার জন্য মন্ত্র দিতে চাহেন। সক্রিয় দেশসেবার কর্ম প্রফুল্লর ও আমার জীবনের একমাত্র সাধনা ছিল, তাই ধ্যান ধারণার নিষ্ক্রিয় সেবা আমি পছন্দ করিলাম না। উভয়েই লেলে মহারাজের প্রভাবমুক্ত হইবার জন্য কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। আমরা আবার মুরারীপুকুর বাগানে রহিলাম।

এপ্রিলের শেষে মজঃফরপুরের কর্ম সমাধা করিবার জন্য প্রফুল্ল চাকী ও আমাকে প্রথমে নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে হেমচন্দ্র দাস কানুনগোর পরামর্শে মেদিনীপুর হইতে ক্ষুদিরামকে আনানো হইল এবং আমাকে রাখিয়া নেতারা ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে মজঃফরপুর পাঠাইলেন। যতটা মনে আছে সেদিন ১৯০৮ সালের ২৮ শে এপ্রিল, ৩ নং রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট হইতে উহারা দুইজনে নেতাদের আদেশ শিরোধার্য করিয়া দেশমাতৃকার পদে আত্মবলি দিতে প্রস্তুত হইয়া বিশেষ কর্ম সাধন করিতে চলিল। তাহার পরের ইতিহাস ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের মহান দুই শহিদের আত্মদানের ইতিহাস। বাঙালি জীবনদানের ইতিহাসে প্রথম শহিদ প্রফুল্ল চক্রবর্তী, দ্বিতীয় শহিদ প্রফুল্ল চাকী তৃতীয় ক্ষুদিরাম বসু, চতুর্থ কানাইলাল দত্ত এবং পঞ্চম সত্যেন বসু। জয় হিন্দ।। বন্দেমাতরম।।

প্রবন্ধ

নইপল সাহেবের প্রস্থানভূমির খোঁজে

আনন্দ ঘোষ হাজরা

২০০১ সালের নোবেল লরিয়েট প্রায় সত্তর বছর বয়সী বিদ্যাধর সূর্যপ্রসাদ নইপলের 'আ হাউস ফর মি. বিশ্বাস' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে। ১৯৯২ সালে যে সংস্করণ হয়েছে তার ভূমিকা লিখেছেন ইয়ান বুরুমা। ভূমিকা লেখকের জন্ম নেদারল্যান্ডসে, পড়েছেন চিনা-সাহিত্য এবং থাকেন টোকিওতে। লেখালেখি করেন, ফিল্ম তৈরি করেন এবং বিখ্যাত 'নিউইয়র্ক রিভিউ অব বুক্‌স্' পত্রিকায় নিয়মিত পুস্তক পর্যালোচনা করেন। তিনি 'ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ' ও 'স্পেকটেটরে'র অন্যতম সম্পাদকও। ভূমিকা লেখকের পরিচয়ে বোঝা যাচ্ছে যে তিনি নিশ্চয়ই উপযুক্ত ব্যক্তি, সুতরাং তাঁর মতামত অবশ্যই শ্রদ্ধাগ্রাহ্য। অনেক কথার মধ্যে তিনি নইপল সম্বন্ধে দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এক,— তিনি তাঁর চতুষ্পার্শ্বের পরিবেশ, কুসংস্কার ইত্যাদির বেষ্টনী থেকে, কর্মের মাধ্যমে, আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মুক্তি পেতে চান ;হয়ত সফল হন, হয়ত হন না এবং দুই — নিজের শিকড় সন্ধানের প্রবণতা তাঁকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। বুরুমার এই মন্তব্য দুটি সরাসরি অবশ্য তাঁর ভূমিকা থেকে উঠে আসে না, তবে তাঁর বক্তব্যের সারাংশ অন্তত ওটাই।

আরম্ভেই, বর্তমান নিবন্ধকার দ্বিতীয় মন্তব্যটি সম্বন্ধে কিছু কথা বলতে চান। শিকড়ের সন্ধান তো অত্যন্ত সাধারণ একটা ব্যাপার আধুনিক সাহিত্যে এবং বিশেষ করে উত্তরাধুনিক সাহিত্যে। বস্তুত, শিকড়ের সন্ধান বা কেন্দ্রের সন্ধান উত্তরাধুনিক সাহিত্যের প্রধান কথা হয়ত। যেহেতু নইপলের পূর্বপুরুষ ভারতবর্ষের উত্তরপ্রদেশের কোনও এক গ্রাম থেকে ত্রিনিদাদে শ্রমিক হয়ে চলে গিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে ত্রিনিদাদেই বসবাস করেছিলেন, অনেক টাকাও উপার্জন করেছিলেন, সেহেতু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নইপলের একটা নস্টালজিয়া থাকা স্বাভাবিক এবং ভারতবর্ষে এসে তাঁর পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়াটাও স্বাভাবিক। নইপলের ক্ষেত্রে, তাঁর আরও একবার ভূমিবদল হয়েছে। তিনি প্রকৃতপক্ষে ইংল্যান্ডের বাসিন্দা। সুতরাং তাঁর স্থায়ী শিকড় কোথায়, সে সম্বন্ধে তাঁর নিজেরই স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা থাকতেই পারে। ত্রিনিদাদ এবং ভারতবর্ষ দুটোই ব্রিটিশরাজের অধীন ছিল। অতএব, এই শিকড়সন্ধান ও কেন্দ্রের সন্ধান তাঁর সাহিত্যকে কলোনিয়াল সাহিত্য হিসাবে দেখতে বাধ্য করবে পাঠককে, এ রকম একটা আশঙ্কা থেকেই যায়। অথচ, বিল অ্যাশক্রাফ্‌ট্, যিনি 'পোস্ট-কলোনিয়াল' থিয়োরির অন্যতম প্রবক্তা এবং যিনি বিশ বছরেরও অধিককাল যাবৎ 'নিউ লিটেরেচর্‌স্ রিভিউ'-এর সম্পাদক, তিনি নইপলকে 'পোস্ট কলোনিয়াল' সাহিত্যের কোনও নির্দেশক বা প্রতিভূ বলে মনে করছেন না। বরং বলছেন — 'Naipaul's a very complex and ambivalent character. He has a very deep antipathy to his own homeland. He does not represent that engagement with contesting imperialism.'। ইংরেজি উদ্ধৃতাংশটির সঙ্গে বর্তমান আলোচক অনেকাংশে একমত, তবু 'পোস্ট-কলোনিয়াল' বা 'পোস্ট-মডার্ন' সাহিত্য হিসাবে নইপলকে বিচার করতে বাধা নেই বোধ হয়; বরং সেটাই সঙ্গত হয়ত। শিকড়হীনতা সম্বন্ধে উত্তরাধুনিকদের ধ্যানধারণা, আধুনিকদের ধ্যানধারণা থেকে একটু পৃথক। শিকড় বলতে সাধারণত বৃক্ষের-অনুষঙ্গ চলে আসে। অন্তত সে ভাবেই ভাবতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু উত্তরাধুনিকদের 'শিকড়' সম্বন্ধে ধারণা অন্য রকম। লম্বা, খাড়া, গাছের কাঠামো যে শিকড় দ্বারা বিধৃত, সেই স্থায়ী, মাটির গভীরে চলে যাওয়া শিকড়ের চেয়ে তাঁরা অবস্থাটা আনুভূমিক ছোট ছোট লতানো ঘাসের সঙ্গে তুলনা করছেন। ওই ঘাসের ছোট ছোট শিকড়ের সঙ্গে কোনও স্থায়ী, গভীরে-যাওয়া, মূল শিকড় নেই। লতানো ঘাসের আনুভূমিক ছোট ছোট শিকড়গুলি মাটিকে ছোঁয়ার মতো করে ধরে থাকে মাত্র। এগুলিকে বলা হয় 'রাইজোম' (Rhizome)। সমাজের সঙ্গে আমাদের লগ্নতা, এমনকী শিশুর লগ্নতাও (যা এতদিন ত্রিভুজের আকারে মূলাশ্রয়ী কাঠামোয় বিধৃত ছিল) এখন 'রাইজোম' লগ্নতা। চলমান, গতিশীল, ভাসমান, কেন্দ্রহীন লগ্নতা। আমাদের সকলের পক্ষেই এটা সত্য। নইপলের পক্ষে এটা আরও বেশিরকম ভাবে সত্য। তিনি বুঝতেই পারেন না কোন ভূমিকে ধরে আছে তাঁর ভাসমান, রাইজোমেটিক, আনুভূমিক লগ্নতা। ভারতবর্ষে এসে তাঁর পিতামহের জন্মভূমি ও বাসভূমিতে গিয়ে আত্মীয়স্বজনদের দেখে তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যান। তাদের স্বাভাবিক আচরণের মধ্যে, দারিদ্রের মধ্যে, তিনি তাদের স্বার্থপরতাকেই দেখেন এবং সব সময় একটা অস্বস্তির মধ্যেই থাকেন। বুঝতে পারেন এই পরিবেশ তাঁর নয়। তাঁর সাহেবিয়ানায় আঘাত লাগে। অবচেতন মনে যে ব্রিটিশ 'হেগিমনি'র প্রবণতাটা থেকে গেছে,

তা এক দিনের জন্য হলেও জেগে ওঠে। সেখান থেকে পালিয়ে এসে তিনি বেঁচে যান। সঙ্গী আই.এ.এস অফিসারকে তাঁর মনে হয় আরও কাছের মানুষ। 'এন এরিয়া অব ডার্কনেসে'র একটি অধ্যায়ে আমরা এই রকমই একটি বিবরণ পাই। আবার 'আ হাউস ফর মি. বিশ্বাস' বইটির পটভূমি যদিও ত্রিনিদাদের, তবু সমগ্র বইটি পড়ে কোথাও আমরা বাস্তবিক ত্রিনিদাদকে পাই না। পটভূমি যে কোনও দেশের হতে পারত। ভারতের তো অবশ্যই। আমরা ভারতীয় হিন্দু পরিবারের, কতকগুলি পরিবারের, কুসংস্কারাচ্ছন্নতার পরিচয় পাই বইটিতে, অথচ তাদের আবার যথেষ্ট ভারতীয় ব'লেও মনে হয় না। ওই রকম একটি পরিবারের দু'একজন ছেলে যখন ইংল্যান্ডে পড়াশুনা করতে যায়, তখন সত্যিই তারা একেবারেই চলে যায় তাদের আশৈশব সংস্কারাচ্ছন্ন পটভূমি থেকে, যেমন নইপল একদা চলে গিয়েছিলেন। কাজেই নইপল নিজেই নিজের লগ্নতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠেন। এবং এ জন্যই তাঁর অন্তর্নিহিত 'টেনশন' থেকেই উঠে আসে তীব্র বিরক্তি। ভারতবর্ষের বা ত্রিনিদাদেরও তিনি ভাল কিছু দেখতে পান না। কারণ ততদিনে নইপল সাহেব বস্তুত ইংরেজ হয়ে গেছেন, হয়ত খানিকটা কিপলিং মনোবৃত্তিসম্পন্নও হয়ে উঠেছেন। সুতরাং নইপলের সাহিত্য এক প্রকার কলোনিয়াল সাহিত্য। লগ্নতাহীন। কেন্দ্রহীন। আবার হয়ত এটাই তাঁর মুক্তিও। তাঁর স্বাধীনতাও। এই যে ভারতবর্ষ বা ত্রিনিদাদকে ত্যাগ করে নীরদ সি'-র মতো বরাবরের জন্য ইংল্যান্ডে অবস্থান — এটাই হয়ত তাঁর এক ধরনের মুক্তি বা স্বাধীনতা, যেটা ইয়ান বুরুমা বলেছেন। এই মনোভাবের জন্যই, ব্রিটিশ-হেগিমনি-ঘেঁষা মনোভঙ্গির জন্যই রানি তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তিনি ইংরেজদের 'স্যার ভিডিয়া' হয়ে যান।

তবু, ভূমিসন্ধান ও ভূমিপুত্র হবার সাধ এবং গোষ্ঠীতন্ত্র সংস্কারতন্ত্র, এমনকী পরিবারতন্ত্র থেকে মুক্তি তাঁর সাহিত্যের মূল বিষয় বলা যেতে পারে। এমনকী, অহংকারের সঙ্গে জীবনে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার মুক্তি ও আনন্দ তাঁর সাহিত্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও কারণ নেই। শুধু 'আ হাউস ফর মি. বিশ্বাস' নামক উপন্যাসে নয়, 'আ বেন্ড ইন দ্য রিভার' বইটিতেও আরেক নির্বাসিত ভারতীয়ের মর্মবেদনা, তার পরিবার, গোষ্ঠী, সংস্কার ইত্যাদি থেকে শুধু বের হয়ে আসার জন্য নয়,— ইতিহাসলগ্ন হয়ে বেঁচে থেকে মুক্তি পাবার জন্য। সেই ভারতীয়ের, সালিমের, স্থান ভারতেও নয় আবার আফ্রিকার জাতীয়তাবাদের দাপটে আফ্রিকাতেও নয় হয়ত বা। কাজেই কেন্দ্র খোঁজার, স্থায়িত্ব খোঁজার, এক অনিবার্য টেনশন থেকে সালিমের মুক্তি কীভাবে? ইতিহাসলগ্নতা না থাকলে তো উ'ে যাওয়া, ফুরিয়ে যাওয়া। সালিমের মধ্যেও যেন, অতএব, নইপলের ছায়া। ইতিহাসের ধাক্কাগুলিকে বুঝে নিতে চেয়েও যেন বুঝতে পারেন না নইপল। সালিম এই রকমই কোনও এক ধাক্কায় আফ্রিকায় এসে পড়েছিল— '(by) one tide of history, forgotten by us, living only in books by Europeans that I was yet to read.'।

এখানে একটা বিষয় লক্ষ করার মতো। যদিও এসব তত্ত্ব ও তথ্য নইপলের লেখা থেকে বের করে আনতে হয় এবং প্রয়োজনও হয় আলোচনার জন্য, তবু নইপলের প্রধান গুণ গল্প বলার ক্ষমতা এবং অনুপুঙ্খ রচনার দৃষ্টি, যাকে 'ডিটেলিং' বলা যেতে পারে ফিল্মি জারগনে। অর্থাৎ অবয়ববাদীদের মতো গল্পটাই বা গল্পের কাঠামোটাই প্রধান, প্রাথমিকভাবে। অবয়ববাদীরা গল্পের এমন একটা অবয়বে বিশ্বাস করেন যে তাতে চরিত্রের অদলবদল ঘটালেও, অবয়বটি ঠিক থাকে। অর্থাৎ গল্পটির সঙ্গে ইতিহাসের বা সমাজব্যবস্থার বা কোনও কিছুর সম্পর্ক থাকে না। যেন, অবয়বটিই প্রধান। 'মি. বিশ্বাসের জন্য বাড়ি' উপন্যাসটিতে কাঠামোটি বা অবয়বটি খুবই সাধারণ। একজন মানুষ কুসংস্কারের আচ্ছন্নতা থেকে, পরিপার্শ্বের অনাকাঙ্ক্ষিত চাপ থেকে বের হয়ে আসতে চাইছে এবং নিজস্ব একটি বাড়ি করতে চাইছে। বাড়ি তার হচ্ছেও কিন্তু টিকছে না। শেষপর্যন্ত হয়ত টিকলও, কিন্তু মৃত্যুর সময় পর্যন্ত কয়েক হাজার ডলার ধার। আর সেই মানুষটির (মি. বিশ্বাসের) লড়াইয়ের মাধ্যম হচ্ছে লেখা, লেখার জন্য পড়াশুনো এবং অভিজ্ঞতাসংগ্রহ। মি. বিশ্বাসের নাম না দিয়ে অন্য যে কোনও নাম দেওয়া যায়, যে কোনও মানুষের। যে কোনও কালের পটভূমিতে গল্পটিকে স্থাপন করা যায়। কুসংস্কারাচ্ছন্নতার বাধা বা আর্থিক বাধাকে অন্য যে কোনও বাধাতে রূপান্তরিত করে গল্পটি বলা যায়। সুতরাং অবয়ববাদী গল্প বইকি। কিন্তু গল্পটির আর একটু অনুপুঙ্খে যাওয়া যাক। মি. বিশ্বাসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাঁর পরিবারের, বিশেষ করে তাঁর শ্বশুরবাড়ির, তুলসী পরিবারের সংস্কারাচ্ছন্নতা। তাঁর শাশুড়ির বংশের—হনুমান হৌসের দাপটের ওপর, সংস্কারের ওপর নির্ভর না করে, শামার (তাঁর স্ত্রীর), শ্যালক শ্যালিকাদের, তাদের পুত্রকন্যাদের, অন্যান্য আত্মীয়দের ওপর নির্ভর না করে, তিনি বেঁচে থাকতেও যেমন পারছেন না, তেমনই, বিদ্রোহও করছেন মাঝে মাঝে। ধর্মে তারা সবাই হিন্দু ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণদের, পণ্ডিতদের, যে সংস্কারাচ্ছন্নতা লেখক দেখিয়েছেন, তা ষাটের দশকের গোড়ার দিকেও (বইটি লেখার সময়) হয়ত ভারতবর্ষের গ্রামেও বর্তমান ছিল, তবে পশ্চিমবঙ্গে ততটা ছিল না বোধ হয়। তা না থাক, ত্রিনিদাদে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের মধ্যে থাকতেও পারে। মোট কথা হচ্ছে, হিন্দুধর্মের সংস্কার, আচারপদ্ধতি, ভগ্নপ্রায় যৌথ-পরিবারকে ধরে রাখার প্রয়াসসঞ্জাত অভিভাবকত্ব (আর্থিক অভিভাবকত্ব তো বটেই), — এ সব ব্যাপার থেকে মি. বিশ্বাস বের হয়ে আসতে চাইছিলেন লেখার মাধ্যমে, নিজের বাড়ি তৈরি

করে উঠে আসতে চাইছিলেন, 'ত্রিনিদাদ সেন্টিনেল' কাগজের সাংবাদিক হয়ে গল্প লিখে অর্থোপার্জন করে। এই উপন্যাসটিতে হিন্দু ধর্ম ছাড়া যে কোনও ধর্মকেই দেখানো যেতে পারত বা শুধু ধর্ম কেন, অন্য যে কোনও বিষয়কেই কঠিন আবরণবলয় হিসাবে দেখানো যেতে পারত, যা ভেদ করে মি. বিশ্বাস ক্রমশ জায়মান হতে চাইছেন, বেঁচে থাকতে চাইছেন। তাতেও অবয়বের বদল হবে না। তবু, অবয়ববাদীদের গল্প এটা নয়, কারণ, মিঃ বিশ্বাস সজ্ঞানে ইতিহাস খুঁজছেন যেখানে তাঁর শিকড়, যেখানে তাঁর কেন্দ্র, যার থেকে তিনি মুক্তি চান। বইটির এক জায়গায় লেখক বলছেন —'The past could not be ignored, it was never counterfiet, he carried it within himself. If there was a place for him, it was one that had already been hollowed out by time, by everything he has lived through, however imperfect, makeshift and cheating.'। এই অতীতবোধের জন্যই সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মবোধের আবরণ থেকে, লৌহবলয় থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার প্রয়াসধর্মিতার জন্যই, এই উপন্যাসটিকে উত্তর-অবয়ববাদীদের বা উত্তর-আধুনিকদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কারণ উত্তর অবয়ববাদ ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বিশ্বাস করে, উত্তর-আধুনিকরা তো অবশ্যই করেন। সুতরাং নইপল, ভূমিসন্ধানের ঐতিহাসিক জটিলতা থেকে, কেন্দ্রসন্ধানের ধারাবাহিক বুনোন থেকে মুক্তি পেতে চাইলেও, মুক্তি পাবেন না কখনওই, 'টেনশন'ই তাঁর লেখায় উপজীব্য বিষয় হয়ে থাকবে।

মি. বিশ্বাসের চরিত্রটি নইপলের বাবার চরিত্র। তাঁর বাবা, এ এ ক্ষেত্রে মি. বিশ্বাস, একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায়, রাখাল বালক হিসাবে সংসার শুরু করেছিলেন দেখানো হয়েছে। পরে বিজ্ঞাপন লেখায় গেছেন এবং তারও পরে 'ত্রিনিদাদ সেন্টিনেল' কাগজের সাংবাদিক হিসাবে জীবন কাটিয়েছেন। সম্পাদক, মি. বার্নেট তাঁকে অনেক সাহায্য করেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন। মি. বিশ্বাসও পরিশ্রম করেছেন, পড়াশুনো করেছেন প্রচুর। তিনি মার্কাস অরেলিয়াস পড়েন, স্যামুয়েল স্মাইলস পড়েন বা সিসিলি হান্টের 'হাও টু রাইট আ বুক' পড়েন ওই বিরোধী পরিবেশের মধ্যে থেকেও। অত্যন্ত সাধারণ এই গল্পের কাঠামোটির বিস্তারের ব্যাপ্তি প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা। কিন্তু নইপলের গল্প বলার ক্ষমতায়, হিন্দু সংস্কার ও আচার-আচরণের উল্লেখের অনুপুঙ্খে, গল্পটি পাঠককে অনিবার্যভাবে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে। নইপল বইটি লিখেছেন বাবার সাংবাদিকতার সাহায্য নিয়ে, বাবার সাংবাদিকতার গল্প-গাথা বা ফিচার থেকে এবং বাবার কাছ থেকে পাওয়া বিভিন্ন জ্ঞানদায়ক দৃষ্টিকোণ সম্বলিত নোট থেকে। এখানে মি. বিশ্বাসের তিন ছেলে এবং এক মেয়ের মধ্যে, এক ছেলে (উপন্যাসে আনন্দ, মূলত নইপল) পড়াশুনোয় জলপানি পেয়েছিল, আমাদের জয়েন্ট-এন্ট্রান্সের মতো কোনও পরীক্ষায় অত্যন্ত ভাল ফল করেছিল এবং পরবর্তীকালে ওই পরিবেশ থেকে বাইরে গিয়েছিল। 'বাইরে' অর্থাৎ ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়েছিল তাকে। (এইভাবে মুক্তি পেতে ইংল্যান্ডে যাওয়া তাঁর অন্য উপন্যাসের চরিত্রেও দেখা গেছে। যেমন 'মিস্টিক মেসিউরে' বা 'হাফ-আ-লাইফে'। 'মি. বিশ্বাসের জন্য বাড়ি' উপন্যাসটির আর একটি চরিত্রও তুলসী পরিবার থেকে ইংল্যান্ডে গিয়েছিল এবং ফিরে এলেও প্রকৃতপক্ষে তুলসী পরিবারে প্রত্যাগমন ঘটে ওঠেনি তার।)

তা হলে লেখাই কি মুক্তির বা বিকশিত হওয়ার পথ? কার্লাইলের মতো নইপলও তাই মনে করেন এবং সেটাকেই তিনি উপায়স্বরূপ গ্রহণ করেছেন? 'ফাইন্ডিং দ্য সেন্টার' নামক পুস্তকটিতে নইপল তাঁর লেখক হয়ে ওঠার আগ্রহের এবং বাবার সাংবাদিক বা লেখক হয়ে ওঠার কথা জানাচ্ছেন আমাদের। এই পুস্তকটিতে 'মি. বিশ্বাসের জন্য বাড়ি' উপন্যাসের মি. বার্নেট নামের সম্পাদকের চরিত্রটির প্রকৃত নাম পাওয়া যাচ্ছে, যাঁর মাধ্যমে মি. বিশ্বাস—নইপলের বাবা— লেখার জগতে গভীরভাবে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। তাঁর নাম ছিল 'ম্যাকগোয়ান'। তিনি 'ত্রিনিদাদ গার্জেন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে নইপলের প্রথম উপন্যাসের (মিস্টিক ম্যাসিউর) প্রধান চরিত্রটিও লেখক। তার নাম কৈলাস। আসলে বন্ধন থেকে যে মুক্তি বা স্বাধীনতা তিনি চাইছেন, সেটা তাঁর মতে লেখার মাধ্যমেই আসতে পারে হয়ত। লেখকরাই হয়ত তাঁর কাছে একমাত্র দার্শনিক। কিন্তু কি আশ্চর্য, ম্যাকগোয়ানকে নইপল আবার ওই হিন্দু গুরুর সঙ্গেই তুলনা করছেন—'The Hindu, who wants to be a Pandit has first to find a Guru. My father wanting to learn to write, found Macgowan. It was Macgowan, my father said, who taught him how to write and all his life my father had for Macgowan the special devotion the Hindu has for Guru.' । তা হলে কোথাও একটা শ্রদ্ধার ভাব, হিন্দু গুরুর ওপর, পোষণ করেন কি নইপল? এটা মনে করা অসঙ্গত হবে? এখানে একটা কথা মনে হচ্ছে। সংস্কারাচ্ছন্নতা বা আচারসর্বস্বতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়েও মি. বিশ্বাসের এক ধরনের সমর্পণ অন্তত আছে, কিছুটা হয়ত শ্রদ্ধাও—এ কথা বর্তমান আলোচকের, বইটি পড়তে পড়তে মনে হয়েছে। অবশ্য এটা ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা। মি. বিশ্বাসের প্রকৃতপক্ষে কোনও স্থির ভূমি ছিল না। বাবা রঘুর মৃত্যুর পর পাকেচক্রে হয়ত 'শামা'র সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলা খেলতে গিয়ে, বিজ্ঞাপন লেখক বিশ্বাস তুলসী পরিবারে আশ্রয় পান। তারপর থেকে মাঝে মাঝেই শুধু ভেসে যাওয়া। প্রথমে তুলসী পরিবারে, তারপর 'চেজ' নামক একটি জায়গায় যেখানে তুলসী পরিবারের বিষয়বিত্তের ওপর সম্বল করেই তিনি দোকান

দিয়েছিলেন। শামা ও শামার মা মিসেস তুলসী যিনি সমস্ত পরিবারটির কর্ত্রী ও অভিভাবিকা, চেষ্টা করে গৃহপণ্ডিত হরিকে দিয়ে দোকানের পুজোও দিয়েছিলেন। এই পুজোর বিরুদ্ধে বিশ্বাসের প্রতিবাদ ছিল, তীব্র প্রতিবাদই ছিল। কিন্তু যাদের অবলম্বন করেই তাঁকে বেঁচে থাকতে হবে তাদের কাছে সমর্পণ ছাড়া তো করার কিছু নেই। সেখান থেকে, দোকানদারী ব্যর্থ হবার পর, 'গ্রিন ভেলে' তুলসীদেরই এস্টেট দেখার কাজে নিযুক্ত হন। সেখানে সমাজ পরিবেশ ছেড়ে দিয়ে তাঁকে একটা বাড়িতে অত্যন্ত নির্জনতার মধ্যে থাকতে হয়। নির্জনতাসঞ্জাত একটা ভয় সে সময় তাঁকে গ্রাস করে। যেন উটের গ্রীবার মতো জীবনানন্দীয় নির্জনতা। তাই চেষ্টাচরিত্র করে নিজের বাড়ি বা বাড়ির মতো একটা কিছু বানিয়ে সেখানে উঠে যান। সেই বাড়িটির জন্যও হরি পন্ডিত পূজা করে, বিশ্বাসের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও। বিশ্বাসও মেনে নেন। কোনও এক রাত্রে প্রচণ্ড দুর্যোগে ঝড় জলের মধ্যে কাঠের তৈরি 'বাড়ি' নামক খেলনাটি ভেঙে পড়ে। ভাগ্যিস সে সময় শামা ও তার কন্যা সেখানে ছিল না। কিন্তু পুত্র আনন্দ ছিল, অর্থাৎ নইপল। সে জন্যই হয়ত, নিজের শৈশবকালের অভিজ্ঞতার রূপচিত্রণ বলেই হয়ত, কি আন্তরিক ও কি ভয়ঙ্কর সুন্দর এই ঝড়ের রাতের বর্ণনা। এই ঝড় জলের বর্ণনার সঙ্গে, বিশ্বাস ও আনন্দের মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানোর ফলে যে মানসিকতা, — তার বর্ণনা সত্যিই পাঠককে অভিভূত করবে। ঝড়ে বাড়ি উড়ে যায়, আর বিশ্বাসের মানসিকতা একটা প্রবল শূন্যতার মধ্যে, সার্ত্রে কথিত 'নাথিংনেসের' মধ্যে আছড়ে পড়ে। বিপন্ন-অস্তিত্ব, মানসিক-ভারসাম্য-বিপর্যস্ত, মি. বিশ্বাসকে ও তাঁর পরিবারকে আবার তুলসী পরিবারই আশ্রয় দেয়। 'গ্রিনভেল' থেকে মি. বিশ্বাস (এবং সমগ্র পরিবারটি) 'পোর্ট অব স্পেনে' যান এবং সেখানে 'ত্রিনিদাদ সেন্টিনেল' কাগজে চাকরি পান সাংবাদিকতায়। সেখান থেকে 'শর্ট হিলস' নামক জায়গায় আর সবশেষে 'সিকিম স্ট্রিটে' নিজের বাড়িতে। বারবার, নানা আচার আচরণের জন্য, ধর্মীয় সংস্কারের জন্য তাঁর সঙ্গে তুলসী পরিবারের বিরোধ ঘটে। কিন্তু তবুও তুলসী পরিবারে, মিসেস তুলসীর আধিপত্যে নিজেকে অর্পণ না করে উপায় থাকে না তাঁর। এই সমর্পণ থেকেই, সত্তাবর্জন থেকেই, বিশ্বাসের মনে উপরোক্ত শূন্যতার জন্ম হয়। কিন্তু বারবার তিনি তা কাটিয়ে ওঠেন। গ্রিনভেলে বিশ্বাসের মানসিক বিচ্যুতির কারণগুলি হল, এস্টেটের ছাঁটাই শ্রমিকদের যে কোনও সময় বদলা নেবার সম্ভাবনা, ফসলের খেত পুড়িয়ে দেবার সম্ভাবনা, বাড়িটা পুরোপুরি তৈরি না হওয়া, পণ্ডিত হরি কর্তৃক আবার ভিতপুজো এবং সর্বোপরি সাইক্লোন। এতদ্‌সত্ত্বেও যে তুলসীদের সঙ্গে তাঁর বারবার বিবাদ এবং যাদের সঙ্গে তাঁর মানসিক সাযুজ্য একেবারেই নেই, তাদের সাহায্যেই তিনি আবার একবার পৃথিবীকে, পৃথিবীর ভয় পাওয়ানোর শক্তিকে পরীক্ষা করে দেখতে চান। আবার নৈরাশ্য এবং মানসবৈকল্য থেকে জেগে ওঠেন এবং কাজের মধ্যে নিজেকে নিক্ষিপ্ত করেন — সাংবাদিকতার কাজ। ক্রমশ বিশাল তুলসী পরিবার ভেঙে যাচ্ছিল। মিসেস তুলসী সামগ্রিকভাবে ধরে রেখেছিলেন তাঁর বিশাল পরিবার। কে ছিল না সেখানে? অনেক অপরিচিত বহুদূর সম্পর্কের লোকজনও ছিল। কিন্তু মিসেস তুলসীর বয়েস হয়ে যাওয়ার জন্য, সম্পত্তি নিয়ে শেঠের বিশ্বাসঘাতকতা ও একের পর এক মৃত্যুর ফলে (শর্মার মৃত্যু, হরিপণ্ডিতের মৃত্যু, পদ্মার মৃত্যু) এবং হয়ত বেশ কিছুটা আর্থিক অসুবিধার ফলে, মিসেস তুলসী সে ভাবে সংসার ধরে রাখতে পারছিলেন না। ক্রমশ আরও বেশি সংস্কারবদ্ধ হয়ে যাচ্ছিলেন। বিধবাদের কচি বাঁশ পাতা খেতে বলছিলেন যা নাকি চিনদেশে খায় বলে তিনি শুনেছিলেন। চা খেতে নিষেধ করছিলেন। বিধবাপুত্রেরা লুকিয়ে ভেড়ার মাংস খাচ্ছিল। পদ্মার ভূত দেখা যাচ্ছিল মাঝে মাঝেই। লুকিয়ে ভেড়ার মাংস খাওয়ার ফলে টাট্‌লের মুখের ভেতর ঘা হয়েছিল। শর্মার মৃত্যুর পর হরিপণ্ডিত যে সমস্ত পুজো-আচ্চা করছিল, সেগুলি সে বিশ্বাসের বাড়ির ভিতপুজোতেও করেছিল। এই ভাবে নানা সংস্কারকে নইপল ব্যঙ্গ করেছেন, কখনও কখনও হাস্যকরভাবে উপস্থাপিত করেছেন; তবু এটা পাঠককে অনুভব করাতে পেরেছেন যে এক সময় মিসেস তুলসীর জন্যই তুলসী পরিবারের যৌথসত্তা বিদ্যমান ছিল। যৌথপরিবারের বুননের মূল সূত্রটি যেন তিনিই এবং তিনিই আবার স্নেহময়ী শাসনকর্ত্রী, অভিভাবিকা অথচ তমসায় আচ্ছন্ন। কোথাও যেন তাঁর প্রতি একটা শ্রদ্ধার দৃষ্টি অথবা অনুভব থেকে গেছে মি. বিশ্বাসের, যদিও বিশ্বাস মিসেস তুলসীকে এবং মিসেস তুলসীর সামনেই শামাকে বা অন্যকে সরাসরি কটুকথা বলতে পিছপা হননি। অবশ্য মি. বিশ্বাসও মানুষ হিসাবে যে কেবল প্রতিবাদী চরিত্রের ছিলেন তা নয়। এমন অনেক কিছু করতেন যা কোনও মতেই সমর্থন করা যায় না; কমলালেবু চুরি করে বিক্রি করা পর্যন্ত। স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার তো খারাপ ছিলই, এমনকী স্ত্রীর গায়ে হাত তুলতেও কসুর করেননি একবার। বরং শান্ত মাধুর্যময়ী গৃহবধূ হিসাবে শামা (বিশ্বাসের স্ত্রী) আমাদের কাছে অনেক আকর্ষণীয়া। তাই মাঝে মাঝে মনে হয়, হিন্দু ধর্মের ওপর, সংস্কারগুলির ওপর, আচারপদ্ধতির ওপর কোথাও কি কোনও দুর্বলতা ছিল মি. বিশ্বাসের, অন্তত অবচেতনেও? যার জন্য মিসেস তুলসীর প্রতি এই সমীহ? নাকি নিজের আর্থিক প্রয়োজনের জন্যই বাধ্য হয়ে এই সমীহ? যদি প্রতিবাদী চরিত্রই হবেন মি. বিশ্বাস তা হলে সমর্পণ না করে কি একেবারেই পারতেন না? নিদেনপক্ষে ত্রিনিদাদ সেন্টিনেলে চাকরি নেওয়ার পরেও? তাঁর পিতার এই দ্বিধা, এই মনোভাব কি নইপলের মধ্যেও বর্তেছে? তা হলে নইপলের প্রকৃত অবস্থানটা কী? আমরা দেখব এখন।

এ প্রসঙ্গে তাঁর 'এনিগমা অব অ্যারাইভাল' নামক পুস্তকটির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এই বইটিতে, এক জায়গায়, ত্রিনিদাদে তাঁর বাবের মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ-শান্তির আচার-আচরণ বর্ণনা করেছেন তিনি। পণ্ডিতের আচারপদ্ধতিগুলি সম্পন্ন করার পর তিনি এমন কিছু আশা করেছিলেন, এমন কিছু শ্লোকাংশও শুনতে চেয়েছিলেন, যা তাঁর বিষাদকে, মৃত্যুভয়কে অন্তত সাময়িক হলেও প্রশমিত করবে। কারণ সেটাই হত অতীতের প্রস্থানভূমির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। কিন্তু তিনি তা পাননি। তা হলে ভারতসম্পর্কে নস্টালজিয়ারও কোনও মানে আছে কি তাঁর কাছে? হিন্দুধর্মাচরণের প্রতি অবচেতনেও যদি তাঁর একটু সমীহভাব না থাকবে, যদি তার প্রতিবাদ করাই তাঁর উদ্দেশ্য হবে, তা হলে মুহূর্তের জন্যও এ রকম পুরনো পাদপীঠের আশা করবেন কেন? আর যদি কিছু না পেলেন তা হলে ইতিহাস বা নস্টালজিয়ার বাহ্যত কোনও মানে থাকার কথা নয়। তিনি বলছেন — 'There is no ship of antique shape to take us back. We have come out of the nightmare and we have nowhere else to go'। কাজেই, কোনও প্রকৃত অবস্থানভূমি নইপলের নেই বলেই, মৃদুসমীহ ও নস্টালজিয়া থাকলেও, ভারতীয়রা নইপলকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত বলে মনে করে আহলাদিত হলেও, (নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর শোনা গেছে) নইপল ভারতবর্ষে এসে তাল কিছুই দেখতে পাননি।

'অ্যান এরিয়া অব ডার্কনেস' বইটির ছত্রে ছত্রে নইপলের এবম্বিধ মানসিকতারই প্রতিফলন ঘটেছে। এই বইটির পুথকভাবে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন উপযুক্ত হাতে এবং সময় পুস্তকটিতে এমন বহু মন্তব্য আছে যেগুলির প্রতিবাদ হওয়া খুব প্রয়োজন। হয়ত ভারতবর্ষ বা পশ্চিমবঙ্গ সারস্বত সাধনার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী কিন্তু নিজের পূর্বপুরুষের বাসভূমিতে এসে কতকগুলি ঘটনা ওপর ওপর দেখে আলটপকা মন্তব্য করা অথবা বুঝেই হোক বা না বুঝেই হোক মিথ্যা বলা কোনও ভাল সাহিত্যিকের কাজ হতেই পারে না। বইটি ভ্রমণকাহিনি। প্রথম অধ্যায়েই তিনি পূর্বদেশের যে পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেছেন তা হচ্ছে— রাস্তায় ছেলেমেয়েরা, ধুলো, রোগ-বীজাণু, অপুষ্টি, বকশিসের জন্য চিৎকার, হকার, দালাল, মাঝেমাঝে বড় বড় মসজিদের চূড়ো ইত্যাদি। এবং তাঁর প্রথম বীক্ষণের অভিঘাত এই যে সাম্রাজ্যবাদের ইংরেজিয়ানা থেকে গেছে ইউরোপীয় স্টাইল-শপে, ফরাসি হেয়ারড্রেসার ও ফরাসি সুগন্ধির মধ্যে। এছাড়া তিনি কী দেখছেন? পাঠক ভাবতে পারেন? তিনি দেখছেন— 'Indians defecate everywhere. They defecate mostly beside the Railway tracks. But they also defecate on the beaches; they defecate on the hills; they defecate on the river banks, they defecate on the streets, they never look for cover.'

তাঁর মতে, ভারতীয়েরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণেও নাকি খোলামেলাভাবে বিষ্ঠাত্যাগ করে। তাঁকে নাকি এক মুসলিম ছাত্র বলেছিল এভাবে নিত্যকর্মসারা খুব কাব্যিক, কারণ ভারতীয়রা খুব প্রকৃতিপ্রেমিক! আবার পাঠকদের তিনি সাবধানও করে দিচ্ছেন এই বলে যে ভারতীয়েরা নাকি এই সব প্রাতকৃত্যকারীদের দেখতেই পায় না এবং তাদের অস্তিত্বই অস্বীকার করে। অস্বীকার করার সাধ্য কি আমাদের? আমরা, বনেদি সাহেব নইপলের ভাই বেরাদরেরা, মিস্টিক ভারতীয়েরা, ভোজবাজিতে পারদর্শী ভারতীয়েরা, এই সব তথ্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়ে আপনার কাছে বাধিত হয়ে রইলাম চিরদিনের মতো, কারণ আপনি যখন বড় সাহিত্যিক এবং নোবেল লরিয়েট তখন আপনিই তো আমাদের দেখাবেন,—নিশ্চয়ই দেখাবেন, দেখতে না পেলেও দেখানোর দায় আপনার। অবশ্য এক্ষেত্রে এবং আরও অন্যান্য ক্ষেত্রেও, আপনি সঠিকভাবে কী বলতে চাইছেন আমাদের বুঝে নেওয়া দরকার। কারণ, আপনি তো ভারতীয়ত্ব মানে হিন্দুত্ব মনে করেন, হিন্দুদের কুসংস্কার বোঝেন, গরিবিয়ানা বোঝেন, রোগবীজাণু বোঝেন এবং মুসলমানদের কথা বলার সময় আপনি তাদের ভারতীয় মনে করেন কি না ঠিক বুঝতে পারি না আমরা। তিনি যে মুসলমানদের ভারতের বিদেশি মনে করেন তার বড় প্রমাণ রেখে গেছেন 'অ্যান এরিয়া অব ডার্কনেস' বইটিতে এক অমোঘ মন্তব্যে। তিনি বলছেন- মোগলেরা—মুসলমানেরা ভারতে বড় বড় মসজিদ রেখে গেছে শুধু, তাজমহলও রেখে গেছে, কিন্তু ব্রিটিশেরা ভারতীয়ত্বের মধ্যে অঙ্গীকৃত করে নেবার জন্য কিছুই রেখে যায়নি। মুসলমানেরা যে আলাদা এটা বোঝাবার জন্য, যে আজিজ তাঁর অমরনাথ যাত্রার ব্যবস্থা করে, সঙ্গী হয়, সে যে অমরনাথ মূর্তি দেখবে না সেটা বলতে ভোলেন না কারণ তারা মূর্তিপূজার বিরোধী। যদিও সেবার পাকেচক্রে অমরনাথের মূর্তি তিনি বা আজিজ কেউই দেখতে পাননি, তবু তিনি কি মনে করেন যে আজিজ তাঁর সঙ্গী হয়েছিল শুধু ব্যবসার খাতিরেই? হোটেলের প্রয়োজনেই? হোটেলের মালিকও তো মুসলিম। আর মুসলিমরা তো এদেশে লুণ্ঠনের জন্যই এসেছিল (ব্যবসার জন্যও হয়ত, ব্রিটিশরা ব্যবসার জন্য তা হলে আসেনি?)। তিনি তাজমহলে বা মুসলমানদের মসজিদে শিল্পকলার পরিচয় পাননি। শুধু লুণ্ঠনবৃত্তি ও মোগালোম্যানিয়া লক্ষ করেছেন, যদিও 'মোগালোম্যানিয়াক' শব্দটি স্পষ্ট করে উচ্চারণ করেননি। এ সবের মধ্যে কোনও কারুবাসনা বা কারুপ্রতিভার বা সৌন্দর্যবোধের পরিচয় তো তিনি পেলেনই না, উল্টে মোগলসাম্রাজ্যের শাসকদের মধ্যে কেবল লুণ্ঠনবৃত্তিরই পরিচয় পেলেন। মুসলমানেরা লুণ্ঠন করতে এসেছিল, লুণ্ঠন করে আবার ফিরে গেছে এটাই কি মনে করেন নইপল সাহেব? সাহেব, একটু জানাবেন কি আমাদের, কোথায় ফিরে গেছে তারা?

ভারতের প্রাচীনত্ব বলতে কি তিনি হিন্দুত্ব বোঝেন? এবং প্রাচীনত্ব যদি কিছু থাকে, তা কি মুসলমানেরাই নষ্ট করেছে? তাঁর সাম্প্রতিক পুস্তক 'হাফ-অ্যা-লাইফ' গ্রন্থের একটি চরিত্রের মাধ্যমে তাঁর অবিস্মরণীয় উক্তি — 'that philosophical and practical way of dealing with sex belongs to our past and that world (the past) was ravaged and destroyed by the Muslims.।' (বন্ধনীর উক্তি আমার)। হিন্দু ধর্মের আচার আচরণে তিনি তো আঘাত দিতে চান। খুব ভাল কথা। তা হলে তিনি ভারতে এসে অমরনাথ যাত্রার প্রয়োজনবোধ করলেন কেন? শিবের লিঙ্গমূর্তি তিনি পছন্দ করেন না, এমনকী নটরাজ মূর্তিও। কাশ্মীরে গিয়ে শুধু দেখলেন অমরনাথ আর মহরম, বুঝলেন সিয়াসুন্নির পার্থক্য আর আমাদের জানিয়ে দিলেন কাশ্মীরের জনসাধারণের অজ্ঞতার কথা। তিনি এটাও আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে ভুললেন না যে ব্রিটিশরা বা ইউরোপীয়রাই ভারতকে শিল্পকলা দেখতে শিখিয়েছে। এ রকম প্রচুর মন্তব্য আছে নানা বিষয়ের ওপর। ভারতবর্ষ যে পৃথিবীর মধ্যে দরিদ্রতম দেশ — তাও আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। আবার নইপল যখন ঐতিহাসিকের দায় ঘাড়ে নেন, তখন তাঁর সওয়াল বিজেতাদের পক্ষে। এবং কী চমৎকার পর্যবেক্ষণ দেখুন, ব্রিটিশদের আগমনের জন্য নাকি তৈরিই ছিল ভারত। অপেক্ষা করছিল! বিজেতাকে যেতেও হত না, কিন্তু বাদ সাধল ফরাসি শ্বেতকায়া মহিলাদের আগমন, একথা নাকি কেউ কেউ বলেন। কী আশ্চর্য, আমাদের চক্ষু সত্যিই উন্মীলিত হয়ে গেল! কিন্তু চক্ষু গোলকার হয়ে যেতে সত্যিই বাকি আছে আমাদের। নইপল মনে করেন ভারত সম্বন্ধে ব্রিটিশদের 'অ্যাটিটিউড্' (attitude) বদল হওয়াই ব্রিটিশদের চলে যাওয়ার কারণ। ব্রিটিশরা মোগলদের মতো ঘোষণা করতে পারল না যে যদি কোথাও ফিরদৌস থাকে তা এখানে। রাজত্ব করতে করতে ব্রিটিশরা মুসলমানদের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ভাল চোখে নেয়নি এবং তারাই নাকি ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করেছিল। ব্রিটিশরা কখনওই ভারতীয় সভ্যতার অঙ্গীভূত হতে চায়নি। হে ঐতিহাসিক নইপল সাহেব আপনাকে দণ্ডবৎ জানাই। আপনি আমাদের যথার্থই হিন্দু গুরু। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন এক কথায় নসাৎ। গান্ধীজিও তা হলে নসাৎ? ভারতীয়দের প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপর আপনার কি আস্থা নেই? কোনও আন্দোলনই হয়নি? সে জন্যই দেখতে পেলেন না কিছু? কপিলিং না হয় নিজে বাল্যকালে দুর্বল ছিলেন বলেই শোনা যায় এবং এমন কথাও শোনা যায় যে একেবারে শৈশবে চাকরদের হিন্দি অনুবাদ ছাড়া ভাল করে বাড়ির ইংরাজি কথাবার্তা, খাস ইংরেজ বাচ্চা হয়েও, বুঝতেন না। হয়ত সে জন্যই তাঁকে নিজের দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ জন্য তাঁর অবচেতনে একটি ভারতবিরোধী মনোভাব গড়ে উঠতে পারে। অবচেতনে, সুতরাং, ভারতীয়দের দুর্বলতাকে বড় করে দেখতে পারেন এবং সাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু নইপল সাহেবের এ জাতীয় ব্রিটিশপ্রিয়তার ও ভারত সম্বন্ধে উল্টোপাল্টা কথা বলার কারণ কী? তিনি খাস সাহেবও নন, খাস ভারতীয়ও নন। এমনকী ত্রিনিদাদকেও তিনি মনে প্রাণে ভালোবাসেন না। সেটাই কি কারণ? 'মালটি-কালচারালিজম' বা বহুসংস্কৃতির যে 'ইউনিভার্সাল', সে সম্বন্ধে কোনও ধারণাই কি তাঁর নেই? কিংবা তিনি হয়ত সত্যি কথাই বলেছেন প্রকারান্তরে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, ব্রিটিশ সংস্কৃতি, গরিব দুর্বল ভারতীয়দের আঘাত করে শেষ করে দিতে পারেনি, বরং এক নতুন ধরনের প্রত্যাঘাতের সম্মুখীন হয়েছিল ওই গরিব দুর্বল ভারতীয়দের কাছ থেকেই। তাই ব্রিটিশ 'অ্যাটিটিউড্' হয়ত পরিবর্তিত হতে বাধ্য হয়েছিল। আশিস নন্দী খুব চমৎকার একটা উদাহরণ দিয়েছেন। তার সারমর্মটি উদ্ধার করা যেতে পারে। আজটেকদের যদি বলা হত যে তাদের ঈশ্বর মারা গেছেন এবং সেটা যদি তাদের কোনওক্রমে বিশ্বাস করানো যেত, তা হলে আজটেকরা প্রাণবিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না। কারণ, ঈশ্বরই যদি না থাকল তা হলে বেঁচে থাকার অর্থ কী? কিন্তু ভারতীয়দের ক্ষেত্রে আলাদা। তারা দুর্বল বলেই, শারীরিকভাবে দুর্বল বলেই বোঝে আপনি বাঁচলে বাপের নাম। হিন্দু, মুসলিম, অন্যান্য সব সংখ্যালঘু ভারতীয়রই হয়ত এই মনে করে যে নিজে বেঁচে থাকলে আমার ঈশ্বর বা আল্লাও বেঁচে থাকবে। অথবা ঈশ্বরের মৃত্যুই তারা বিশ্বাস করবে না কিছুতেই। অথবা অনেকেই ঈশ্বরের অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে না। সুতরাং মার খেতে খেতেও তারা বেঁচে থাকবে অথবা বিজেতাদের সংস্কৃতিকে আচার আচরণকে নিজেদের মতো করে গ্রহণ করেও বেঁচে থাকতে চাইবে। হয়ত ধর্মান্তরিত হয়েই বাঁচতে চাইবে। এদের নিয়েই তো বিপদ। আজটেকরা তো স্টেজ থেকে বিদায় নেবে। কিন্তু ভারতীয়রা তো স্টেজের ওপর হাত কচলে থেকেই যাবে। তা হলে? নইপল সাহেব, ভারতীয় বলতে আমরা ভারতবাসীকেই মনে করছি। আপনাকে মনে করিয়ে দিই, মুসলমানেরা ভারত ত্যাগ করে যায়নি। তারা ভারত সংস্কৃতির মধ্যেই অঙ্গীভূত। ভারতের সংস্কৃতি বহুসংস্কৃতির সহাবস্থান। কতটা অঙ্গীভূত সে প্রশ্ন অবান্তর। প্রক্রিয়াটা চলছে। (কিন্তু তাদের না যাওয়াটাই সত্য)। যেমন চলছে ব্রিটিশ বা ইউরোপীয় সংস্কৃতিকেও অঙ্গীভূত করার প্রয়াস। ইংরেজি ভাষা আজ আমাদের কাছে আবশ্যিক হয়ে উঠছে। ইউরোপীয় শিল্পোদ্যোগকে আমরা গ্রহণ করছি। সারা বিশ্বের সংস্কৃতিকেই তো গ্রহণ করার চেষ্টা করছি। ব্রিটিশরা কিন্তু চলে গেছে। নইপল সাহেব, এটা এক ধরনের বিশ্বব্যাপী দার্শনিক, শৈল্পিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন। একই ইউনিভার্সালের মধ্যে ডায়ালেকটিকসের মাধ্যমে নামা অ্যাপিয়ারেন্সের সহাবস্থান। তার জন্য ভায়োলেন্স

হয়ত লাগে। কিন্তু লিবারেলিজমের মাধ্যমেও এই সাংস্কৃতিক সহাবস্থান সম্ভব। তাতে, ব্রিটিশরা থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা কি? আর ভারতীয়েরা গরিব বা দুর্বল হলেই বা কি? হঠাৎ আমেদাবাদের আশ্রম থেকে ডান্ডি পর্যন্ত (২৪০ মাইল) ৬১ বছর বয়সে ৭৮ জন সঙ্গী নিয়ে এক ভারতীয়ের কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হয়ে হেঁটে যাওয়া এবং এক টুকরো লবন উঠিয়ে নেবার নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতার মধ্যে সরোজিনী নাইডুর চিৎকার — দৃশ্যটা যতই দুর্বলদের, গরিবদের মনে হোক, এর মধ্যে অবশ্যই এমন কিছু ছিল, যাতে ডান্ডি অভিযানের সময় নববুই জন গ্রামপ্রধান পদত্যাগ করেন এবং যার ফলেই ডান্ডি অভিযান কাগজে কাগজে প্রচার ও ছবিতে ছয়লাপ হয়ে ওঠে এবং ভারতীয়দের সত্তা আর এক ইউরোপীয় সত্তার মুখোমুখি হয়। এভাবেই ব্রিটিশ 'অ্যাটিটিউড্' পরিবর্তিত হয়। আপনি কি এইরকম 'অ্যাটিটিউড্' বদলের কথা বলেছেন? বোধ হয় না। অবশ্য এটা ঠিক, আপনি 'দুর্বল' কথাটি বোধ হয় ব্যবহার করেননি স্পষ্টভাবে। আমি ভারতীয় আন্দোলনের প্রকৃতি এবং রীতির একটাই উদাহরণ দিলাম। টেরোরিস্ট আন্দোলনেরও দিতে পারতাম 'সুভাষ বসুর কথাও বলতে পারতাম। কিন্তু আমি তো ঐতিহাসিক নই। এ সব বলার জন্য আলোচনাও নয়। শুধু আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া, ব্রিটিশ অ্যাটিটিউডের বদল গরিব ভারতীয়দের জন্যই হয়েছিল। অন্য কোনও কারণে নয়। আমাদের সমগ্র আন্দোলন জুড়ে এরকম লক্ষ উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। নইপল সাহেব, আপনি কি সত্যিই আপনার পূর্বপুরুষের ভারতবর্ষকে জানতে চান?

যাই হোক, বইটিতে কাশ্মীর সম্বন্ধে এমন দৃষ্টিভঙ্গি আছে, ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি, গীতার উক্তি বা ভারতের ইংরেজিয়ানার সম্বন্ধে এমন সব কথা আছে যা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে নিবন্ধটি অযথা বড় হয়ে যাবে। লেখকের সীমিত ও অগভীর দৃষ্টি সম্বন্ধে শুধু এটুকুই বলা যেতে পারে যে কলকাতার মল্লিকবাড়ির ইংরেজিয়ানার সঙ্গে অরবিন্দের বা রামমোহনের ইংরেজিয়ানার তুলনা করে দু'রকম সাহেবিপনাকে একই পর্যায়ে ফেলেছেন তিনি। দু'টোর মধ্যে পার্থক্যই ধরতে পারেননি। বাঙালিদের প্রতি তো তিনি বিশেষভাবেই বিমুখ। কারণ, তিনিই জানেন। বলছেন — " ..... and for the Bengali, who was most susceptible to Englishness, the English in India reserved a special scorn. "। অবশ্যই এ ব্যাপারে তিনি আর এক বাঙালি সাহেব নীরদ সি-কে সহমর্মী পেয়ে গেছেন, সুতরাং তাঁরই উদ্ধৃতি নইপল ব্যবহার করেছেন " .... all that was good and living within us was made, shaped and quickened by the same British rule. "। নীরদ সি এবং নইপল সাহেব, আপনারা যদি আমাদের বলে দিতেন ব্রিটিশবিহনে আমাদের কী করতে হবে, তা হলে খুব ভাল হত। ব্রিটিশরা না থাকায় এবং উপরোক্ত সাহেবদ্বয় কোনওরকম প্রেশক্রিপসন না দেওয়ায় আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের শূন্যতা কল্পনা করে, আমরা ভয়ঙ্কর ভাবিত, ভীত ও বিহ্বল হয়ে পড়েছি। নীরদ সি-তো আর কিছু বলতে পারবেন না। নইপল সাহেব পরিত্রাতার ভূমিকায় অবশ্যই নামতে পারেন এখনও। কিন্তু তাঁর নিজের অবস্থান সম্বন্ধেই তো তিনি নিশ্চিত নন। পৃথিবীর কোন ভূখণ্ডে তিনি প্রকৃত পক্ষে দাঁড়িয়ে আছেন? ত্রিনিদাদের, নাকি উত্তরপ্রদেশের, নাকি ইংল্যান্ডের সাহেবিয়ানার ভূমিতে? থাকুন না যেখানে তাঁর ইচ্ছে, কিন্তু কে তাঁকে মাথার দিব্য দিয়েছে আন্তর্জাতিক হবার জন্য ঘুরে বেড়াতে আর 'ভারতের পোলা' নাম ভাঙিয়ে ভারতবিরোধী কথাবার্তা বলতে? শুধু মন্দবীক্ষণ কেন, শুভবীক্ষণেরও তো প্রয়োজনীয়তা ছিল।

কিন্তু এতসত্ত্বেও আমি বলতে বাধ্য, নইপল সাহেবের সাহিত্যে চমৎকার ডিটেলিং থাকে, সুন্দর প্রকৃতি বর্ণনা থাকে এবং যাযাবরের দৃষ্টিপাতের মতো বা রঞ্জনের শীতে উপেক্ষিতার মতো ভ্রমণধর্মী রচনায় তিনি অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত। 'অ্যান এরিয়া অব ডার্কনেস' বইটিতে যতখানি কাহিনি, তার যদি সত্যাসত্য বিচার না করা হয়, মন্তব্যগুলি যদি বাদ দেওয়া যায়, যদি ইতিহাসের প্রেক্ষিত না দেখা হয়, তা হলে পুস্তকটির মধ্যে অনবদ্য গল্প ও চরিত্রায়ণ পাওয়া যেতে পারে। রফিক, আজিজ, লারা এবং উত্তরপ্রদেশের গ্রামে তাঁর আত্মীয়দের চরিত্রচিত্রণ বাস্তবিকই সুন্দর। উদাহরণ দিতে গেলে শুধু প্রবন্ধের কলেবর বাড়বে। আমার যা বক্তব্য তা বোধ হয় বলা হয়ে গেছে। গল্প বলিয়ে হিসাবে, কাহিনিকার হিসাবে ভি. এস. নইপল অত্যন্ত দক্ষ। শুধু আক্ষরিক অর্থে নয়, প্রতীকী অর্থে, তাঁর প্রয়োজন ছিল প্রকৃত একটি নিজস্ব প্রস্থানভূমির, যেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি আমাদের গল্পগুলি শোনাতে পারতেন।

চতুরঙ্গ থেকে (১৩৭১ কার্তিক সংখ্যা) পুনর্মুদ্রণ

তাঁর নিপীড়িত মানুষের প্রতি টান বা ভালবাসাও নেই

রামপ্রসাদ সেন

A House for Mr. Biswas –এর লেখক ভি. এস. নায়পল প্রায় দু'বছর আগে এ দেশে আসেন। তাঁর পিতামহের জন্মভূমিতে প্রায় এক বৎসর বাসের অভিজ্ঞতার ফল An Area of Darkness. বইটি নিয়ে এ দেশেও বিদেশে যথেষ্ট আলোড়ন হয়েছে। এর কারণ বর্তমান ভারতের সামগ্রিক রূপ নিয়ে এই ধরনের সুলিখিত বই অনেকদিন বেরোয়নি। তা ছাড়া বইয়ের নাম থেকেই বোঝা শক্ত নয় যে লেখকের বক্তব্য নিয়ে পাঠকদের একমত হওয়া শক্ত।

বইটিকে লেখক 'An Experience of India' বলেছেন। 'Experience' কথাটার একটা তাৎপর্য আছে যা বাংলা 'অভিজ্ঞতা' দিয়ে ঠিক প্রকাশ করা যায় না। এ দেশে আসার আগে থেকেই নায়পল যেন বুঝেছিলেন যে ভারতের যে অস্পষ্ট, তমসাবৃত চেহারা ত্রিনিদাদে তাঁর বাল্যকালকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, চাক্ষুষ পরিচয়ে সেই দেশের চেহারাটা তাঁর কাছে খুব সুন্দর মনে হবে না। এই ধারণাটা ভেবে দেখলে খুব অমূলক নয়। লেখক নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন তাঁর কোনও দেশ নেই, জাত নেই, তিনি নিরীশ্বর ও পুরোপুরি ব্যক্তিত্ববাদী। এহেন লোকের সঙ্গে সনাতন ভারতের মোলাকাৎ যে সংঘর্ষে পরিণত হবে তা আর আশ্চর্য কি।

জাহাজ ছেড়ে বোম্বাইয়ে পদার্পণ করেই নায়পল এক অভূতপূর্ব ক্লেশ বোধ করলেন। তাঁর মনে হল নগরীর জনস্রোতের মধ্যে তাঁর সত্তা লোপ পেয়ে গেছে, তিনি জনমণ্ডলীর সঙ্গে একাকার হয়ে গেছেন। 'একাকার' কথাটা এখানে মূলগত অর্থে ব্যবহার করা হল। কারণ ত্রিনিদাদ বা বিলেতের জনগণের সঙ্গে লেখকের অন্তত শারীরিক স্বতন্ত্রতা ছিল। বোম্বাইয়ে তাও খোয়া গেল।

তারপর ভারত-পরিক্রমা শুরু হল এবং নায়পল প্রতিপদেই ক্লান্ত ও পীড়িত বোধ করতে লাগলেন। প্রথমত তিনি গরম ও ধুলোয় ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। দ্বিতীয়ত সারা দেশটাকে তাঁর একটা বিরাট আস্তাকুঁড় বলে মনে হল। আস্তাকুঁড় কথাটা বেশ মোলায়েম। নায়পল বলেছেন 'India is like one v.ist 'atrine' পাতার পর পাতা ধরে তিনি জনবহুল শহরের রাজপথে আর মাঠে ঘাটে, রেল লাইনের ধারে আর নদীর পারে, সমুদ্রের কূলে আর পাহাড়ের গায়ে ভারতীয়দের মলমূত্রত্যাগের বর্ণনা করেছেন। যা দেখে নায়পল সবচেয়ে ক্লিষ্ট হয়েছেন তা হল দেশের মানুষের ও সমাজের চেহারা। শাসক-গোষ্ঠীর মূলধন হল কথার বেসাতি কারণ কাজের দিক থেকে তাঁরা দেওয়ানা। আমরা মুখে বড় বড় কথা বলি, কথায় কথায় ভারতের আত্মা ও পারমার্থিক শক্তির দোহাই দিই অথচ কার্যত আমরা অর্থলোলুপ ও নিষ্ঠুর। শঠতা, ভণ্ডামি ও আদর্শহীনতা আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে রন্ধ্রগত হয়ে গেছে। নায়পল ভারতীয় চরিত্রের এই রূপ দেখে মর্মাহত হয়েছেন। তিনি তাঁর বইয়ে রাজনীতি বা অর্থনীতির হেরফের নিয়ে আলোচনা করেননি। পাঁচশালা পরিকল্পনায় কত ইস্পাত তৈরি হল বা কত বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হল, কত লক্ষ একর জমিতে চাষের জল এল বা কত কোটি হন্দর সার জমিতে ছড়ানো হল, নেহরুর পরে কে দিল্লীশ্বর হবেন বা ভারতীয় গণতন্ত্র কোন পথে এ সব নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেননি। তিনি মুখ্যত মানুষ হিসাবে ভারতীয়রা কেমন এবং যে সব ঐতিহাসিক কারণ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের চিরকাল প্রভাবান্বিত করেছেও এখনও করছে সেই জিনিসগুলিকে নিজের বুদ্ধিমত বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন।

নায়পলের মতে আমাদের জাতীয় চরিত্রের অবনতির একটি মূল কারণ আমাদের জাতিভেদ প্রথা। এই প্রসঙ্গে নায়পল বলেছেন : Cast imprisons a man in his function. It leads to callousess, inefficiency and a hopelessly divided country, division to weakness, weakness to foreign rule. জাতিভেদ প্রথা আবহমান কাল ধরে আমাদের ইতিহাসকে প্রভাবান্বিত করেছে। জাতিভেদের ফলে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়ে আমরা বিদেশি আক্রমণকারীদের দ্বারা পরাভূত হয়েছি। এই প্রথাই আমাদের দেশকে world's largest slum করে তুলেছে। আমাদের মন থেকে মানুষের সেবার কথা মুছে দিয়েছে, শ্রমবিমুখতাকে আমাদের মজ্জাগত করেছে। লোকের জন্য দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার কথা আমরা ভাবতে পারি না। জলে লোককে ডুবতে দেখলে আমরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখি। দেশে যখন জীবন মরণ সমস্যা দেখা দেয় আমরা তখন ওজস্বিনী ভাষায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা করি আর সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয়।

এই জাতিভেদ প্রথার পটভূমিতে নায়পল মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও কর্মের আলোচনা করে তার আসল তাৎপর্য বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। আমরা অনেকেই সামাজিক ব্যাপারে গান্ধীজিকে পুরাতনপন্থী বলে মনে করি। কিন্তু জাতিভেদের কুফল মনে রাখলে আমরা বুঝতে পারবো মহাত্মা গান্ধী কেন বার বার আমাদের নোংরামির কথা উল্লেখ করেছেন, কেন বলেছেন স্বহস্তে শৌচাগার পরিষ্কার করা শুচিতার পরিচায়ক, কেন বলেছেন মানুষের সেবা সবচেয়ে বড় ধর্ম, কেন বলেছেন খেটে খাওয়ার মতন সম্মানজনক কাজ নেই। এইভাবে বিচার করলে আমরা বুঝব যে এগুলি বাতিকগ্রস্ত লোকের কথা নয়, এ জাতি-প্রথার মূলে কুঠারাঘাতের চেষ্টা। কিন্তু স্বাধীন ভারতে আমরা তাঁকে অবতার বলে পূজা করি, তাঁর শিক্ষা নিইনি। নায়পলের ভাষায় : India undid him. He became a Mahatma. His message became irrelevant.

খুব কম কথায় এই হল An Area of Darkness -এর মোটামুটি বক্তব্য। নায়পলের কড়া সমালোচনা আমরা অনেকে বরদাস্ত করতে পারিনি। অনেকেই বইটি পড়ে বা না পড়ে এটিকে Mother India বা Verdict on India -র সমগোত্রীয় করতে চেষ্টা করেছেন। একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে এটা ঠিক নয়। নায়পলের বলবার কায়দাটা অবশ্যই নতুন। অতিশয়োক্তি ও সংযম বাদ দিলে নায়পল কিন্তু আমাদের যে সব মোটা মোটা দোষত্রুটি দেখিয়েছেন ইতিপূর্বে এ দেশের ও বিদেশের অনেকেই সেগুলির বহুবার উল্লেখ করেছেন। সেই সব মহাজনদের পদাঙ্কানুসরণ করে নায়পল বন্ধুর কাজ করেছেন। মাঝে মাঝে এই রকম ঘা না খেলে আত্মতুষ্টিরতা ও আত্মতৃপ্তি আমাদের পেয়ে বসবে। আমাদের আর শুধরোবার পথ থাকবে না।

নায়পল আমাদের 'গাল' দিয়েছেন বলে তাঁকে দোষ দেওয়া সুবিচার হবে না। বইটির আসল গলদ অন্যত্র। সেটা হল নায়পলের একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি। অনেকটা অন্ধের হাতির পা দেখে হাতির চেহারাটাকে থামের মতন ভাবার মত। বইটা যাঁরা মন দিয়ে পড়বেন তাঁরা দেখবেন যে লেখক আমাদের জীবনের কয়েকটা দিক বেছে নিয়ে সেইগুলিই সব ও সেইগুলিই সত্য বলে ধরে নিয়েছেন। খুব স্থূলভাবে বলতে গেলে বলা যায় এ যেন খানিকটা মার্কিন দেশকে মগের মুলুক বলে বাতিল করে দেবার মতন। তা ছাড়া একটা দেশকে বুঝতে হলে এক বছর যথেষ্ট কিনা সেটা তর্কসাপেক্ষ। আর আজকের দিনে যখন আমরা সামাজিক ও অর্থনীতিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আমাদের সব চেয়ে বড় পাপ দারিদ্র ও অজ্ঞানতা দূর করার চেষ্টা করছি তখন সেইগুলি বাদ দিয়ে সমাজ ও মানুষের চেহারার বোধহয় সঠিক বিচারও সম্ভব নয়। এই একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই নায়পল তাঁর বর্ষ-ব্যাপি ভারত-পরিক্রমায় এমন কিছু দেখলেন না যা তাঁর মনে আশার সঞ্চার করতে পেরেছে, এমন একজন লোক পেলেন না যে মনুষ্যপদবাচ্য। অন্তত তাঁর বইয়ে চিত্রিত ননরানীর বর্ণনা পড়ে তাই মনে হয়।

নায়পল বহুবার বলেছেন যে আমাদের বড় দোষ যে আমরা কোনও জিনিসকে ইতিহাসের ধারা হিসাবে দেখতে পারি না। এই প্রসঙ্গে কেউ যদি লেখককে 'আপনার মুখ আপনি দেখ' বলেন তা হলে খুব অন্যায় হবে না। নায়পলের ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আমাদের ইতিহাস অসুন্দর, আমাদের বর্তমান অসুন্দর, আমাদের ভবিষ্যৎ তমসাবৃত। তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টির একটি নমুনা হল যে তিনি খুব ঠাট্টার ভাব না নিয়ে বলেছেন যে পঞ্চায়তি রাজের আওতায় হয়ত অদূর ভবিষ্যতে ন্যায় বিচারের নামে গ্রামে গ্রামে লোকেদের নাক-কাটা সুরু হয়ে যাবে কারণ আমাদের গৌরবময় অতীতে এই জাতীয় শারীরিক দণ্ডের নজির আছে। নায়পল অনেক মন্তব্য এই ধরনের ঐতিহাসিক পারম্পর্য ও যুক্তির ওপর খাড়া করেছেন। এই ধরনের যুক্তির দোহাই দিয়ে বলা যেতে পারে যে লেখকের বর্তমান বাসভূমি বিলেতে ভবিষ্যতে হয়ত লোককে চুরির অপরাধে ফাঁসিকাঠে চড়ানো হবে কারণ সেখানে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, এমনকি উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও, লোককে সামান্য চুরির অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

নায়পলের লেখা ঝকঝকে, তাঁর বর্ণনাশক্তি অসাধারণ, তাঁর দেখবার চোখ তীক্ষ্ণ। একদল লোক সেইজন্য নায়পলের বইটির নির্জলা প্রশংসা করেছেন। তাঁদের কথা হল যে সাহিত্যিকের প্রথম কর্তব্য লেখা সুখপাঠ্য ও সরস করা, বক্তব্য তাঁর কাছে সব সময়ে বড় কথা নয়। কিন্তু এই যুক্তি An Area of Darkness -এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে খুব পাকা কাজ হবে না। কারণ এই বই শুধু সাহিত্য বা ভ্রমণ কাহিনী নয়, এতে একটা দেশের ও জাতির চরিত্রও বিচার করা হয়েছে। নায়পল যা বলেছেন তা ভেবে চিন্তে বলেছেন, এবং তাঁর আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা অন্যায়। তা ছাড়া সব ভাল লেখকদের মতো নায়পলের লেখার মধ্যে তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বও প্রকাশ পেয়েছে। প্রশ্ন হল যে সেই ব্যক্তিত্বটা কি রকম। সত্যের খাতিরে বলতে হয় তা খুব চিত্তগ্রাহী নয়। আমরা আগেই দেখেছি নায়পল তাঁর নিজের সম্বন্ধে বলেছেন তাঁর দেবদ্বিজে ভক্তি নেই। বই পড়ার পর মনে হয় যে এ ছাড়া তাঁর নিপীড়িত মানুষের প্রতি টান বা ভালবাসাও নেই। সেই জন্যই বইটির লিপিচাতুর্য ও সাহিত্যিক প্রসাদগুণ সত্ত্বেও মনে হয় এর কোথায় যেন একটা বড় ফাঁকি রয়ে গেছে।

An Area of Darkness — V. S. Naipaul /Andre Deutsch London / $25.

অপ্রকাশিত চিঠি

শম্ভু মিত্রের একটি চিঠি ও কিছু কথা

বিষ্ণু বসু

'দশচক্র' নবপর্যায়ে মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৯৬২-র ২৮ শে অক্টোবর। 'বহুরূপী' এ নাটকের প্রথম প্রযোজনা করেছিলেন এর দশ বছর আগে, ১৯৫২-র ১লা জুন। তখন এ নাটকটি আমার দেখা হয়নি। তখন 'বহুরূপী'-র নামও বোধহয় আমার জানা ছিল না। বহুরূপীর প্রথম প্রযোজনা আমি দেখেছিলাম ১৯৫৪-র কোনও একটি সকালে, নিউ এম্পায়ার মঞ্চের ব্যালকনিতে বসে। নাটক 'রক্তকরবী'। দেখে স্তম্ভিত ও নন্দিত হয়েছিলাম। এর আগে কলকাতার মঞ্চে সামান্য কিছু নাটক দেখেছি, নিয়মিত থিয়েটার দেখার সুযোগ তখন পেতাম না। তা ছাড়া তার মাত্র তিন চার বছর আগে কলকাতায় এসে পৌঁছেছি, কাণ্ড বাঙাল, এখানকার হালহকিকত তেমন রপ্ত হয়নি তখনও। তাই পরিকল্পনাহীনভাবে সুযোগসুবিধা মতো নাটক দেখি। তা ছাড়া থাকতাম বেহালায়, উত্তর কলকাতার থিয়েটারের নাগালের অনেক বাইরে। পয়সার অভাব তো ছিলই। আমার এক বন্ধু, কনকভূষণ রায় ছিল নাটক পাগল। সে তখন চাকরি করে। তাই তার সঙ্গী হয়ে ক্রমে নাটক দেখার পালা বাড়তে থাকে। কনকেরই সঙ্গে দেখেছিলাম 'রক্তকরবী'। চেতনার মধ্যে যেন একটা ওলটপালট হয়ে গেল। যেমন হয়েছিল পরের বছর 'পথের পাঁচালী' দেখে। তখন তেমন ভাবিনি, এখন মনে হয়। দেশভাগের আঘাত ও বিপর্যয় সামলে অনেক অসম্পূর্ণতার মধ্যেও বাঙালির সৃষ্টিজগতে একটা বিশেষ পালাবদল ঘটেছিল গত শতকের পাঁচের দশকে। সাহিত্যে শিল্পে থিয়েটারে সিনেমায় যেন যুগান্তর ঘটে গিয়েছিল। তারই প্রথম অভিঘাত অন্তত ব্যক্তিগতভাবে, অনুভব করেছিলাম 'রক্তকরবী' দেখে। তখন সাম্মানিক বাংলার ছাত্র, পড়ানো হয় 'মুক্তধারা'। বিখ্যাত এক নাট্যতাত্ত্বিক 'মুক্তধারা' ও রবীন্দ্রনাটক সম্পর্কে যে ধারণা শ্রেণীকক্ষে আমাদের পৌঁছে দিতেন তা মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না। তাঁর অনেক কথার মধ্যে একটি বিশেষ প্রতিপাদ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের এ নাটকগুলি হল 'সাংকেতিক' নাটক এবং এদের অভিনয়যোগ্যতা নেই। আশ্চর্য লাগত। পড়তে এত ভাল লাগে অথচ তাদের মঞ্চস্থ করা যায় না। অন্য যে সব নাটক পাঠ্য, গিরিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক নিয়ে কত উচ্ছ্বাস। তাদের অভিনয় নিয়ে নানা প্রশংসাসূচক বাক্য বেশ ধন্দে ফেলে দিত। আমাদের তরুণ মনে 'শারদোৎসব' থেকে 'কালের যাত্রা' পর্যন্ত নাট্যপ্রবাহ অন্য মাত্রা নিয়ে আসছে অথচ তাদের মঞ্চস্থ করা যায় না! গিরিশচন্দ্র ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটককার। রবীন্দ্রনাথ নন? মঞ্চস্থ না হলে আবার নাটক কি! আমাদের অধ্যাপক একবারও বলেননি রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন নিজের নাটক প্রযোজনা করে গেছেন। 'রক্তকরবী' না হয় নিজে মঞ্চস্থ করেননি। কিন্তু শারদোৎসব, রাজা, অচলায়তন ডাকঘর, ফাল্গুনী প্রভৃতি নাটক সার্থকভাবে বারবার মঞ্চস্থ করেছেন। 'ডাকঘর' প্রযোজনা তো ইতিহাস তৈরি করেছিল। সে বিষয়ে শ্রেণীকক্ষে একটা কথাও খরচ করা হয়নি। তাই যখন 'রক্তকরবী' দেখলাম ১৯৫৪-তে তার অভিঘাত আজ প্রায় অর্ধশতাব্দী পরেও ভাবতে গেলে শিহরিত হয়ে উঠি। নাটক দেখার প্রতি আগ্রহ আরও বেড়ে যেতে থাকে। মূলত বন্ধু কনকের সহযোগিতাতেই নাটক দেখা (সেই সঙ্গে সিনেমাও) চলতে থাকে। কনক প্রয়াত হয়েছে চোদ্দ বছর হল। থিয়েটারের প্রতি আমার আগ্রহ কনকই বাড়িয়ে দিয়েছিল দারুণভাবে।

যাই হোক, 'রক্তকরবী'র পর দেখলাম পরের বছর গুলোতে 'ডাকঘর' (১৯৫৭), পুতুল খেলা (১৯৫৮), কাঞ্চনরঙ্গ (১৯৬২) এবং 'দশচক্র' নবপর্যায় (১৯৬২) প্রভৃতি প্রযোজনা। ইতিমধ্যে মিনার্ভা থিয়েটারে এসে গেছে উৎপল দত্তের পি.এল.টি/এল.টি.জি। এসেছে নান্দীকার, রূপকার এবং আরও অজস্র দীপ্তিমান নাট্যদল। সাহিত্য সিনেমা থিয়েটার নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা চলছে। আমরা আলোকিত হচ্ছি। ১৯৬২ এল।

ইতিমধ্যে জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। ভারতের রাজনীতিতে পালাবদল ঘটছে। নানা আন্দোলনে কলকাতা উত্তাল হয়ে উঠছে। ১৯৬২-র অক্টোবরে হঠাৎ শুরু হল চিন-ভারত সংঘর্ষ। এখন অবশ্য অনেকটাই জানা কেন চিন-ভারত সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল কোন কোন কারণে। তখন এটা 'আকস্মিক' বলেই মনে হয়েছিল।

এ পটভূমিতে 'দশচক্র' নতুন করে বিতর্ক নিয়ে এল। এ নাটক যখন প্রথম প্রযোজিত হয়েছিল নরওয়েতে, নাটককার ইবসেনকেও বিতর্ক ছাড়েনি। প্রশ্ন উঠেছিল এ নাটক তিনি লিখেছেন কেন? 'জনবিরোধী' ভূমিকা কোনও আছে কি এ নাটকের আড়ালে।

প্রায় আশি বছর বাদে কলকাতায় আবার এ প্রশ্ন চলে এল সামনে। তবে একটু অন্য ভাবে। এবারে প্রশ্নের লক্ষ্য 'বহুরূপী' সম্প্রদায় ও শম্ভু মিত্র। তখনকার পত্রপত্রিকায় তার পরিচয় পাওয়া যাবে এখনও, একটু খুঁজলেই।

তবে এবার একটু অন্য মাত্রা বোধহয় যুক্ত হয়েছিল চিন ভারত সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে। এ কথা সকলেরই জানা শম্ভু মিত্র ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঐতিহাসিক 'নবান্ন' প্রযোজনার অন্যতম নির্মাণকর্তা ছিলেন তিনিও। তারপর মতাদর্শগত অমিলের জন্য গণনাট্য সংঘের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং গড়ে তোলেন নিজস্ব নাট্যসম্প্রদায় 'বহুরূপী' ১৯৪৮-এ। গণনাট্য সংঘের সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্গত আত্মীয়তা ছিল। তাই 'বহুরূপী' সৃষ্টি কমিউনিস্ট পার্টি খুব একটা ভালভাবে মেনে নেয়নি। তবে তেমন বিরোধ ঘটেনি। কিন্তু ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে এসে গিয়েছিল কিছু বিভ্রান্তি। ১৯৪৫-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার অবিসংবাদিত নেতৃত্ব খানিক বিচলিত হল ১৯৫৩-র মার্চে জোসেফ স্তালিনের প্রয়াণে। ১৯৫৬-তে বিশে পার্টি কংগ্রেসে নিকিতা ক্রুশ্চেভ যে দলিল পেশ করেছিলেন তার অভিঘাতে আন্তর্জাতিক আন্দোলনে বিভ্রান্তি শুরু হল। তার আঁচ স্বাভাবিকভাবেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতেও এসে লাগল। ক্রমে পার্টির মধ্যে মতাদর্শগতভাবে একটি বিভাজনরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠল। তবু তখনও পার্টি ভাঙেনি। কিন্তু চিনভারত সংঘর্ষ তাকে অনিবার্য করে তুলল। তখন থেকেই পার্টির এক অংশ রুশপন্থী এবং অন্য অংশ চিনপন্থী বলে চিহ্নিত হল। ভারতে জরুরি অবস্থা জারি হল এবং কম্যুনিস্টদের মধ্যে যারা চিনপন্থী বলে অভিহিত হলেন তাঁদের গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হল। দেশপ্রেমের বন্যা বয়ে গেল। প্রথিতযশা বেশ কিছু লেখক শিল্পীর স্বাধীনতা নিয়ে 'দেশ' সাপ্তাহিকে প্রভূত 'দেশপ্রেম' প্রকাশ করলেন।

এ ক্রান্তিকালে 'দশচক্র'-নবপর্যায়ের প্রযোজনা উঠে এল বিতর্কের মধ্যে। চিনভারত সংঘর্ষের কিছুদিন আগে এ নাটক মঞ্চস্থ হলেও টেনে তোলা হল কিছু প্রশ্ন। এ নাটকের মঞ্চস্থ করার অন্তরালে আছে নাকি কোনও গূঢ় অভিপ্রায়? শম্ভু বাবু কোন দলে? বামপন্থী না বামবিরোধী? কেউ কেউ 'দশচক্র' নাটকে আবিষ্কার করলেন চরম প্রতিক্রিয়াশীলতা।

আমি তখন ভারতের গণনাট্য সংঘের একটি শাখার সঙ্গে সামান্য যুক্ত ছিলাম। আমাদের শাখা থেকে মাত্র এক বছর আগেই অর্থাৎ রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে প্রযোজিত হয়েছে 'রক্তকরবী' মূলত শম্ভু মিত্রের প্রয়োগপরিকল্পনাকে অনুসরণ করে। নির্দেশক ছিলেন দিলীপ ঘোষাল। 'দশচক্র' দেখে দারুণ ভাল লেগেছে। অন্য সকলের সঙ্গে পূর্ণেন্দু গুহ আমাকে অধিকার করে রেখেছেন। তাই এ সব বিতর্ক, যা কিছু ছাপা হচ্ছে এবং কিছু হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে, তেমন মেনে নিতে পারছিনা। বিপুল বিরোধিতার কারণে গণনাট্য সংঘের কাজও প্রায় বন্ধ। সভ্যরা আক্রান্ত হচ্ছেন ইতস্তত। সব সত্ত্বেও শম্ভু মিত্রের প্রতি শ্রদ্ধায় মন আরও আচ্ছন্ন হয়ে উঠছে।

ইতিমধ্যে এ ডামাডোলের ফাঁকে কেটে গেছে বছর খানেক। চিন তো একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে সরে গেছে সীমান্তের ওপারে। কিন্তু এ দেশে তার আলোড়ন বিন্দুমাত্র কমেনি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয়ে যেতে বসেছে। তবু থিয়েটার প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

এ পরিস্থিতিতে শম্ভু মিত্রকে একটি চিঠি লিখে ফেললাম ১৯৬৪-র গোড়ায়। তাঁর থিয়েটারকর্মের প্রতি অকৃত্ত শ্রদ্ধা ও সমর্থন জানিয়ে। কী লিখেছিলাম ভাল মনে নেই এত বছর পরে। কেননা তখন তো জানি না শম্ভু মিত্র নিতান্ত অজানা অচেনা অনুরাগীর চিঠির এমন একটি অসামান্য জবাব দেবেন।

এপ্রিলের গোড়ায় পেলাম শম্ভু মিত্রের চিঠি। তারিখ দেওয়া ৩১ শে মার্চ ১৯৬৪।

এ চিঠিতে শম্ভু মিত্র এমন অনেক কথা লিখেছিলেন যেগুলো বাংলা নাট্য অনুরাগীদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হতে পারে এখনও। চিঠি লেখার আটত্রিশ বছর পরেও। শম্ভু মিত্রও প্রায়ত হয়েছেন পাঁচ বছর হয়ে গেল। তিনি বেঁচে থাকতেই বেশ কিছু লেখা বা সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গত এ চিঠির কথা লিখেছি। অনেকেই চিঠিটি প্রকাশ করার আগ্রহ দেখিয়েছেন। রাজি হইনি। ভেবেছি যা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে লেখা তা প্রকাশ করা উচিত হবেনা। কিন্তুদিন আগে চিঠিটা আবার পড়ে মনে হল এ কথাগুলো চিরকালের মতো আড়ালে থেকে যাওয়া ঠিক হবে না। এ চিঠি যখন লেখেন শম্ভু মিত্রের বয়স ঠিক পঞ্চাশ। তিনি তখন সৃজনক্ষমতার শিখরে। তখনও জানা নেই তিনি বহুরূপী ছেড়ে যাবেন মাত্র বছর সাতেকের মধ্যে। নিজের সাধ ও সাধ্য, নাট্য আন্দোলনের সার্থকতা ও ব্যর্থতা নিয়ে আনন্দ বেদনা এ চিঠিতে অকপটভাবে ধরা পড়েছে। এখানে নাট্যোৎসবে যে দুটি নাটকের কথা বলা হয়েছে তা হল (১) রাজা ওয়াদিপাউস এবং (২) রাজা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এ দুটি নাটক শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল যথাক্রমে ১৯৬৪-র ১২ই ও ১৩ই জুন। দুটি

নাটকেই প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন শম্ভু মিত্র। প্রথম দিনের দুটি প্রযোজনাই দেখেছিলাম নিউ এম্পায়ারে। সে অভিজ্ঞতার কথা ভোলা যায় না।

'রাজা ওয়েদিপাউস' নিয়েও তখন বেশ আপত্তি উঠেছিল। বিষয়বস্তুর মধ্যে কেউ কেউ পেয়েছিলেন অশ্লীলতা। অবাক হয়েছিলাম। একটি নাটক টিকে আছে দু'হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে, তার মধ্যে হঠাৎ 'এমন' আবিষ্কার সহজ রসগ্রাহিতার ব্যাপার নয়। এ নাটক নিয়ে তখন 'গন্ধর্ব' পত্রিকায় একটি আলোচনা করেছিলাম। আমাদের কোনও কোনও বামপন্থী বন্ধুর শিল্প ও সাহিত্যবিষয়ক মতামত মাঝে মাঝেই ভন্ডিত করে দেয়। সম্প্রতি এ রকমই একটি কাণ্ড ঘটেছে পাবলো পিকাসোর একটি নাটকের অনুবাদ নিয়ে। পিকাসোর 'ডিজায়ার কট বাই দ্য টেইল' নাটকটি নিয়ে আপত্তি তুলেছেন কোনও কোনও বন্ধু। অনুবাদের দুর্বলতার জন্য নয়। পিকাসোর প্রকাশভঙ্গি তাঁদের ভাল লাগেনি। অথচ এ নাটক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফরাসি প্রতিরোধবাহিনীর ডেরায় প্রযোজিত হয়েছিল। অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন স্বয়ং জাঁ পল সার্ত্রে, অলবেয়র কামু প্রভৃতি বুধজনেরা। 'রাজা ওয়েদিপাউস'-ও সারা পৃথিবীতে বারে বারে মঞ্চস্থ হয়েছে নানাভাবে। কী আর বলা যায়?

খুব সম্প্রতি আবার পড়লাম একজন শ্রদ্ধেয় বামপন্থী বুদ্ধিজীবী রাজা ওয়েদিপাউসকে অশ্লীল বলে চিহ্নিত করেছেন। এ নাটকের মূলকথা নাকি ভারতীয় আদর্শের পরিপন্থী। তা হলে কি ভারতীয় আদর্শ বলতে বুঝব এক রমণীর পাঁচ স্বামী, কুমারী অবস্থায় সন্তানলাভ, জলাশয়ে নগ্ন নারীদের দাঁড় করিয়ে রেখে লীলাখেলা করা প্রভৃতি বিষয়কে?

শম্ভু মিত্রের এ চিঠি নাট্যপ্রেমিকদের কাজে লাগবে বলেই মনে হয়। এ চিঠির জবাব দিয়েছিলাম এবং তারও উত্তর পেয়েছিলাম অত্যন্ত দ্রুত। দ্বিতীয় চিঠি হারিয়ে গেছে। আমারও আর চিঠি লেখা হয়ে ওঠেনি।

প্রসঙ্গত জানাই প্রয়োজনবোধে চিঠির সামান্য কিছু অংশ বর্জিত হয়েছে, নিতান্ত ব্যক্তিগত কারণেই।

৩১/৩/৬৪

সবিনয় নিবেদন,

আপনার চিঠি পেয়েছি, এবং পেয়ে খুব ভালো লেগেছে। আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমাদের প্রতিষ্ঠান নামবিহীনভাবে শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সালে। পরে ১৯৫০ সালে ১লা মে এর নামকরণ হয়। এবং তারপর থেকে এই তারিখটাই আমাদের জন্মদিন হিসাবে ধরা হয়। সেই বৎসরে আমরা প্রথম একটি নাট্যোৎসব করি। সেই উৎসবে 'পথিক' 'উলুখাগড়া' 'ছেঁড়া তার' নামে তিনটি নাটক আমরা অভিনয় করি। তারপর তখন থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে আমরা পূর্ণাঙ্গ নাটক করেছি আটটি, এবং একাঙ্ক ইত্যাদি করেছি সাতটি— অর্থাৎ একুনে পনেরোটি। এবং এরও পরে ১৯৬১ সালে আমরা দুটি নাটক করতে পেরেছি। কাঞ্চনরঙ্গ ও বিসর্জন। '৬২ সালে করেছি দশচক্র (নতুনভাবে)। কেবল '৬৩ সালে কোনো নাটক করা সম্ভব হয়নি। কারণ আমরা স্থির করেছি যে এইবৎসরের মে-জুন আন্দাজ আমরা আবার একটি নাট্যোৎসবের আয়োজন করবো। এবং তাতে অন্ততঃ দুটি নতুন নাটক অভিনয় করবো। আমাদের ইচ্ছে ছিল তিনটি নাটকের। তিনটি অঙ্ককারের নাটক। যে অন্ধকার মানুষের জীবনে আদিম ও অবোধ্য তারই সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন নাট্যকারের অনুভূতি প্রকাশ করে এমনি তিনটি নাটক। কিন্তু তার মধ্যে দুটি নাটক হস্তগত হয়েছে আর একটির এখনো খোঁজ পাচ্ছিনা।

আমাদের নাটক চয়নের পদ্ধতি— লোকে নেবে কি নেবে না—এই বিচারের ওপর নির্ভর করে না। এসব কথা আমরা জানতাম পেশাদারী মুখের কথা। কিন্তু আজকাল তথাকথিত নবনাট্য আন্দোলনকারীরাও একথা বলছেন শুনে আমরা খুবই দুঃখিত। এ সম্পর্কে বহুরূপী পত্রিকায় শ্রীগঙ্গাপদ বসু সম্পাদকীয়তে বেশ ভালো করেই লিখেছেন। (১৮শ সংখ্যা)

আমরা তো চাই যেসব নাটক জীবনের মৌল সমস্যাগুলো নিয়ে রচিত তাইই যেন আমরা করতে পাই। কিন্তু সে রকম নাটক তো পাইনা। আমাদের দুঃখের এবং অসুবিধার এটা একটা মস্তো কারণ।—আজকাল হাসির নাটকের নাকি অনেক বেশি বিক্রি। তাই নাটক প্রকাশকরা নাট্যকারদের কাছে হাসির নাটকেরই তাগাদা দেন বেশী। তাঁদের দোষ নেই কারণ নাট্য-লোকের চাহিদাই ওঁরকম। ফলে নাট্যকারদেরও দোষ নেই, তাঁদেরই বা সামান্য অর্থার্জন না করলে চলবে কেন?

তাহলে নাট্যসংস্কৃতি দাঁড়াবে কিসের ওপর? এ সম্পর্কে আনন্দবাজারের দোলসংখ্যায় আমি একটা লেখা লিখেছি। তাতে কাগজের সম্পর্কে যে সমালোচনাটুকু আছে সেটুকু স্বভাবতই তাঁদের ভালো লাগেনি, তাই তাঁরা একটা জবাব দিয়েছেন। হয়তো আরও কিছু কালিছিটোনো চলবে। কিন্তু আমার অভিযোগ যে সত্য তার প্রমাণ তাঁরা যেসব জায়গায় অন্যায় করেছেন সেগুলো উত্তর দেবার সময়ে একেবারে এড়িয়ে গেছেন। একথাও কি কোনো সাধারণ দৃষ্টির লোকের অজ্ঞাত যে যে কোনও ব্যবসায়িক চিত্রের নায়িকার ছবি যতো বড়ো করে ছাপা হয়, আধুনিক নাট্যপ্রচেষ্টার কোনো ছবি কি ততো বড় ক'রে ছাপা হয়?

যাই হোক খবরের কাগজের সঙ্গে তর্ক ক'রে কেউ কোনোদিন জিততে পারবে না। কিন্তু ঐ লেখাতে বাধাগুলো বর্ণনা করা আছে। সে বাধা কি ক'রে অপসারিত হবে?

আপনি আমাদের ইন্দানীং কেবলমাত্র 'দশচক্র'ও 'কাঞ্চনরস' করতে দেখেছেন, তার কারণ 'বিসর্জন' দেখতে লোক আসেনি। 'ডাকঘর' আমরা অনেক আগে অভিনয় করেছিলাম। কিন্তু সেটাও চলেনি, লোক আসেনি ব'লে। লাভ নয়, খালি খরচ তোলাটাই সমস্যা হয়েছিল। তাই সেগুলো সাধারণভাবে অভিনয় করা যায় না। আমাদের একটা নাট্য আছে 'চার অধ্যায়'। অনেকের কাছে শুনেছি যে তার উপস্থাপনা ও অভিনয় অসাধারণ। আমার নিজেরও সেটাকে এক আশ্চর্য রূপারোপ বলে মনে হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটা কখনো—যাকে বলে ভালো বিক্রি—তা দেয়নি।

তবু ১৬ বছর আগে আমরা অনেক কষ্টের মধ্যেই একাজ শুরু করেছিলাম। কারণ আমাদের ভরসা ছিল যে দেশের সৎ দর্শকসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়বে, এবং তাঁদেরই আগ্রহে আমরা আমাদের কাজ ক'রে যেতে পারবো। কিন্তু আমাদের অনুজ সম্প্রদায়গুলো ক্রমশই বুদ্ধির চেয়ে হৃদয়াবেগের ওপর বেশী ঝোঁক দিতে লাগলেন এবং ঐপথে অনিবার্যভাবেই ব্যবসায়িক মঞ্চের দার্শনিক দৃষ্টির কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন।

কিন্তু এতে সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি হচ্ছে এই যে, দর্শক যেটুকু প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল সেটুকুও এঁরা গুলিয়ে দিলেন। এ ক্ষতি একদিনে হয়নি, কয়েক বৎসর ধ'রে একটু একটু করে হয়েছে, এবং এটা সারতেও সময় লাগবে। অথচ এটা আমাদের পেশা নয়, একেবারেই একটা নেশা। আমাদের প্রত্যেককে অর্থোপার্জনের জন্যে বাইরে খাটতে হয় আর প্রত্যেকদিন বন্ধুদাপীতে এসে এখানকার কাজ করতে হয়। আমাদের মধ্যে অনেকেই বন্ধুদাপীর কাজে বেশি মন দিয়েছে বলে চাকরীর উন্নতি খুইয়েছে। আমরা সামাজিকতা করে উঠতে পারিনা, নিজেদের সংসারের দিকে ভালো করে দেখতে পারি না, নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনোরকম ব্যবস্থা করবার অবকাশ পাই না। এই যে কতকগুলো লোক কৈশোর থেকে প্রায় প্রৌঢ়ত্বের কাছে এসে পৌঁছে গেল কেবল একটা কাজকে অজস্র বাধার মধ্যে দিয়ে পালন করবে বলে তাদের সততার কী দাম দিল এই দেশ?

রাশিয়াতে মস্কো আর্ট থিয়েটার স্থাপন করতে টাকা দেবার মতো লোক ছিল। সেখানে তাঁরা নেশায় ও পেশায় এক করতে পেরেছিলেন। কিন্তু আমরা অনেকদিন আগে একটা কথা তুলেছিলাম যে একহাজার সংখ্যা লোক যদি মাসে দশ টাকা করে একবছর চাঁদা দেয় তাহলে এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা উঠতে পারে। এবং তাতে আমরা এক নতুন মঞ্চ তৈরীর কাজ শুরু করে দিতে পারি, যেখানে একটা আর্ট থিয়েটারের—একটা intellectual theatre এর ভিত্তিস্থাপন করা যেতে পারে। মাত্র হাজারটা লোক। কিন্তু কেউ সে কথাটা নিয়ে এগিয়ে এসে প্রচার করেননি। শক্তিমান লোকেরা কেউ সাহায্যই করেননি। — তাই আমাদের অবস্থা আর মস্কো আর্ট থিয়েটারের অবস্থা এক হোল না। আমরা বাঙালীই রইলাম।

এসব ঘটনায় আমরা অনেকবার অনেকরকম করে বিচলিত হয়েছি। অনেক ভাবতে হয়েছে আমাদের, অনেক আলোচনাও হয়েছে। শেষপর্যন্ত আমরা স্থির করেছি যে আমরা আর গুটিকয়েক মাত্র নাটক করবার চেষ্টা করবো, তারপরে কাগজে নোটিস্ দিয়ে উঠে যাবো। আমাদের অনেকের তো বয়স হয়ে গেল। এইবার অল্পবয়সীদের ভার। তারা যেমন ইচ্ছে করে দেশের নাটমঞ্চকে তেমনি তৈরী করবে। ভালই হোক আর মন্দই হোক। The nation will be known by its art. —

আপনার চিঠি পড়ে ভালো লেগেছিল বলেই এতোকথা লিখলাম। এরকম এক একটা লোকের সংবাদ যখন পাই তখনি মনে একটা ভরসা আসে যে সব কিছুই কখনো হারিয়ে যায় না। কিছুটা থেকেই যায়। আমাদের এতো ভালোবাসার কিছুটা ফল নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও থেকেই যাবে।

নমস্কার জানবেন।

ইতি

শম্ভু মিত্র

শ্রী বিষ্ণু বসু

আড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা।

জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য

ঐতিহাসিক সৈয়দ হাসান আসকারি (১৯০১-১৯৯০)

সোমনাথ রায়

পশ্চিমবঙ্গে সৈয়দ হাসান আসকারি তেমন পরিচিত নন, কিন্তু হিন্দি ও উর্দু বলয়ে অর্থাৎ সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁর প্রতিষ্ঠা অসামান্য। শুধু ঐতিহাসিক ও সমালোচক হিসাবে নয়, নির্ভীক, স্পষ্টবাদী ও উন্নতশির বুদ্ধিজীবী রূপে তিনি এক কিংবদন্তি পুরুষে পরিণত হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ তথা বাংলাদেশে তিনি একেবারে অপরিচিত বললে অবশ্য সত্যের অপলাপ হবে। যাঁরা মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেন, আসকারি সাহেবের রচনাবলি পাঠ না করে তাঁদের উপায় নেই। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর "সুলতানী আমলের বাংলা"য় আসকারি সাহেবকে "জ্ঞানতপস্বী" ও মধ্যকালীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক বলে বর্ণনা করেছেন।

আসকারি সাহেবের পূর্ব পুরুষরা ইরান থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা বিহারের ছাপরা জেলার কুকোয়ায় এসে বসতি স্থাপন করেন। ১৯০১ সালে সেখানেই আসকারি সাহেবের জন্ম। ১৯১৮ সালে ছাপরা জেলা স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। স্মরণ করা যেতে পারে কয়েক বছর আগে এই স্কুল থেকেই ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। সেই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধি বিহার ও উড়িশা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু আসকারি সাহেব যে বছর ম্যাট্রিক্স পরীক্ষার্থী ছিলেন, তখন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়ে গেছে। বিহার ও উড়িশা ও বাংলা প্রেসিডেন্সি থেকে আলাদা হয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হয়েছে। মজফ্‌ফরপুর কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে তিনি পাটনা কলেজে এম. এ (ইতিহাস) পড়তে আসেন। পাটনা কলেজে তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন যদুনাথ সরকার, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, সুবিমলচন্দ্র সরকার, ওয়াই. জে. তারাপোরওয়ালা প্রভৃতি। কথা প্রসঙ্গে একদিন এই প্রাবন্ধিককে বলেছিলেন, "এম. এ ক্লাসে আমরা ন'জন ছাত্র ছিলাম। পরীক্ষায় বসেছিলাম ছ'জন, এবং শেষ পর্যন্ত পাশ করেছিলাম মাত্র তিনজন।" ১৯২৭ সালে পাটনা কলেজে তিনি ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। এই কলেজে তাঁর সহকর্মী হিসাবে পেয়েছিলেন কালিকিঙ্কর দত্ত ও জগদীশনারায়ণ সরকারকে। এই ত্রয়ী আজীবন পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। পরবর্তী ছয় দশক অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গবেষণাও করে গেছেন। একদিনের জন্যও তাঁর গবেষণায় ছেদ পড়েনি। আসকারি সাহেব আরবি ও ফার্সি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। বিহারের গ্রামে গ্রামে দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে তিনি অনেক দুষ্প্রাপ্য পুঁথি উদ্ধার করেছেন। ফার্সি ভাষায় রচিত অনেক উৎকীর্ণ-লিপির (inscription) তিনি পাঠোদ্ধার করেছেন। ওয়াহাবি আন্দোলনের ঐতিহাসিক ড. কেয়ামুদ্দিন আহমদ লিখেছেন, 'কোনও এক গ্রামের পুরানো এক কুঁয়ার দেওয়ালে একটি উৎকীর্ণলিপি (inscription) রয়েছে খবর পাওয়া গেল। সেই গ্রামের কারও বাড়ি থেকে একটি চেয়ার আনা হল। চেয়ারটি পুরানো এবং নড়বড়ে। আসকারি সাহেব সেই চেয়ারে উপবেশন করলেন এবং তাঁরই নির্দেশে চেয়ারে দড়ি বেঁধে তাঁকে কুয়োতে নামিয়ে দেওয়া হল। তিনি সেই inscription এর পাঠোদ্ধার করলেন। দড়ি ছিঁড়ে যেতে পারত। চেয়ারও ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। সেই সব চিন্তা আসকারি সাহেবের ছিল না। মধ্যযুগের বাংলার শিলালেখ ও উৎকীর্ণলিপি সম্পর্কে ব্লকম্যান (Blochmann) যে ধরনের গবেষণা করেছেন আসকারিও মধ্যকালীন বিহারের লিপিসমূহ বিষয়ে সেই কাজ করেছেন। বরং বলা যায় আসকারি সাহেবের গবেষণাও ব্যাখ্যা অধিকতর পরিশ্রম ও মৌলিকত্বের পরিচয় দেয়।'

একাধিক ফার্সি পাণ্ডুলিপি তিনি সম্পাদনাসহ ইংরাজিতে অনুবাদ করেছেন। অন্তত দশটি গবেষণা-প্রবন্ধ ইতিহাসের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। মাতৃভাষা উর্দুতেও বহু মননধর্মী প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রাবন্ধিক হিসাবে উর্দু সাহিত্যেও তিনি স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। প্রধানত সুফি মতবাদ (Sufism) সম্পর্কেই তিনি অধিক গবেষণা করেছেন। সুফি সন্তদের বক্তব্য (মালফুজাত) ও পত্রাবলির (মক্‌তুবাৎ) তিনি আলোচনা ও ব্যাখ্যা করেছেন। অস্ট্রেলিয় মিশনারি রে পল জ্যাক্‌সন তাঁর "Letters from Maneri Sufi Saint of Medieval India" রচনার সময় আসকারি সাহেবের কাছ থেকে যে সাহায্য লাভ করেন, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের স্থাপনকাল থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৬ সালে ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি "মধ্যকালীন ভারত" শাখায় সভাপতিত্ব করেন। ১৯৭৩ সালে ইতিহাস কংগ্রেসের মূল সভাপতির পদ অলংকৃত করার জন্যে তাঁকে

আমন্ত্রণ জানানো হয় কিন্তু অসুস্থতার কারণে তিনি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারেননি। ১৯৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে সুফি মতবাদ সম্পর্কে "আবদুল্লা সুহ্‌রাবর্দী" বক্তৃতা দেন। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার ইতিহাস বিভাগে "ডাঃ মুক্‌তার আহমদ আন্‌সারী স্মৃতি বক্তৃতা" প্রদান করেন। বিষয় ছিল "পুত্রকন্যাদের প্রতি সম্রাট আওরঙ্গজেবের আচরণ"। মগধ বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৭ সালে ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৪ তে তাঁকে সাম্মানিক ডি.লিট উপাধি প্রদান করেন। ভারত সরকার ১৯৮৫ তে তাঁকে "পদ্মশ্রী" উপাধিতে ভূষিত করেন। বিহার রিসার্চ সোসাইটি, খুদা বক্স লাইব্রেরি, কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল রিসার্চ ইন্‌স্টিট্যুট প্রভৃতির সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

ভারতীয় মহাফেজখানা (ন্যাশনাল আর্কাইভস অফ ইন্ডিয়া) কর্তৃক প্রকাশিত "ফোর্ট উইলিয়ম-ইন্ডিয়া হাউস-করেসপনডেনস"-এর একটি খণ্ড আসকারি-সাহেব যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদনা করেন। এই সিরিজের বিভিন্ন খণ্ডগুলি ভারতের খ্যাতনামা ঐতিহাসিকগণের দ্বারা সম্পাদিত হয়। পাটনার কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল রিসার্চ ইনসটিট্যুট তিন খণ্ডে "কম্প্রিহেনসিভ হিস্ট্রি অফ বিহার" প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় খণ্ডটি যোগ্যতার সঙ্গে আসকারি সাহেব সম্পাদনা করেছিলেন। ড. বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ সিন্‌হা প্রথম খণ্ড ও ড. কালিকিঙ্কর দত্ত তৃতীয় খণ্ডটি সম্পাদনা করেন। সমগ্র তিন খণ্ডের প্রধান সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক অনন্তলাল ঠাকুর। আসকারি সাহেব একাধিক ফার্সি পাণ্ডুলিপির ইংরাজি অনুবাদ করেন যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য "ইকবালনামা", "তবাকাত-ই-বাবুরি" ও "শাহনামা মুনাওয়র কলাম"। পাটনার খুদা বক্স লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক আসকারির একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করেছেন। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম জিন্না ও প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করতেন ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলন হয়নি কোনও দিন। ঐতিহাসিক হিসাবে আসকারির অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। এই দুই সম্প্রদায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলনমালাকেই তিনি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি তারাচাঁদ ও জগদীশনারায়ণ সরকারের সমগোত্রের ইতিহাস-ব্যাখ্যাতা। একবার কৌতুক করে আমাদের বলেছিলেন, 'মুনশী' ও 'মজুমদার' — এই পদবি দুটি প্রমাণ করছে কানাইয়ালাল মানেকলাল (কে. এম. মুনশি) ও রমেশচন্দ্রের সিদ্ধান্ত সঠিক নয়।"

তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ — এই বাক্যটি আসকারি সাহেব সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তিনি আপনভোলা মানুষ ছিলেন। দীর্ঘদেহী আসকারি সাহেবকে কেতাদুরস্ত পোশাক পরতে দেখা যেত না। ঢিলেঢালা আধময়লা পরিচ্ছদেই সারাজীবন কাটিয়ে দিলেন। রাজভবনে ডাক পড়লেও এই পোশাকেই যেতেন। কিছুটা অগোছাল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সারাজীবন গবেষণা করলেন কিন্তু পি এইচ.ডি.-র থিসিস কোনও দিন লিখলেন না। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে এ ক্ষেত্রে তাঁর মিল পাওয়া যায়। মানুষের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। দোকানে গিয়ে জিনিস কিনে দাম দেবার পর দোকানি খুচরো পয়সা বা নোট ফেরত দিলে না-গুনেই পকেটে রেখে দিতেন। তাঁর হাতঘড়ি নেই কেন প্রশ্ন করায় বলেছিলেন প্রথম জীবনে ঘড়ি কিনেছিলেন। একবার নদীতে স্নান করতে গিয়ে হাতঘড়ি খুলে ঘাটে রেখেছিলেন। স্নান সেরে উঠে এসে দেখেন ঘড়ি লোপাট। তারপর আর ঘড়ি কেনা হয়ে ওঠেনি। সাইকেল চড়েই যাতায়াত করতেন। একাধিকবার সাইকেল চুরি গেছে কারণ তালা লাগাতেই ভুলে যেতেন। কলেজে অধ্যাপনার পরে ও ছুটির দিনে খুদাবক্স লাইব্রেরি ও পাটনা শহরের পশ্চিমে ফুলওয়াড়ি শরিফের খান্‌কা সুলেমানিয়ায় ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতেন।

আসকারি সাহেব সঙ্গে থাকলে পাটনা শহরের বিভিন্ন অঞ্চল ও প্রাচীন ইমারৎগুলির ইতিহাস জানা যেত। পূর্ব পাটনার যেখানে সিরাজউদ্দৌলার পিতা জৈনুদ্দীনকে পাঠানরা হত্যা করে, সেটি তিনি আমাদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন। পাটনায় আকাশবাণীর বেতার কেন্দ্র যে জায়গায় অবস্থিত সেখানে এক কালে বিশাল আমবাগান ছিল। কয়েকটি গাছ এখনও অবশিষ্ট আছে। আসকারি সাহেব বলেছিলেন, এই আমবাগানের আম সিরাজউদ্দৌলার খুব পছন্দ ছিল। পাটনা থেকে মুর্শিদাবাদ চালান যেত। পাটনার একটি মুসলমান অধ্যুষিত পাড়ার নাম লোহানিপুর। আসকারি সাহেবের কাছে শুনেছিলাম এই লোহানিপুর মীরকাশিমের জন্মস্থান। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁদের পত্রিকায় তাঁরই শিক্ষক যদুনাথ সরকার সম্পাদিত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত "বঙ্গদেশের ইতহাস", দ্বিতীয় খণ্ডর (History of Bengal, Vol.II) সমালোচনা লিখে দেবার জন্যে আসকারি সাহেবকে অনুরোধ করেন। তাঁর সমালোচনা নিছক গুরুস্তুতিতে পর্যবসিত হয়নি, বরং গুরুকে রেহাই না দিয়ে বেশ কড়া সমালোচনাই করেছিলেন। যদুনাথ কিন্তু তাঁর ছাত্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হননি। শেষদিন পর্যন্ত তাঁকে স্নেহ করতেন। একবার ইতিহাস কংগ্রেসে আসকারি সাহেব ও পঞ্জাবের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক সর্দার গাণ্ডা সিং-এর একই ঘরে থাকার ব্যবস্থা হয়। বয়সে সর্দারজি আসকারি সাহেবের চেয়ে দু'তিন বছরের বড়ই ছিলেন। তিনিও এক প্রচণ্ড আকর্ষণীয় ব্যক্তি ছিলেন। নৈশভোজের পর কোনও ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে দু'জনের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়ে যায়। আলোচনা যখন শেষ হল, দেখা গেল রাত কাবার। ভোরের পাখির কলকাকলী শুরু হয়ে গেছে। ঐতিহাসিক আশীর্বাদলাল শ্রীবাস্তব বলেছিলেন, "সারাজীবন সূফী সন্তদের নিয়ে গবেষণা করতে করতে আসকারি নিজেও এক সূফীতে পরিণত হয়ে গেছেন।"

আসকারি সাহেবের প্রজন্মের অন্যান্য ঐতিহাসিকরা হলেন নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, কালিকিঙ্কর দত্ত, মহম্মদ হাবিব, জগদীশনারায়ণ সরকার, অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। এঁদের এক প্রজন্ম পূর্বের ইতিহাসবেত্তারা হলেন যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, শাফাৎ আহমদ খাঁ (ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা), হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ সেন ও অন্যান্যরা। লক্ষ করার বিষয়, এঁদের কারও বিলাতি ডক্টরেট ডিগ্রি ছিল না। এদেশে বসেই গবেষণা করে এঁরা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যদুনাথ সরকার, কালিকিঙ্কর দত্ত ও আসকারি সাহেব তো কোনও দিনই বিলেত আমেরিকা যাননি। বাকিরা বৃদ্ধ বয়সে কয়েক মাসের জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে বিদেশে গিয়েছিলেন। আশ্চর্য বোধ হয় যখন দেখি স্বাধীনতা অর্জনের পর, গত পঞ্চাশ বছরে, বিলাতি ডিগ্রির মোহ আমাদের পেয়ে বসেছে। যারা বিদেশে গিয়ে ডক্টরেট করে আসছে স্বদেশের ডিগ্রির প্রতি তারা অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করে। এটা এক ধরনের দাস্য মনোভাব। আমার সহপাঠীরা, যারা ইংল্যান্ড, আমেরিকা কিংবা সোভিয়েত রাশিয়ায় গিয়ে ডক্টরেট করে এসেছে, তারা অধিকাংশই সেই সেই দেশের অনুরাগী হয়ে গেছে, অর্থাৎ মগজ ধোলাই ভাল ভাবেই হয়ে থাকে। ইদানীং আর একটি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্যের আই. এ. এস ও আই.পি. এস অফিসাররা বছর তিনেকের ছুটি ম্যানেজ করে বিদেশে গিয়ে ডক্টরেট করে আসছে। তারাও আজকাল "স্টাডি লিভ" পেয়ে থাকে। যারা শিক্ষকতার জগতে নেই, তাদের ডক্টরেট ডিগ্রির কী প্রয়োজন বুঝতে পারি না। গাছেরও খাব, তলারও কুড়াব? দেশের নিরাপত্তার দিক থেকেও বিষয়টি চিন্তা করার আছে। বিগত দশ পনেরো বছরে নানা অর্থ সংক্রান্ত কেলেঙ্কারির বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এ সম্পর্কে সি. বি. আই অথবা বিচার বিভাগীয় তদন্তও হচ্ছে। শুধু যে রাজনীতিকরাই এর সঙ্গে জড়িত তা কিন্তু নয়। অভিযুক্তদের মধ্যে একটা বড় অংশই আই. এ. এস অথবা বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার প্রথম শ্রেণীর আমলা। পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। পাঁচ ছয় জন রাজনীতিক এই ঘটনায় জড়িত, আর দ্বিগুণ সংখ্যক আই. এ. এস তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। এক বঙ্গ সন্তানও এঁদের মধ্যে রয়েছেন। প্রশ্ন হল, যাঁরা স্বদেশে দুর্নীতিপরায়ণ, তাঁরা কি বিদেশে সৎ থাকেন? বিদেশি রাষ্ট্রগুলি লক্ষ লক্ষ টাকার প্রলোভন দেখিয়ে তাদের ব্যবহার করবে না, নিশ্চিতরূপে বলা যায় কি?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি ধীরে ধীরে স্বাধীনতা অর্জন করল। কিন্তু বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি — ইংল্যান্ড, আমেরিকা, সোভিয়েত রাশিয়া — তাদের অর্থনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্য প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ল। একেই আমরা বলি neo-colonialism বা নয়া-সাম্রাজ্যবাদ। এই সঙ্গে যে বিদ্যাচর্চার জগতেও স্কলারশিপ, ফেলোশিপ প্রভৃতির মাধ্যমে এক নয়া-সাম্রাজ্যবাদ স্থাপিত হল সেটা আমরা দেখেও দেখলাম না, বুঝেও না বোঝার ভান করলাম। বিকাশশীল দেশগুলির ছাত্রছাত্রীদের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি নিজেদের দেশে নিয়ে গিয়ে "উচ্চশিক্ষা" দান করতে লাগল। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্য হওয়ায় ইংল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ বেশি পাওয়া গেল। অক্সফোর্ড, কেম্বিজ, লন্ডন, সাসেক্স, এসেক্স দক্ষিণ এশিয়ার ছাত্রছাত্রীদের মুড়ি মুড়কির মতো ডক্টরেট বিলিয়ে দিতে লাগল। যে নিম্নমানের থিসিসে এরা বিদেশি ছাত্রদের ডিগ্রি দেয়, নিজের দেশের ছাত্রছাত্রীদের ওই মানের গবেষণাপত্রে ডিগ্রি দেবে না। আমার এ কথা বলা উদ্দেশ্য নয় যে যাঁরাই ইংল্যান্ডে গিয়ে ডিগ্রি নিয়ে আসেন তাঁদের প্রত্যেকের থিসিস নিম্নমানের। রামশরণ শর্মা, রোমিলা থাপার, অশীন দাশগুপ্ত, ইরফান হাবিব, সব্যসাচী ভট্টাচার্য বিদেশে গিয়ে উচ্চমানের কাজ করেছেন। এঁদের অনেকের থিসিস ওরা সাগ্রহে নিজেরাই প্রকাশ করেছে। এঁদের সারস্বতচর্চা একটি মাত্র ডিগ্রিতেই থেমে যায়নি। দেশে ফিরেও এঁরা গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন। নতুন নতুন গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু যাঁরা সস্তায় বাজিমাৎ করে আসেন, একটা কেম্বিজ কি অক্সফোর্ডের ডিগ্রি দেখিয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দেন। কিছু চাটুকারও জুটে যায়। তারা এদের হয়ে ঢাক পেটায়।

বিদেশে আজকাল কী ধরনের ডিগ্রি দেওয়া হয় তার দু'একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। একজন আমেদাবাদ শহরের উপরে থিসিস লিখে ডক্টরেট নিয়ে এলেন। তিনি প্রায় তিন বছর বিদেশে থাকলেন। মাঝখানে মাস তিনেকের জন্য আমেদাবাদে এসে থাকলেন। কেন? উত্তর হল, "ফিল্ড ওয়ার্ক করতে এসেছি।" আর একজন বিদেশে বাঁকুড়া জেলার উপর গবেষণা করে ডিগ্রি পেলেন। তিনিও তিন বছর বিদেশে কাটালেন, আর মাত্র তিনমাস বাঁকুড়ায়। অন্য দিকে পূর্ব জার্মানির (তখনও দুই জার্মানি একত্রিত হয়নি) শ্রীমতী ডোলোরেস ডমিন (Dolores Domin) ১৮৫৭-র বিদ্রোহ ও পঞ্জাবের উপর গবেষণা করলেন। তিনি একটানা দু'বছর পঞ্জাব ও দিল্লিতে থাকলেন। ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়াল্টার হাউজার (Walter Hauser) বিহার কিষাণ আন্দোলনের উপর উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি দু'বছর বাড়ি ভাড়া করে পাটনায় থেকেছেন। স্বাধীনতালাভের এতদিন পরেও আমরা ভারতীয়রা নির্লজ্জের মতো বিদেশি ডিগ্রি সংগ্রহ করে পুচ্ছটি স্ফীত করি। এই জাতীয় দাস্য মনোভাব আসকারি সাহেব ও তাঁর প্রজন্মের ঐতিহাসিকদের ছিল না। আমার গর্ব, আমি এঁদেরই পদতলে বসে ইতিহাসের পাঠ গ্রহণ করেছিলাম।

* অধ্যাপক আসকারির সাক্ষাৎ ছাত্র হওয়ার সুবাদে তাঁকে ঘনিষ্ঠরূপে দেখেছি। তাঁর সম্পর্কে বাকি তথ্য জেনেছি প্রয়াত ঐতিহাসিকদ্বয় কালিকিঙ্কর দত্ত ও জগদীশনারায়ণ সরকারের কাছ থেকে — লেখক।

একটি বিশ্বমানের গ্রন্থ

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

কিছু কিছু বইকে গ্রন্থ বলতে ইচ্ছে হয়। বই বা পুস্তক — এই শব্দ দুটি যেন সেই গুরুত্ব ধরে না যা গ্রন্থ শব্দটি ধরে। সৈয়দ আবুল মকসুদের 'বাঙালির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার'-কে গ্রন্থ বলে উল্লেখ করে, প্রয়াসী হয়েছি পাঠকের সামনে উপস্থিত করতে। এটি প্রবন্ধ-সংকলন। ইদানীং পশ্চিমবঙ্গে প্রবন্ধের প্রভুলতা ও বৈচিত্র কম বললে কি ভুল হবে? ড. অশোক মিত্র মহাশয় একটি চিঠিতে আমায় জানিয়েছিলেন 'বাঙালির জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্য শেষ হয়ে আসছে।' এই শেষ হয়ে-আসা অভাবের সংসারে হঠাৎ যদি কোনও মহৎ মানুষের জন্মশতবর্ষ বা তেমন কিছু মনে পড়ে যায় তখন হয়ত নানা পত্রপত্রিকায় ক্ষণবসন্তের মতো প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। এই ব্যতিক্রমটুকু বাদ দিলে, সেই একঘেঁয়ে উত্তরাধুনিকতা, ডিকন্‌স্ট্রাকশান, বিশ্বায়ন, দলীয় রাজনীতি, ধর্মের মহত্ত্ব-নীচতা ইত্যাদি, নয়ত চলতি হাওয়ার ফিচারই চোখে পড়ে পত্রপত্রিকায়। সমগ্র দেশের, মানুষের জীবনযাপনে শেকড় ছিঁড়ে পড়ার আতংকের, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্কটের, আন্তর্জাতিক বহুকৌণিক তর্কবিতর্কের, বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও তাকে নিয়ে অমানবিক নাস্তিক্যের এবং আরও অবিরাম উৎসারিত নতুন বিষয়ের প্রশ্নাকীর্ণ ও সাহসী প্রবন্ধ লেখা হয় না বললেই চলে। বিরল দুয়েকটি পত্রিকায় নিয়মিত নানা প্রবন্ধ প্রকাশ হয় বটে কিন্তু দুয়েকটির মধ্যেও কোনও কোনও পত্রিকার প্রবন্ধকার সেই অমোঘ অদৃশ্য একটি সীমারেখায় পৌঁছে কলম নামিয়ে রাখেন। সেই সীমারেখা সুযোগ করে দেয় ক্ষমতার কেন্দ্রের কাছাকাছি থাকতে। এঁদের মধ্যে যাঁরা খুব ভাগ্যবান কেন্দ্র তাঁদের অন্তর্গত করে নেয়। সেখানে রয়েছে নিরাপত্তা, সুখ, ইচ্ছাপূরনের হাতছানি। ফলে নতুন ও সাহসী বিষয়ে বা যে বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে অথচ পুনরালোচনা দরকার সেখানে এখন দ্রষ্টা ও সন্ধানীর দুঃখজনক অনুপস্থিতি। এভাবে চললে ভাষা ও সংস্কৃতি দুর্বল হয়ে পড়ে, কায়েম হয় দুর্বলদের রাজ্যপাট। এই দুর্বলতার ভিতর হঠাৎ হয়ত ভাষা বা অন্য কিছু নিয়ে আলটপ্‌কা একটা আন্দোলন শুরু হয়, মঞ্চে রাজপথে জমায়েত — কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষে আসবে আন্দোলনটি আসলে ঢাল, পেছনে রয়েছে অন্য আগ্রহ।

সৃষ্টিশীলতা, অন্বেষণ ও প্রশ্ন করার সাহসই ভাষাকে, জীবনকে উন্নত করে। হিন্দি ভাষা নিয়ে কট্টরপন্থী হিন্দিঅলাদের আন্দোলন, পরে কেন্দ্রীয় সরকারের অঢেল সাহায্য কি হিন্দিভাষাকে কোনও অসামান্যতা এনে দিয়েছে? বরং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অংশভাগ লাভের ব্যাকুলতাই বাড়িয়েছে। যে হিন্দি লেখক বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে ভয় পায় না তার জন্য সব দরজা বন্ধ। এই ভারতে সুবিধেবিতরণকারীদের অস্ত্র তখন কঠিন নীরবতা। কোনও কোনও দেশে আবার বহাল রয়েছে কারাবাস থেকে প্রাণদণ্ড অবধি। সম্প্রতি বাংলাদেশে লেখককে কারাবাসের সংবাদ আমরা পেয়েছি। সরকার সেখানে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। সেই বাংলাদেশের অসীম সাহসী প্রবন্ধকার সৈয়দ আবুল মকসুদের গ্রন্থ 'বাঙালির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার'। আমরা অনেকেই হয়ত জানি না সৈয়দ আবুল মকসুদের পরিচয়। সুতরাং প্রথমেই তাঁর পরিচয় নিতে হবে। বাংলাদেশে 'তিনি শীর্ষস্থানীয় গদ্যশিল্পী, গবেষক ও চিন্তাবিদ। শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, সমাজ, ধর্মতত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি তাঁর চিন্তা ও আলোচনার উপজীব্য। তাঁর প্রকাশিত বহু বইয়ের মধ্যে রয়েছে দুটি কাব্যগ্রন্থও ... যুক্তিবাদিতা ও চিন্তার স্বচ্ছতার জন্য তথ্য নয় তিনি বিশিষ্ট তাঁর অনুকরণীয় সাবলীল গদ্যশৈলীর জন্যেও। .... বাংলা একাডেমী পুরস্কার সহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত ... দেশের সকল প্রগতিশীল, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রামের একজন সক্রিয় কর্মী ও যোদ্ধা।' যাঁর এই পরিচয়, তাঁর প্রবন্ধ পড়ার কৌতূহল হবেই। এবং 'বাঙালির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার' পড়তে পড়তে কৌতূহল বিস্ময়ে গিয়ে পৌঁছবে। আলোচনার শুরুতেই তাই বাঙালি পাঠকের কাছে নিবেদন তাঁরা অবশ্যই গ্রন্থটি পড়বেন, সংগ্রহে রাখবেন।

এমন গ্রন্থের বিষয় ও শৈলীর সর্বত্র নিখুঁত আলো ফেলা, চাইলেও সম্ভব হবে না। কিছু আভাস দেবার কাজটি হয়ত হবে। এই গ্রন্থে নানা বিষয়ে বাইশটি সুচিন্তিত ও সাহসী প্রবন্ধ রয়েছে। দুয়েকটি দুঃসাহসী। প্রথম প্রবন্ধ থেকেই আমরা যেন বিদ্যুৎবাহী হয়ে পড়ি। প্রথম প্রবন্ধের নাম গ্রন্থেরও শিরোনাম 'বাঙালির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার'। এই প্রবন্ধ থেকে একটি উদ্ধৃতি : 'সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের যে কথা বলা হয় তার মধ্যে কিছুটা

অসারতা রয়েছে। বস্তুত নববই শতাংশ মানুষের জীবনে শুধু বাংলা এবং বাংলাই একমাত্র ও অনন্য ভাষা। .... আমাদের সমাজজীবনের সর্বস্তরে অবলীলায় বাংলা প্রচলিত। এখানে গালাগালি ও প্রেমালাপ দুই-ই সম্পন্ন হয় বাংলায় ... এমন কি আজকাল মোনাজাত পর্যন্ত বাংলায় করার রেওয়াজ। তাহলে বাংলা ভাষার উন্নতির পথে সমস্যা কোথায়? .... প্রতি বছর শহীদ দিবসের প্রাক্কালে শত শত একুশের সংকলন প্রকাশিত হওয়া যদি সাহিত্যের অগ্রগতির পরিচায়ক হয় তাহলে অবশ্য কিছুবলার থাকে না, কিন্তু বাস্তবে অবস্থা হল, এসব সংকলনের দু চারটি বাদে কোনওটিই সাহিত্য পদবাচ্য হয় না .... গ্রন্থমেলার প্রাক্কালে প্রকাশিত হচ্ছে অগণিত বইপত্র, যার বেশিরভাগ কবিতা-গল্প-উপন্যাস শ্রেণীর এবং এর বিপুল অংশ যারপর নাই নিম্নমানের রচনা।' এটুকু বলেই প্রাবন্ধিক থামেননি। স্বর আরও কঠিন হয়েছে। 'বাঙালিদের একটি শ্রেণী বিভিন্ন সময় কাজ না থাকলে কাল্পনিক প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াই করে খুব সুখ পায়। বাংলার প্রতি প্রেম প্রকাশ করতে গিয়ে একবার উর্দু একবার ইংরেজির প্রতি আক্রোশে ফেটে পড়েন। ইংরেজিকে সমাজ থেকে বিতাড়িত করলেই বাংলা ভাষা উন্নতির শেখর স্পর্শ করবে, এ নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না ...এশিয়ার যে দুটি দেশ স্বাভাব্যবোধে একেবার শীর্ষস্থানীয় সেই চীন ও জাপানও ইংরেজির উপস্থিতি চোখ এড়াবার মত নয়।.... বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি রচিত হয়েছে ইংরেজি শিক্ষিতদের দ্বারা শুধু নয়, সেই সময় প্রাথমিক স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে ইংরেজি পড়তে হতো ..... জসীমউদ্‌দীনকে যতোই পল্লীকবি বলা হোক না কেন, যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছে তারা জানে তিনি ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক। ... মাতৃভাষার বাইরে আর একটি ভাষা শিখলে বাঙালির মেধার খানিকটা অপচয় ঘটবে এটা মনে করার কোনও কারণ নেই। ধীশক্তি এমন জিনিস যা অধিক ব্যবহার ও চর্চায় বাড়েই, কমে না।' তাহলে বাংলা ভাষার উন্নতি আটকাচ্ছে কোথায় কিবা যদি অবনতি হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ কী? লেখক জানাচ্ছেন 'শিক্ষিত সমাজের সদস্যদের অপরিসীম আলস্য, আবেগপ্রবণতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, ভালবাসার অভাব ও অবহেলায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মজবুত জলবায়নটি আজ এক অনতিক্রম্য চড়ায় আটকে পড়ে আছে।' এই সব কথা যদিও ব্যাংলাদেশকে লক্ষে রেখে লেখা তবু কি মনে হয় না এর অনেকটাই পশ্চিমবাংলার জন্যও প্রাসঙ্গিক? বোধ করি না আত্ম-আলোচনা? এমন সত্য বলাকে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরিয়ে রেখেছে বললেই ঠিক বলা হবে। এর কারণ কি এই, যেহেতু আমরা জানি যিনি সত্য বলবেন তাঁকে অবধারিত দুর্ভাগ্য ইতে হবে এবং দুর্ভাগ্য আর আমরা বইতে রাজি নই, খুঁজছি নিরাপদ রাস্তায় নিরাপত্তা ও আমিরি? এ দেশে বাংলাভাষার যে গুণগত দুর্দশা হয়েছে তা যদি স্বীকার করতে অপরাগ না হই তা হলে মানতেই হবে সত্যকথনের ও কর্মের ঝুঁকি না নিতে চাওয়াই হল তার অন্যতম মর্মান্তিক কারণ। কর্ম নিয়ে যখন কথা উঠলেই তখন তাঁর অন্য একটি প্রবন্ধ থেকে কিছু কথা তুলে ধরবার বাসনা হচ্ছে : 'বৌদ্ধ কর্মতত্ত্বে কর্মের মাহাত্ম্য ঘোষিত হয়েছে এইভাবে "দেবগণকে নমস্কার করবো? না, তাঁরা বিধাতার বশীভূত। অতএব বিধাতাকে নমস্কার করি, তিনি অভীষ্ট ফল প্রদান করবেন। না, তাও সম্ভব নয়। কারণ তিনিও নিয়ত একমাত্র কর্মের ফলই প্রদান করবেন। তবে ফলকেই নমস্কার করা যাক। না ফলও কর্মাধীন। অতএব দেবগণই কি বিধাতাই বা কি, কেউই অভীষ্ট ফল প্রদান করতে পারেন না। সুতরাং কর্মকেই নমস্কার করা যাক। কেন-না বিধাতাও তার ওপর প্রভুত্ব করতে পারেন না।" আমরা এখন বিধাতার প্রভুত্ব চাইছি, যিনি অভীষ্ট ফল অর্থাৎ নগদ বিদায় প্রদান করবেন আমাদের। কাল, মহাকাল কিছুই আর কিছু না।

সম্প্রতি ইসলাম নিয়ে দুনিয়া তোলপাড়। পশ্চিমের মস্ত দুয়েক জন পণ্ডিত বলছেন আজকের লড়াই নাকি ইসলাম বনাম পশ্চিমী সভ্যতার! এঁদের লেখালেখি বাজারও পাচ্ছে। মকসুদের প্রবন্ধে প্রবেশের আগে এডওয়ার্ড সাইদের একটি বই নিয়ে 'দেশ' পত্রিকায় সদ্য যে আলোচনা করেছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় সেই আলোচনা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতির দরকার মনে করি। লেখাটি অত্যন্ত ধীমন্ত। সেখানে তিনি স্পষ্ট বলেছেন ইসলামের বহুমাত্রিক এবং জন্মস চরিত্র মুক্তমন নিয়ে বুঝতে হবে। লক্ষ করতে হবে ইরান, আলজিরিয়া, মিশর, ইরানে কর্তৃত্ব, আইন, স্বাধীনতা, ঐতিহ্য, ধর্মীয় গোঁড়ামি নিয়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ও বাইরে তুমুল বিতর্ক হচ্ছে। বিদ্যাজীবীরা শরিয়তকে আক্রমণ করেছে শরিয়তে থেকেই। 'আলজিরিয়ায় জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট ১৯৬২ সালের স্বাধীনতার পরে একটি নতুন সত্তা সন্ধানের সঙ্কল্প ঘোষণা করেছিল, যে সত্তা হবে ধর্মনিরপেক্ষ — আলজিরিয়-আরব-মুসলিম।' তারপর জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট পরিণত হয় অসহনীয় গোষ্ঠীতন্ত্রে। এর বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনে ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে যোগ দেয় সমাজের নানা অংশ, অন্তিত্ব বিপন্নের সর্বনাশ দেখে সংখ্যালঘু Berber গোষ্ঠির মানুষও। 'বস্তুত এই দ্বন্দ্বে আলজিরিয় সত্তার সজ্ঞা নিয়েই মৌলিক প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে সেই সত্তা কতটা ইসলামি, সেটা কী ধরনের ইসলাম। মিশরের এক বিদ্যাজীবী এবং এক চলচ্চিত্রকারের ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মীয় অনুশাসন চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে দুটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা হয়েছিল, দুটিতেই কট্টরপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীরা জয়ী হয়েছেন .... ঘটনাগুলো বলে দেয়, ইসলাম কোনও একমাত্রিক ব্যাপার নয়, "ইসলামি সভ্যতা" বলে কোনও অচলায়তনকে চিহ্নিত করা যায় না।' এই সত্যকে, মকসুদ তাঁর প্রবন্ধে, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে

আরও তীক্ষ্ণ উচ্চারণ করেছেন : 'বাংলাদেশের আজ দুভার্গ্য, মোল্লামার্কা মুসলমানের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য বিদেশ থেকে বিপুল অর্থ আসছে, অন্যদিকে ইসলামের ভাল দিকের নিন্দা করার জন্যও আসছে টাকা-পয়সা সুযোগ সুবিধা।' এই কথাগুলি থেকে দুই বাংলার হিন্দু মুসলমান কি আত্ম-অনুসন্ধানের নির্দেশ পাচ্ছি না? আমরা তো দেখছিই ইসলামকে বে-ইজ্জত করে বাংলাদেশের লেখিকা কেমন অর্থ ও আদর কুড়োচ্ছেন বিদেশে। কিন্তু তিনি যদি বাংলাদেশের মুসলমান সমাজকে গালাগাল দিতে দিতেও ইসলামের বহুমাত্রিকতা ও ভাল দিকগুলো তাঁর লেখায় রাখতেন তা হলে ভারতের সাম্প্রদায়িক দলগুলি তাঁর বইকে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি ভাঙতে হাজার হাজার কপি হিন্দি ভাষায় অনুবাদ করে ছাপিয়ে বিলি করার সুযোগ পেত না। তাতে অবশ্য তিনি এখন আশাতীত নগদ যা পাচ্ছেন, তা পেতেন না। এটা পাচ্ছেন ইসলামের নিন্দা করেছেন বলেই। আত্ম-অনুসন্ধানের কথায় মকসুদের প্রবন্ধ থেকে আরও কয়েক পংক্তি তুলছি : 'হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর আবির্ভাব তিরোধান তিথি যখন শুধু মোল্লাগোছের মুসলমান, মধ্যপ্রাচ্য ও পাকিস্তানপন্থী এবং সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠিটি তাদের স্থূল রুচিমতো উদযাপন করে তখন আমাদের সকলের দীনতা ঘটে। তাঁর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে যে গভীর ও ব্যাপক আলোচনাসভা হবে তাতে যত দিন পর্যন্ত দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রগতিশীল কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-চিন্তাবিদ এবং অন্য ধর্মের — হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান প্রভৃতি ধর্মের শীর্ষস্থানীয় নেতারা আমন্ত্রিত না হবেন, ততদিন পর্যন্ত এদেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতা দূর করা সম্ভব হবে না।' এমন কথা আগে কোথাও শুনেছি না পড়েছি? এ কাজ তো বহু আগেই শুরু করা দরকার ছিল শিক্ষিত, প্রগতিশীল মুসলমানদের। উচিত ছিল অন্য ধর্মের মানুষদের, এমনকী জ্ঞানান্বেষু নাস্তিকদেরও কথাটা তাঁদের বলা ও পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। এসব হয়নি, আমাদের শিক্ষিতজনের আলস্য ও আত্মকেন্দ্রিকতার আবহে দিনে দিনে বেড়ে উঠেছে গোঁড়া হিন্দুমুসলমানদের দাপট। কেউ কেউ পশ্চিমী নির্লজ্জতাকে, যা চূড়ান্ত মানবিক অবক্ষয়, বরণ করে নিয়ে ভেবেছেন ধর্ম ক্রমশই অবান্তর হয়ে যাবে। এই সব কিছুর ফল হয়েছে মারাত্মক। যে কোনও ধর্মের গোঁড়ামি কতটা বল সঞ্চয় করতে পারে তার প্রমাণ সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইওরোপের পতন। কিন্তু যদি ধর্মকে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে অনবরত ব্যাখ্যা করা হত, ধর্মীয় মনীষীদের সদর্থক দিকগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচিত হত, তা হলে অবশ্যই সাম্প্রদায়িক দুরাশার দাঁত ভেঙে দেওয়া যেত। মকসুদ উল্লেখ করেছেন : 'বাঙালি মুসলমান কবি-সাহিত্যিক স্বাধীনতার পরে হীনমন্যতা ও দুর্বলচিত্ততার কারণে, প্রগতিশীল শিবির থেকে খারিজ হয়ে যাওয়ার অমূলক আশঙ্কায়, মুসলমান মনীষীদের সম্পর্কে নীরবতা অথবা তাঁদের অবদান অস্বীকার করে অমার্জনীয় অপরাধ করে আসছেন।' ঠিক একই ব্যাপার চলছে এদেশেও হিন্দু মনীষীদের ক্ষেত্রে। এবং একই অপরাধ।

আবুল হুসেনের নাম হয়ত হাতে গোনা কয়েকজন জানেন। তাঁর আয়ু ছিল মাত্র একচল্লিশ বছর। তিনি ঢাকায় ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। এই সমাজের স্লোগান ছিল 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' স্লোগানটির উদ্ভাবক আবুল হুসেন। এই সমাজের মূলমন্ত্র ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি', মুখপত্রের নাম 'শিখা'। আমরা অনেকেই জানি শ্রদ্ধেয় কাজী আবদুল ওদুদ এই সমাজের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবুল হুসেন। কিন্তু মকসুদের প্রবন্ধ থেকে জানতে পারব 'তিনিই (আবুল হুসেন) এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা .... যদিও এখন একটি কথা আমাদের সমাজে প্রচারিত হয়েছে যে "মুসলিম সাহিত্য সমাজ"-এর "ভাবযোগী" ছিলেন আবদুল ওদুদ এবং "কর্মযোগী" ছিলেন আবুল হুসেন। বস্তুত আবুল হুসেনই ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। তাই তাঁর অনুপস্থিতিতে এই সংগঠন নিষ্প্রাণ ও স্থবির হয়ে পড়ে। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত "মুসলিম সাহিত্য সমাজ"-এর দশটি অধিবেশন হলেও ভূকম্পন সৃষ্টিকারী কাজ হয়েছে প্রথম পাঁচ বছর, যে পাঁচ বছর আবুল হুসেন এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। শেষ পাঁচ বছর ... টিকে ছিল বলা চলে। তার প্রতিষ্ঠাকালের চরিত্র শেষ পর্যায়ে ছিল না।' এই আলোকস্তম্ভ মানুষটিকে দেশ ছেড়ে আজীবনের জন্য চলে আসতে হয়েছিল কলকাতায় জমিদারশ্রেণী ও কাঠমোল্লাদের অত্যাচারে। তাঁকে যেমন ধর্মীয় সালিশে হাজির হতে বাধ্য করেছিল ওরা আবার তাঁর ওপর চালিয়েছিল ভয়ংকর অবমাননাকর শারীরিক পীড়ন।

কত অজানা তথ্য কত শ্রমে ও নিষ্ঠায় তিনি সংগ্রহ করেছেন তাঁর প্রবন্ধগুলিতে! এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে দুটি স্মৃতিগদ্যও জাহানারা ইমাম ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে নিয়ে। জাহানারা ইমাম ছিলেন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির প্রধান নেত্রী ও গণ আদালতে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আলমের বিচারের প্রধান উদ্যোক্তা। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাঙালি পাঠকের কাছে প্রিয় নাম। তাঁর কথা শুনতে সব সময় আগ্রহ থাকে।

ইলিয়াস সম্পর্কে কিছু নতুন দৃষ্টিকোণ উপস্থিত করেছেন প্রবন্ধকার তাঁর স্মৃতিগদ্যে। সেখানে ইলিয়াসের দুটি কবিতার চার চার পংক্তির উল্লেখ দেখে আপ্লুত বোধ করি। অন্তত একটি কবিতার চার পংক্তির উল্লেখ করার লোভ সামলানো কঠিন :

> বৃষ্টি হলে কি ভাল্লাগলো, এখনো শন্ শন্
> হাওয়া দিচ্ছে, আকাশ জুড়ে আলোর ইল্যুশন।
> কোথায় গিয়ে হারিয়ে যাবো, উধাও হলুম তাই
> পথ হারালো, আঁধার হল, মায়া গোটাটাই।

পশ্চিমবঙ্গে আর. এস. পি. নামের রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ কি জানেন শামসুদ্দীন আবুল কালামের নাম যিনি রোম নগরীতে ' প্রিয়জনহীন পরবাসে পরলোক গমন করেছেন ... নির্জন ফ্ল্যাটে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়? সাত সপ্তাহ পরে তাঁর ঘরের দরজা ভেঙে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ'। চল্লিশ দশকে তিনি ছিলেন আর. এস. পি.-র সক্রিয় কর্মী। ভারত ভাগের পর বাংলাদেশে চলে যান। সমাজসচেতন এই রাজনৈতিক কর্মী ও কথাশিল্পীর বিস্তারিত বার্তা রয়েছে এই গ্রন্থে। ভাল গল্প লিখতেন। তাঁর সৃজনশীল জীবন ও অসহায় মৃত্যু আমাদের ছুঁয়ে যাবে গভীরে। কবি জসীমউদ্‌দীন সম্পর্কে জানিয়েছেন নতুন তথ্য ও বিচার। প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ করবার প্রয়োজনে অকপটে উদ্ধৃত করেছেন আল মামুদের পংক্তি 'খাঁটি "আরবান" মানসিকতা তাঁর (জসীম উদ্‌দীনের) মধ্যে ছিল বলেই পরবর্তী ত্রিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের "আরবান কবিকুলের" যূথবদ্ধ গ্রাম্য অবজ্ঞাকে তিনি পাত্তা দেন নি।" উদ্ধৃত করেছেন ঠিকই তবে আল মামুদের বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থানটি বলতেও ভুলে যাননি। এই একটি ঘটনাই বুঝিয়ে দেয় প্রাবন্ধিকের প্রকৃতপক্ষে কতটা সৎ থাকা জরুরি। সেই কারণে মকসুদের এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি ইতিহাসের নিরপেক্ষ দলিল হয়ে ওঠে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে রচিত প্রবন্ধটি স্বল্পদৈর্ঘের কিন্তু মূল্যবান। এই প্রবন্ধের শেষে তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, সেখানে পৌঁছতে শুরু থেকেই লক্ষ করব সমৃদ্ধ বিশ্লেষণের একের পর এক ধাপ। তিনি মনে করেন নেতাজির পরিচয় তিনি আসলে সর্বত্যাগী একজন দার্শনিক। শেষ পংক্তিগুলি এইরকম :

'ভারতবর্ষের শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি প্রভৃতি সৃষ্টিশীল ক্ষেত্রে এক নবজাগরণের স্বপ্ন ছিল তাঁর হৃদয়ে। ... তাঁর বিস্ময়কর সাহস, তাঁর বিপ্লবী কর্মযজ্ঞের ব্যাপকতা ও উচ্চতা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন সকলেই। তাঁর বিশালত্ব স্বীকার করেও তাঁর ভুল প্রমাণ করার জন্য তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু কর্মযোগী নেতাজীর **দার্শনিক চিন্তাচেতনার** গভীরতা সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হলেই এই মহামানবের সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়।' (মোটা অক্ষর বিন্যাস আমার)।

এই আলোচনার গোড়ায় সৈয়দ আবুল মকসুদের পরিচয়ে জেনেছি তিনি প্রগতিশীল। 'প্রগতিশীল' শব্দটির মানে কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাস এ রকমটাই বোধ হয় আমরা বাঙালিরা জানি। আর এটাও জানি কমিউনিস্ট আদর্শে ব্যক্তির অবস্থান খুবই টলমলে। সেখানে ব্যক্তি নয় জনগণই মূল কথা। শ্রদ্ধেয় অম্লান দত্ত যাকে বলেছেন 'গণপিণ্ড'। 'বাঙালির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার' গ্রন্থে 'ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্র' শিরোনামের একটি প্রবন্ধ রয়েছে। নানা তথ্য, সংবাদ ও অন্বেষণের স্তম্ভের ওপর দাঁড় করানো দার্শনিক চিন্তার এমন অনন্য রচনা গ্রন্থটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। এই প্রবন্ধটি পাঠ করতে করতে পাঠক 'প্রগতিশীল' শব্দটির প্রকৃত মানে কী তা অবগত হবার সুযোগ পাবেন এবং কোনও কোনও শব্দকে সংকীর্ণ অর্থের বেড়াজালে আটকে ফেলার যে দীনতায় কখনও কখনও আমরা অন্ধের মতো আটকে যাই তা থেকে মুক্তি আসে। প্রবন্ধটি দীর্ঘ — প্রায় তেত্রিশ চৌত্রিশ পৃষ্ঠার। 'মুক্তি আসে' কথাটির সমর্থনে গোটা প্রবন্ধটিই পাঠকের সামনে রাখতে হয় কিন্তু এখানে সেই অবকাশ নেই। তাই পাঠককে প্রবন্ধটি পড়তে হবে। তবু তাঁদের কৌতূহল উসকে দিতে কয়েক পংক্তি তুলে দিচ্ছি :

> '... প্রাচীন সমাজের ব্যক্তির সামান্যই স্বাধীনতা ছিল। তাদের মৌলিক ও স্বাধীন চিন্তার সুযোগই ছিল না। এমন কি মধ্যযুগেও বিভিন্ন ধর্মীয় রীতিনীতি মানুষকে নানা বন্ধনে আবদ্ধ করে। ... সাধারণ মানুষ ঘুমন্ত মানুষের সঙ্গে তুলনীয়। সেই সাধারণ ঘুমন্তদের মধ্য থেকে এক এক সময় এক কি দু'জন জেগে ওঠেন। সেই জেগে ওঠা মানুষগুলো ছিলেন প্রতিভাবান মানুষ যারা প্রচলিত রীতিনীতির বাইরে পদচারণা করতে প্রবৃত্ত হন। তখন ধীরে ধীরে সেই ঘুমন্ত সাধারণ লোকগুলোও জেগে ওঠে — জেগে ওঠে প্রতিভাবানদের ও অগ্রসর চিন্তাচেতনার অধিকারী লোকদের আঘাত ও প্রতিবাদ করার জন্য। প্রতিভাবানরা আঘাতপ্রাপ্ত হন কিন্তু দেরীতে হলেও সমাজ শেষ পর্যন্ত তাদের অগ্রসর ও যুক্তিযুক্ত চিন্তাধারায় সিক্ত হয়, তাদের সিদ্ধান্ত স্বীকার করে নেয়।'

একক ব্যক্তির প্রতিভা, সাহস, শাহাদাত সেই সঙ্গে নিজের মানুষদের কাছ থেকে পাওয়া অবজ্ঞা ও যন্ত্রণা ইত্যাদি পরতে পরতে চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করতে করতে তিনি 'প্রগতিশীল' শব্দটির যথার্থ অর্থটি উপস্থিত করেছেন তাঁর প্রবন্ধে।

এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে বাংলাদেশকে কেন্দ্রে রেখে প্রবন্ধকার যখন যেখানে জরুরি মনে করেছেন হাজির রেখেছেন বিশ্বকে। তাই গ্রন্থটি বিশ্বজনেরও হয়ে উঠেছে। প্রবন্ধগুলির কিছু প্রকাশিত হয়েছিল বাংলাদেশে নানা পত্রপত্রিকায়, কিছু লিখিত বক্তৃতা — আমন্ত্রণে পাঠ করেছেন। সব প্রবন্ধগুলিই বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে, কিন্তু গ্রন্থ আলোচনায় তা স্বভাবতই সম্ভব নয় বলে চেষ্টা করেছি সৈয়দ আবুল মকসুদের চিন্তার মৌলিকতা, নতুন নতুন তত্ত্ব ও যথাযথ তথ্যের সমাবেশ এবং অদম্য সাহসের একটা আভাস দিতে, যাতে পাঠক আগ্রহী হন 'বাঙালির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার' গ্রন্থটি পড়বার, এবং পড়তে পড়তে পেয়ে যাবেন আনন্দের, উত্তেজনার, স্বচ্ছ ও মুক্তচিন্তার নান্দনিক জগৎ।

বাঙালির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার — সৈয়দ আবুল মকসুদ/ পরমা, ঢাকা/২২৫.০০

আকর গ্রন্থ হতে পারে

অমিতাভ রায়

প্রকল্প উপস্থাপনা, বিকল্প অনুসন্ধান, অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং সবশেষে সংগৃহীত যুক্তি-তথ্যের সংযোজনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পদ্ধতির প্রয়োগে গড়ে উঠেছে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার ফসল, - 'ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে বাংলার রেনেসাঁস'। গবেষক, - ড. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়।

আলোচনা পদ্ধতির গতি-প্রকৃতিতে পাঠক অভিভূত। বিগত দুই শতাব্দীতে একই প্রসঙ্গে প্রকাশিত অসংখ্য পুস্তক-প্রবন্ধ অন্বেষায় লেখক নিজেও যেমন ক্লান্ত হননি, পাশাপাশি যথোপযুক্ত উদ্ধৃতি পরিবেশন করে বিশ্লেষণকে সম্পৃক্ত করা সত্ত্বেও পাঠককে ভারাক্রান্ত করেননি।

ঘটনার প্রেক্ষাপটে যুক্তি সংস্থাপন করে, পাল্টা যুক্তির মাধ্যমে তার সত্যতা নিরূপণের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে বিচার-বিবেচনার শক্তপোক্ত বনিয়াদ। ফলে পাঠকের উপর কোনও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। অথচ পাঠককে একটি নির্দিষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করা হয়েছে। সব মিলিয়ে, দু'মলাটের মধ্যে গ্রথিত হয়েছে প্রায় পৌনে পাঁচ শো পৃষ্ঠার এক যুক্তি-বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ মূল্যায়ন, যা নিঃসন্দেহে এক নতুন পথের দিশারী।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সমাজ-সাহিত্য-শিক্ষা অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে বুদ্ধি-চিন্তার আঙিনায় ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি এর আগে বহুভাবে বিবেচিত হয়েছে। 'ধনীর আধুনিকতা' থেকে 'গণ-জাগরণ' ইত্যপ্রকার বিভিন্ন অভিধায় এই সব ঘটনার নামকরণ করা হয়েছে। ফলে ইউরোপের অন্ধকার যুগের অবসানের পর চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতক থেকে ন্যূনাধিক শ'পাঁচেক বছর ধরে যে ভাবে সমাজ-সভ্যতা বিকশিত হয়ে উঠেছিল তার সঙ্গে বাংলার শ'দেড়েক বছরের তুলনার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। প্রশ্ন উঠতেই পারে, - উনবিংশ শতাব্দীর আগেকার বাংলার সমাজ কি অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল?

ক্ষয়িষ্ণু ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র এবং মুসলিম প্রশাসনের দাপটের প্রেক্ষাপটে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে শুরু করে বেশ কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে দরবেশ, সুফি, নিম্নবর্গের মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করে চৈতন্যদেব যে কাজ করে গিয়েছিলেন তা আলোচ্য বইতে গুরুত্ব পায়নি। চৈতন্যদেবকে 'রেনেসাঁস ম্যান' না বলে 'লিবারেটর' আখ্যায় ভূষিত করার সময় যে সব যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে সেগুলি কি আগেকার যুক্তির বিরোধিতা বা ইতিহাসকে অস্বীকার করা নয়? দু'-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

'তাঁকে ঘিরে সব কিছু আবর্তিত হবে এমন মত বা পথের প্রবর্তন তিনি করেননি। সম্ভাবনার নানা দরজা তিনি খুলে দিয়েছিলেন। বাংলার পরবর্তী রেনেসাঁস পথিকরা যে যার মতো পথে চলেছিলেন। প্রত্যেকেই ছিলেন অনন্য ও স্বতন্ত্র গৌরবের অধিকারী' (পৃষ্ঠা - ৩৯২)। চৈতন্যদেব কি তাঁর সময়ের নিরিখে অনন্য ও স্বতন্ত্র ছিলেন না? 'চলমান মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার জন্য, ইতালির হিউম্যানিস্টরা যেমন প্রাচীন গ্রীক-লাতিন আদি অন্যতর সংস্কৃতির হাত ধরেছিলেন, বঙ্গীয় রেনেসাঁসেও প্রায় একই ঘটনা ঘটেছিল' (পৃষ্ঠা-৭২)। ধর্মীয় গোঁড়ামি প্রতিহত করার জন্য চৈতন্যদেব কি প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের শরণাপন্ন হননি? তা হলে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে এত সরলীকৃত মন্তব্যের কি প্রয়োজন?

'মানবসভ্যতার প্রথম বসন্ত' বলে অধুনা অভিহিত ইউরোপ তথা ইতালির 'রেনেসাঁ', যা পরবর্তীকালের জার্মানিতে 'রিফর্মেশন', ফ্রান্সে 'ফরাসি বিপ্লব', ব্রিটেনে 'শিল্প বিপ্লব' প্রভৃতির মাধ্যমে মানবসভ্যতার প্রতিটি উপাদানের এগিয়ে যাওয়ার ধারাবাহিকতায় নতুন নতুন মাত্রা যোগ করেছিল, আলোচ্য পুস্তকে একের পর এক উদাহরণ-উদ্ধৃতি গেঁথে এই ধারণাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তবে, শুধুমাত্র স্থাপত্য ছাড়া প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের উপর ইতালীয় রেনেসাঁসের প্রভাব অনুচ্চারিত।

ইতালির রেনেসাঁ-র আলোচনা প্রসঙ্গে তখনকার সমাজজীবন, রাজনীতি-অর্থনীতি, শিল্প-সংস্কৃতি, ইত্যাদি সহজ ভাষায়, প্রাঞ্জল ভাবে সবিস্তারে বিবৃত হলেও বাংলার ক্ষেত্রে তা পরিহার করা হয়েছে। ফলে, সতীদাহ প্রথা নিরসন থেকে বিধবাবিবাহ প্রচলন, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা থেকে মুসলমান সম্প্রদায়ের পিছিয়ে থাকার কারণ আলোচিত হলেও এই সময়সীমায় ধনতন্ত্রের বিকাশ, বিজ্ঞান চর্চার উত্তরণ, প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের প্রয়োগের প্রভাব প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনার সুযোগ ও প্রয়োজন থাকলেও আলোচিত হয়নি।

সমাজসংস্কার বিষয়ক আন্দোলন অর্থাৎ সতীদাহ প্রথা নিরসন, বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ প্রথা নিবারণ, নারীশিক্ষা প্রবর্তন, বাল্যবিবাহ প্রথা রদ প্রভৃতি এই সময়সীমার উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি। পাশাপাশি আলোচ্য কালেই বাংলায় ধর্ম সংক্রান্ত যে আলোড়ন দেখা দিয়েছিল তার প্রধান উপকরণ ছিল, - খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারক ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মুরুবিবদের দ্বন্দ্ব, সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী ও সদ্যসৃষ্ট ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়,

রক্ষণশীল ও সংস্কারমুক্ত-উদারপন্থী হিন্দুদের দ্বন্দ্ব-বিতর্ক, ব্রাহ্মদের অন্তর্বিরোধ এবং সর্বোপরি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের ক্রিয়াকর্মাদি। একই কালসীমায় বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই সময়েই বাংলায় প্রবর্তিত হয় আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা যার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিজ্ঞান চর্চা। সমকালীন সময়ে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক ঘটনাবলি যেমন, - কৃষক বিদ্রোহসমূহ, জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, হিন্দুমেলার প্রবর্তন, আত্মীয়সভা, ভারতসভা, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রভৃতি সংগঠনের প্রতিষ্ঠা, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূচনা প্রভৃতির প্রভাব নিশ্চয়ই বাংলার সমাজজীবনে পড়েছিল।

অবশ্য, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতির ইতিহাসচর্চায় বাংলার স্বাভাবিক দুর্বলতা সুবিদিত। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও তাঁর ছেলে সুকুমার রায়ের সাহিত্যচর্চা বাংলায় সর্বজনস্বীকৃত। অথচ, মুদ্রণশিল্পে তাঁদের যুগান্তকারী অবদানের খবর ক'জন রাখে? এ রকম আরও অনেক উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করা যেতে পারে, বাংলার ইতিহাসে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতির চর্চা সাধারণভাবে অবহেলিত।

কৃষিভিত্তিক-গ্রামকেন্দ্রিক বাংলা, সমাজ ইতিহাসের ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার করে শিল্পভিত্তিক-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তীর্ণ না হয়ে কেন মধ্যবিত্ত বাবুসংস্কৃতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল, তা নিয়ে বিচার-বিবেচনার অবকাশ ছিল। ইতালির ইতিহাসে ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পড়ার পর পাঠককে একই বিষয়ে বাংলার অবস্থা জানানোর দরকার ছিল।

সম্ভবত প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণাপত্রের সীমাবদ্ধতার জন্যই রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলার সামাজিক বিবর্তনের পরম্পরায় 'সাহিত্য'-ই আলোচ্য গবেষণার মূল উপজীব্য।

'পাঁচ শতক ধরে ছড়িয়ে থাকা ইতালির রেনেসাঁ-র সঙ্গে মাত্র শ' দেড়েক বছরের বাংলার উত্তরণ-উজ্জীবনের ইতিহাসের তুলনা করা কতটা সঙ্গত' জাতীয় প্রশ্ন উত্থাপিত হলেও উত্তর কিন্তু সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তথ্যসমৃদ্ধ একটি আকরগ্রন্থ রচনার রসদ ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণায় প্রাধান্য দেওয়ায় পুস্তকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠল না।

পরিশিষ্ট, গ্রন্থ ও রচনাপঞ্জি, নির্ঘণ্ট এবং সংক্ষেপক অংশসমূহ আলোচ্য পুস্তকের মূল্যবান সম্পদ।

ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে বাংলার রেনেসাঁস - ড. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়।/ প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩/৩০০.০০

প্রবীণ কণ্ঠের প্রাজ্ঞ উচ্চারণ

পরিমল চক্রবর্তী

সাহিত্যের একাধিক শাখায় সঞ্জয় ভট্টাচার্যের বিচরণ ছিল অবাধ। গল্প-উপন্যাস প্রবন্ধ-সমালোচনা ইত্যাদি সমস্ত কিছুই তিনি রচনা করেছেন এবং কবিতা তো বটেই। বস্তুত, কবি হিসাবেই তাঁর খ্যাতি সর্বাধিক স্বীকৃত। কিন্তু কী নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন আর কবি-অবস্থানেই-বা তিনি কোন ঘরানার? ব্যক্তিগত জীবনাচরণে তিনি যেমন ছিলেন সহজ-সরল এবং কোনও আপাতলক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যবিহীন, তাঁর কবিতাও তেমনই সাবলীল, সাদা-মাটা, কোনও রূপ চকিত চমকের উপস্থিতিহীন। বস্তুত, কবিতায় চমক সৃষ্টির কোনও অভিপ্রায়ই তাঁর ছিল না — তা বিষয়বস্তুগতই হোক অথবা ছন্দ-মিল-অলংকার ইত্যাদির কিংবা আঙ্গিকের অন্য কোনও দিকের বিবেচনাতেই হোক। তাঁর কবিতায় নাটকীয়তার অবতারণা নেই, নেই কোনও প্রদর্শনযোগ্য মুখোশের মেলা। দলীয় রাজনীতির স্পর্শগন্ধশূন্য, সামাজিক পরিবর্তনের জন্য অধৈর্য উল্লম্ফনহীন — এমন-কী পরাবাস্তবতা (para-realism), অধিবাস্তবতা (super-realism) ইত্যাদি এবং এই ধরনের আরও কোনও-কোনও অত্যাধুনিক-অথচ-ইতিমধ্যেই ক্ষয়গ্রস্ত দুর্বোধ্য শিল্পীক মতবাদ-নিঃসম্পর্কিত তাঁর কবিতা একেবারেই তাঁর নিজস্ব অনুভূতির জিনিস।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য বাংলা গীতিকবিতার ঐতিহ্যলালিত, তা থেকে বিচ্ছিন্ন নন—যদিও এই কবিতার ঐতিহ্যটাই, ধারাবাহিকতার বিচারে, বিচ্ছিন্ন। কিন্তু সেই ব্যাহত (intercepted) ঐতিহ্যের অনুসরণেও তিনি তাঁর প্রাচীন ও আধুনিক পূর্বসুরিদের অনুবর্তী

আদৌ হননি। গীতিকবিতার ক্ষীয়মান ধারায় অবগাহিত হয়েও নিজের ভাব-ভাবনাকে সেই কবিতার রূপরীতিতে নিজের মতো করেই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। অর্থাৎ, গীতিকবিরূপে তিনি স্বকীয়তামণ্ডিত।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য আগাগোড়াই রোম্যান্টিক, কিন্তু প্রথম পর্বে বিশেষ-রূপে। এই পর্বে তিনি গীতলতা-ঝঙ্কৃত, কল্পনা-বিহ্বল এবং গভীরভাবে স্বপ্নতাড়িত। দ্বিতীয় পর্বের কবিতাতেও গীতিময়তা অব্যাহত, কিন্তু কল্পনার বল্গা অনেকটা রাশ-টানা এবং পরিপার্শ্ব সচেতনতার নতুন লক্ষণটি তাতে স্ফুরিত। তৃতীয় বা শেষ পর্বে তিনি স্মৃতিবিদ্ধ, সম্পূর্ণরূপে স্মৃতিগ্রস্ত। এই স্মৃতি অবশ্য স্বপ্ন-নিঃসম্পর্কিত নয়, কিন্তু পুরোপুরি স্বপ্ন-আশ্লিষ্টও নয়। একে বলা যেতে পারে স্বপ্নস্পৃষ্ট স্মৃতি। এই স্মৃতিভারাতুরতা এবং তৎসহ বহমান গীতলতা — সমস্ত অন্তরাকে অতিক্রম ক'রে শেষাবধি এই দুই-ই হ'য়ে দাঁড়ায় তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য, মুখ্য সুর।

এই তৃতীয় পর্বেরই একেবারে শেষ দিকের রচনা এবং তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাব্যগ্রন্থ 'কথার ভেতর কথা'। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি পাঠ করলেই বোঝা যায়, কবিজীবনের একেবারে শেষদিকে তাঁর কবিতায় অন্য একটা সঞ্চারীভাবও এসেছিল। সকল শ্রেষ্ঠ কবির মতোই শেষ পর্যন্ত তিনিও সমস্ত অপরাভাবকে অতিক্রম করে যেন এক পরাচেতনায় নিজেকে উত্তীর্ণ করতে অভিলষিত হয়েছিলেন। স্বপ্ন-সংবিষ্ট ও স্মৃতি-সমাচ্ছন্ন আত্মকথক কবি মহাজীবনের প্রেমে সহসা সচকিত হয়ে উঠেছিলেন, মহাসময়ের স্রোতে নিজেকে অবগাহিত করে নিয়েছিলেন। কবিজীবনের এই সংক্ষিপ্ত ও সারবান অন্ত্যপর্বে এক সুব্যাপ্ত বোধির মধ্যে নিজেকে তিনি অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গ্রন্থভুক্ত এই সময়ের, আকারে সংক্ষিপ্ত — এমনকী কিছু-সংখ্যক নিতান্ত নির্বহুল দিনলিপির কয়েক ছত্রে অবসিত কবিতাগুলি তাঁর কবিমানসের প্রৌঢ় পরিণতির সর্বশেষ রূপ। প্রথম পাঠে, ভাষাগত নির্বাহুল্যে, এগুলিকে হয়ত হালকা বলেই অনুভূত হবে; কিন্তু পৌনঃপুনিক পাঠ এগুলির অন্তর-স্বরূপকে উন্মোচিত করে এগুলির ভাবগত গভীরতা ও উৎকর্ষকে পাঠক-চিত্তে প্রতিভাত করবে। তাঁর কাব্যসাধনার অন্তিম সাক্ষ্যবহ এই কবিতাগুলি আসলে পরিস্রুত অন্ধকারের, যা আমাদের মনোজীবনকে নূতন চেতনায় উদ্ভাসিত করতে সক্ষম।

'কথার ভেতর কথা'র সর্বোৎকৃষ্ট অংশ 'পঞ্চাশের জার্নাল' এবং 'দিনলিপি'। এই অংশে বিন্যস্ত স্বগত ও নির্বহুল দিনলিপির সংক্ষিপ্ত পরিসরে কবি তাঁর অন্তরকে বিচিত্রভাবে উন্মোচিত করেছেন। যেহেতু নিরলঙ্কৃত, অতএব আপাতলক্ষ্যে এই কবিতাগুলিকে হয়ত কবির অনভিনিবিষ্ট রচনা হিসাবেই অনেকে গণ্য করবেন; কিন্তু এগুলিতে অন্তঃপ্রবিষ্ট হলে তাঁরা বুঝতে পারবেন যে এই স্বল্পাবয়ব রচনাগুলিতেও কবি যথেষ্ট অভিনিবিষ্ট — এমনকী বলা যেতে পারে, এগুলি তাঁর একাগ্র অভিনিবেশেরই ফল। এবং অভিনিবেশের একাগ্রতার দরুণই এই সংক্ষিপ্ত কবিতাগুলিতে তাঁর অনুভূতি এত গভীর, উপলব্ধি এত স্বচ্ছ। অথচ পাঠকমানসে এই অনুভূতি ও উপলব্ধি কোনও ক্রমেই আরোপিত (imposed) হয়নি। অর্থাৎ, কবিতাগুলি আদপেই ডাইডাকটিক নয়। অবশ্য তেমনটি হবার কোনও সম্ভাবনাও ছিল না, কেননা আদিম যে-সারল্যে এগুলি কবির ভিতর থেকে উচ্ছ্রিত হয়ে উঠেছে, তাতে ডাইডাকটিসিজমের কোনও স্থান নেই। এই কবিতাগুলির প্রতিটিতেই রয়েছে কবিচিত্তের তিমিরাভিযাত্রার এষণা; তবে 'উৎসে অবতরণ' কবিতাতেই সেই এষণার তীব্রতা সর্বাধিক :

> আরো অন্ধকার দাও, আরো, আরো আরো।
> যতো পারো শর্বরী আমার।
> দাও, দাও, অতলে নামার
> অপূর্ব সুযোগ;... ...

অন্ধকারের অভিযাত্রী এই কবিতাগুলি ছাড়াও উচ্চারিত প্রার্থনার গাঢ়তায় 'কথার ভেতর কথা' ও 'মাতা সাক্ষাৎক্ষিতেস্তনুঃ' এবং আত্মস্বরূপ উপলব্ধির গভীরতায় 'অবিনয়' ('... আমার আসন/ ঈশ্বরের স্থানে।') — এই কবিতা তিনটি মনে দাগ কাটে।

আসলে 'জার্নাল' পর্যায়ের কবিতাগুচ্ছে আমরা পাই সেই ক্লান্ত ও বিষণ্ণ জীবনশিল্পীর জবানবন্দি, যিনি তাঁর মানসকুটের তীক্ষ্ণ কাঁটাগুলিকে মাথার মুকুট করে অন্যমনস্ক — গভীর বিষাদের এক আশ্চর্য নীল চন্দ্রাতপের নীচে তাঁর অনুরাগী অনুরাগিনীদের সমবেত করতে উৎসুক — মিলন ও বিরহ, সাফল্য ও ব্যর্থতা, জন্ম ও মৃত্যু ইত্যাদির জ্যোতির্ময় সংঘর্ষের বিকীর্ণ উত্তাপে আমাদিগকে অগ্নিশুদ্ধ ক'রে তোলার সযত্ন ইচ্ছায় আতুর। কবিতামাত্রেই কবির অন্তরের ক্ষরণ — এ-সত্য বহুপরিজ্ঞাত; কিন্তু 'জার্নালে'র কবিতাগুলি, মনে হয়, আরও নীচের তলার ব্যাপার — কবির অন্তরেরও অন্তঃস্থলের ক্ষতের উন্মোচন।।

কথার ভেতর কথা — সঞ্জয় ভট্টাচার্য / নয়া উদ্যোগ, কলকাতা-৬ / মূল্য : ৩৫.০০।

সাহিত্যসাধক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ

গৌতম নিয়োগী

যে সব বাঙালি সাহিত্যসাধকের আজীবন প্রচেষ্টার ফলে সাহিত্যপিপাসু তথা ইতিহাসপ্রেমী বাঙালি বুধমণ্ডলী পারস্যের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, বিশেষত ফারসি-সাহিত্যের রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ আপনমনের মাধুরী মিশায়ে আত্মস্থ এবং উপভোগ করেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম অবিস্মরণীয় নাম মোহম্মদ বরকতুল্লা, যাঁর জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে প্রায় বছর তিনেক আগে। খুবই দুর্ভাগ্যের কথা, তাঁর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে কোনও গ্রন্থ দূরের কথা, প্রবন্ধ পর্যন্ত এই বাংলায় আমার চোখে পড়েনি, সেই কারণে প্রতিবেশী বাংলাদেশের ঢাকার প্রকাশন সংস্থা ইউনিভার্সিটি বুক কর্নার-প্রকাশিত অধ্যাপক ড. হাবিব রহমান-লিখিত 'মোহম্মর্দ বরকতুল্লাহ : জীবন ও সাহিত্যসাধনা' গ্রন্থখানি কিঞ্চিৎ বিলম্বে হলেও হাতে পেয়ে খুশি হয়েছি। তারপর গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করে এই খুশির মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ছ'টি অধ্যায়ে বিন্যাস্ত ক'রে লেখক তথ্যের প্রাচুর্যে এবং বিশ্লেষণের নিপুণতায় বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্যসাধকের জীবন ও সাধনার নানা বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। তিনি অবশ্যই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন।

গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা করার আগে তিনটি কথা উল্লেখ করতে চাই। ঢাকার বাংলা একাডেমী প্রথম মোহম্মদ বরকতুল্লার জীবনী প্রকাশ করেন ১৯৮৭-তে। তবে বাংলাদেশের লেখক-সমালোচকদের মধ্যে বরকতুল্লার সাহিত্যকর্ম নিয়ে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করেছিলেন প্রয়াত অধ্যাপক সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর বেশ কিছু লেখা ঢাকার নানা গ্রন্থে ও পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে বেরিয়েছিল। হাবিব রহমান পূর্বসূরি আলোচকদের রচনা ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছেন, কৃতজ্ঞচিত্তে করেছেনও। দ্বিতীয়ত, মোহম্মদ বরকতুল্লার একখানি গ্রন্থ — সম্ভবত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'পারস্য প্রতিভা' বহুদিন আগে ছাত্রজীবনে পড়েছিলাম, তাও মাত্র প্রথম খণ্ড। কারা প্রকাশক, কোথা থেকে ছাপা কিছুই আজ মনে নেই। তবে তাতে পারস্য সাহিত্য, ফিরদৌসী, ওমর খইয়াম, শেখ সাদী, হাফিজ, জালালুদ্দিন রুমী সম্পর্কে আলোচনা ছিল সেটুকু মনে আছে। প্রথম খণ্ড যখন, নিশ্চয়ই পড়েছি, দ্বিতীয় বা আরও খণ্ড বেরিয়ে থাকতে পারে, এমত ভাবনা এলেও পড়ার সুযোগ হয়নি। হাবিব রহমানের বই পড়ে জানতে পারলাম যে দ্বিতীয় খণ্ড বেরিয়েছিল। এমনকী অনেক পরে (১৯৬৪) অখণ্ড সংস্করণও বেরিয়েছিল। তৃতীয়ত, মোহম্মদ বরকতুল্লার সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে মুহম্মদ আবদুল হাই লিখেছেন : "বরকতুল্লার সাধনায় বাঙালি পাঠক পারস্যের ভুবনবিখ্যাত কবি ফেরদৌসী, আত্তার, রুমী, সাদী, হাফিজ ও ওমর খৈয়ামের সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছে। পারস্য সাহিত্যের ক্লাসিক সৌন্দর্য ক্লাসিকাল বাংলা পদ্যে বরকতুল্লাহ এমন সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন যে তাতে পারস্য সাহিত্যের রসও অপরিবর্তিত রয়েছে।" হাবিব রহমান এই মতকে যুক্তি, তথ্য, বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আসলে বাঙালি আজ বিস্মরণ ও অধঃপতনের যে স্তরে পৌঁছেছে, তাতে এমন কাজ দেখলেই ভাল লাগে। সুপরিচিতদের তবু মনে রাখি, স্বল্প পরিচিতদের ক্ষেত্রে তাও বলা যায় না। আজ সাধারণ বাঙালি কোন ছার, সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীরাই ক'জন সপ্তাবশতকের কবি কৃষ্ণকান্ত মজুমদারকে মনে রেখেছেন? তাঁর উপরও পারস্য সাহিত্যের কম প্রভাব ছিল নাকি? হাবিব রহমান না লিখলে মোহম্মদ বরকতুল্লাকেও আমরা ভুলে যেতাম। প্রথম অধ্যায়ে লেখক আলোচনা করেছেন মোহম্মদ বরকতুল্লার 'জীবন ও মানস-গঠন'। মোহম্মদ বরকতুল্লাহ তৎকালীন পূর্ববঙ্গের সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত ঘোড়শাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৮ এর ২ মার্চ। তখন অবশ্য সিরাজগঞ্জ আলাদা জেলা ছিল না। মেধাবী ছাত্র বরকতুল্লাহ ১৯১৪-তে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক, রাজশাহি কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই এ (১৯১৬) এবং ১৯১৮ তে দর্শনে অনার্স সহ দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক হন। পরে ১৯২০-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ এবং আইন পরীক্ষাতেও পাশ করেন। লেখক জীবনকথা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁর আলোচ্য 'পারস্য প্রতিভা পরিক্রমা'। কীভাবে বরকতুল্লাহ পারস্যের ন'জন কবি ও দু'জন দার্শনিকের জীবন কাহিনি ও তাঁদের সৃষ্টির অনবদ্য বিবরণ বাংলাভাষায় দিয়েছেন, লেখক তা বিশ্লেষণ করেছেন। বরকতুল্লার আর একটি গুণ যখনই সুযোগ হয়েছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা। তাও লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি। তৃতীয় অধ্যায়ে লেখকের উপজীব্য 'মানুষের ধর্ম : দর্শনের গহনলোকে'। মোহম্মদ বরকতুল্লার সুচিন্তিত গ্রন্থ 'মানুষের ধর্ম' বইয়ের পরিচয়। এই অধ্যায়টি আমাদের বিশেষ ভালও লেগেছে। চতুর্থ অধ্যায়ে লেখক বিশ্লেষণ করেছেন 'জীবনী ও ইতিহাস : ইসলামের আদিযুগ সন্ধান'।

তথ্যনিষ্ঠভাবে বরকতুল্লা ইসলামের ইতিহাস বিষয়ক যে-সব রচনা লিখেছেন তার বিচার। তেমনই পরের অধ্যায়ে বিচার্য ছিল 'প্রবন্ধ ও অভিভাষণ : প্রতিফলিত চিন্তাধারা'। শেষ অধ্যায়ে উপসংহার।

গুরুভার সরকারি কর্মশাসিত জীবন এবং ভগ্নস্বাস্থ্য মোহম্মদ বরকতুল্লাকে কোনও দিনই নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যচর্চার সুযোগ দেয়নি। তদুপরি লেখালেখির ব্যাপারে সরকারি তরফ থেকে এক সময় তাঁর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। তবু বৈদগ্ধ্যে ও বিষয়বৈচিত্রে মোহম্মদ বরকতুল্লা স্মরণীয়। যেমন ভাষাশিল্পী হিসাবেও বিশেষত বাংলায় ফারসি সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চায় তাঁর ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এমন একজন লেখকের সাহিত্যচর্চা বিশ্লেষণ করে হাবিব রহমান সাধু কর্তব্য পালন করলেন।

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ : জীবন ও সাহিত্যসাধনা — ড. হাবিব রহমান/ ইউনিভার্সিটি বুক কর্নার, ঢাকা/৬০.০০

অমনস্ক জাতি, অবলুপ্ত সম্পদ, উজ্জ্বল উদ্ধার

মধুময় পাল

বাংলা মঞ্চনাটকে গান প্রথমাবধি প্রতিপত্তিশালী। সংলাপের পাশাপাশি তার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান, নাট্যবিন্যাসে তার অপরিহার্য ভূমিকা। পশ্চিমের বাস্তববাদী নাট্যরীতির পথ ধরে বিকশিত হলেও বাংলা রঙ্গমঞ্চ একটি ক্ষেত্রে দেশীয় ঐতিহ্য এড়াতে পারেনি, বাঙালির আবহমান জীবনযাপনে সাঙ্গীতিক আবহটি মাথায় রাখতে হয়েছে প্রথম যুগের প্রযোজকদের। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রথম পুরুষ সঙ্গীতজ্ঞ রুশ নাগরিক গেরাসিম স্তেপানভিচ লিয়েবেদেফের 'কাল্পনিক সংবদল'-এর প্রথম অভিনয়-রজনীর প্রচারপত্রে লেখা হয়েছিল, 'বেলাতি আর বাঙ্গালি জলত্রের সহিত গিতবাদ্য হইবেক'/— শ্রীভারতচন্দ্র রায়ের কবিতা জলত্রের গান হইবেক।' সুদূর রাশিয়ার বেহালাবাদক বাংলা ভাষার প্রথম মঞ্চ প্রযোজনায় গানের দাবিতে বাংলার কবি ও গীতিকার ভারতচন্দ্র রায়ের সঙ্গে এক অর্থে যুগলবন্দি হলেন। প্রসঙ্গত, 'কাল্পনিক সংবদল' মঞ্চস্থ হয় ২৬ নভেম্বর, ১৮৯৫। আর, বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি ভারতচন্দ্র রায়ের জীবৎকাল ১৭১২ থেকে ১৭৬০। লিয়েবেদেফের পর বাংলা নাটক মঞ্চস্থ হতে সময় নিয়েছিল প্রায় চল্লিশ বছর। তখন বাংলায় কৃষ্ণযাত্রা, পাঁচালি, কবিগান, টপ্পার পাশাপাশি চলছে ইংরেজি থিয়েটার। ১৮৩৫-এ নবীনচন্দ্র বসুর উদ্যোগে অভিনীত হল প্রথম মৌলিক বাংলা নাটক 'বিদ্যাসুন্দর'। সেই ভারতচন্দ্র রায়। সেখানেও গান এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ অভিনয়ের পথ ধরে নবীনচন্দ্রের সমসাময়িক ও নিকট-দূরে অভিনীত হতে থাকে বিভিন্ন রচয়িতার রূপারোপে 'বিদ্যাসুন্দর'। শাস্ত্রীয় ও লঘু দুয়েরই মিশ্রণ ও ব্যবহারে, 'বিদ্যাসুন্দরে'র নাট্যপ্রযোজনায় গানই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার সুকুমার সেন লক্ষ করেছিলেন, 'বাঙ্গালা নাটকের গানের উদ্ভব প্রাচীন যাত্রা হইতে হয় নাই, সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটকের মিলিত আদর্শেই বাঙ্গালা নাটকের উৎপত্তি। কিন্তু একটি বিষয়ে বাঙ্গালা নাটক প্রাচীন যাত্রার কাছে ঋণী। বাঙ্গালা নাটকে গানের অপরিহার্যতা পুরানো যাত্রা হইতেই আসিয়াছে।' এই 'প্রাচীন যাত্রা' বা 'পুরানো যাত্রাকে'ই দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও সুনির্দিষ্ট, আরও সম্প্রসারিত করেছেন বাংলা রঙ্গমঞ্চে টপ্পা, পাঁচালি, কীর্তন, তর্জা প্রভৃতি লোকজ রীতির প্রভাবের ইতিহাস প্রণয়ন ও বিশ্লেষণ করে। দেবজিত্‌কে বাংলার নাটকের গানের মহাফেজখানা বললে অত্যুক্তি হয় না। দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টি নিয়ে তিনি কাজ করে চলেছেন। চলিত প্রয়োগে বলা যায়, বাংলা নাটকের গানে তিনি মাটি কামড়ে পড়ে আছেন। আমাদের উদাসীনতা, উপেক্ষা, আমাদের উন্নাসিকতা, বিস্মৃতিপ্রিয়তার যৌথ ইতিহাসে যে কয়েকজন আশ্চর্যজনকভাবে অন্যরকম থেকে গেছেন, দেবজিত্ তাঁদের অন্যতম। 'বাংলার মঞ্চগীতি'র 'আলাপ' থেকে দেবজিতের কাজের ভাবনার কথা উদ্ধৃত করা যেতে পারে : 'যাত্রাগানের পারম্পর্যে বাংলার নাট্যধারা বয়ে চলে শতকের পর শতক। আঠারো শতকের শেষে নাট্যচর্চার সেই ধারা মঞ্চে প্রবেশ করল উপনিবেশ সংস্কৃতির প্রভাবে। এল মঞ্চনাটকের যুগ। পরিবেশন-রীতি গেল বদলে। প্রকরণের অনেক কিছু বাতিল হলেও সাথি হয়ে গেল গান। সংলাপ পরিবর্ত সে গানের পরিচয় — থিয়েটারের গান বা মঞ্চগীতি। প্রান্ত-আঠারো শতকে মঞ্চের ঘেরাটোপে যে নাট্য ও গীত চর্চার শুরু সে চর্চা আজও বহমান। কিন্তু যথাযথ চর্যার অভাবে অবলুপ্তপ্রায় তার ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত। ভাষার সন্ধান মিললেও হারিয়ে যাচ্ছে সুরের বিন্যাস। ছন্দরূপ তালিয়ে যাচ্ছে বিস্মৃতির অতলে। তাই অতীত অতল থেকে আহারিত হয়েছে বহুবিচিত্র তথ্য। ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা বিচ্ছিন্ন সূত্রাবলীতে সাজানো হয়েছে মঞ্চগীতির চালচিত্র। .... কেমন ছিল সেদিনের মঞ্চদৃশ্য? আলোর সংকেত? নটনটীর সাজসজ্জা বা দর্শকদের বিচার? গীত সুরের সমারোহে সেই অতীত মঞ্চকে ছোঁয়ার চেষ্টা হয়েছে। প্রতিটি গীতাংশ আলোচনাকালে নাট্যের দৃশ্যায়ন, চরিত্রের উপস্থিতি, নাট্যকারের বয়ান, রাগতালের ব্যবহার ব্যাখ্যা — সমস্ত কিছুই মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে স্বীকৃত তথ্যের সাক্ষ্যে। মঞ্চায়িত প্রযোজনার সঙ্গে সহায়ক ভিন্নধর্মী প্রযোজনায় পূর্বাপর বিশ্লেষিত হয়েছে।' উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলেও আমরা নিরুপায়, আলোচ্য গ্রন্থে দেবজিতের কাজের এলাকা এতটাই বিস্তৃত, এতটাই জটিল তাঁর কাজের প্রকৃতি, আমাদের বিলুপ্ত 'টাইটানিক' উদ্ধারে তিনি এতটাই যত্নবান, কী গভীর ও নিবিড় শ্রম তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন, উত্তর-আধুনিক বাঙালি হিসাবে তিনি মাটি-সংলগ্ন থাকেন, সেটা বহুতর প্রশংসা করেও বোঝানো যাবে না। যদি কিছুটা আঁচ করা যায় এই ভেবে খোদ লেখকের কথা তুলে দেওয়া গেল। বাংলা নাটকের গান নিয়ে দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়মিত অনুষ্ঠান করেন, সেমিনারে বলেন, দৈনন্দিন সুধীজনকে অবহিত করেন। এই কাজ শুধু ওঁর স্বপ্ন নয়, অস্তিত্বে জড়িয়ে গেছে। ওঁর ভাষায়, 'এ শুধু অলস কাগজঘাঁটা নয়, আবহমান ঐতিহ্যের মানসসন্ধান, প্রবহমান অস্তিত্বের জীবনদর্পণ'।

'বাংলার মঞ্চগীতি' গ্রন্থে আদিপর্বের প্রথম আট দশকে মঞ্চায়িত প্রতিটি নাটকের প্রতিটি গানের প্রয়োগভিত্তিক ইতিহাস প্রণীত হয়েছে। কালসীমা ১৭৯৫ থেকে ১৮৭২। এই পর্বে মঞ্চস্থ, ৩৫টি নাটক কালানুক্রমে আলোচিত এবং বিভিন্ন পালাকার ও দলের 'বিদ্যাসুন্দর' আলোচনা প্রসঙ্গে বিশদে গোপাল উড়ের কথা বলা হয়েছে। দেবজিত্ লিখেছেন, 'সঙ্গীতে, নাটকে, সর্বোপরি মঞ্চনাটকে গানের ব্যবহারে গোপাল উড়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব সমসাময়িক কালে তো বটেই, পরবর্তীকালেও দীর্ঘ সময় জুড়ে ব্যাপ্ত ছিল।'

'মঞ্চগীতির চালচিত্র' সাজাতে গিয়ে লেখক প্রতিটি মঞ্চাভিনয়ের পূর্বকথা, প্রেক্ষিত, তৎকালীন সামাজিক ঘটনা, কুশীলবদের কথা, নাটকের বিষয়, গানের প্রকৃতি, রাগ-রাগিণীর ব্যবহার এবং অভিনয় সম্পর্কে তদানীন্তন মূল্যায়ন ইত্যাদি অনুপুঙ্খে আহরণ করেছেন। নমুনা হিসাবে একটি আলোচনার সার উদ্ধৃত করা হল। নাটকটি দীনবন্ধু মিত্রর 'সধবার একাদশী'। এটি প্রথম মঞ্চস্থ করে বাগবাজার এমেচার থিয়েটার, ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে সপ্তমী পূজার রাতে, বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখুজ্যের পাড়ায় প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে। বাগবাজার এমেচার থিয়েটার তৈরির ইতিহাস জানিয়েছেন লেখক। বাজনার দলে 'আমোদের ক্ষুধা' পরিতৃপ্ত না হওয়ায় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাজনার দল থেকে লোক সংগ্রহ করে থিয়েটারের দল খুললেন। ধর্মদাস সুর, রাধামাধব কর, মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আপাল বিশ্বাস, ঈশানচন্দ্র নিয়োগী, অরুণচন্দ্র হালদার, মহেন্দ্রনাথ দাস, নগেন্দ্রনাথ পাল, নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ এই দলে যোগ দিলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষকেও নগেন্দ্রনাথ এই দলে আহ্বান করলেন। নাট্যশালার সঙ্গে এই প্রথম গিরিশচন্দ্রের সম্পর্ক স্থাপিত হল। রাজা-রানি সাজার পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যয়ভার বহনের অসুবিধা বুঝে সে-ধরনের নাটকে হাত দেওয়া হয়নি। গিরিশবাবুর পরামর্শে দীনবন্ধু মিত্রর নব প্রকাশিত 'সধবার একাদশী' অভিনয় করা স্থির হল। এরপর অভিনেতা নির্বাচন। নিমচাঁদ চরিত্রের জন্য নির্বাচিত হন গিরিশচন্দ্র। একদিন মহড়া দেখতে এসে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি নাটকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। তিনি কয়েকজন অভিনেতাকে রদবদল করেন এবং নিজে কেনারামের দায়িত্ব নেন। এরপর প্রথম রজনীর অভিনেতৃদের তালিকা। রাজেন্দ্রনাথ নিয়োগীর একতাল-বাদনের দলকে বাজানোর আমন্ত্রণ জানানো হল। 'কিন্তু এই রাত্রিতে কতিপয় অভিনেতা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ায় অভিনয় ভাল হয় নাই।' এরপর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অভিনয়ের খবর। চতুর্থ অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। গিরিশচন্দ্রকে তিনি বলেন, 'তুমি না থাকিলে এ নাটক অভিনয় হইত না। নিমচাঁদ যেন তোমার জন্যই লেখা হইয়াছিল।' পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অভিনয়ের খবর দেওয়ার পর আলোচক চলে আসেন নাট্যবিষয়ে। নাটকের বিকাশে গানের মূল্য ও গানগুলির সুরবৈচিত্র নিয়ে আলোচনা করেন। সঙ্গীতগুণী দেবজিতের অসাধারণত্ব এখানেই। আলোচনা শেষ হয় দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র ঘোষের অবিস্মরণীয় উক্তি উদ্ধৃত করে : 'মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এইসকল যুবক মিলিয়া "ন্যাশনাল থিয়েটার" স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়-স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।' প্রসঙ্গত, বাগবাজার এমেচার থিয়েটার পরবর্তীকালে কলকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে পরিণত হয়।

এভাবেই দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা নাটকের কল্পনাঋদ্ধ প্রেরণা-দীপ্ত স্বপ্নপ্রাণিত তিতিক্ষাপূর্ণ সৃষ্টিমুখর ঐতিহাসিক সময়কে তুলে ধরেন। অপরিমেয় বৈভবপূর্ণ নাট্যগীতির খনির মানচিত্র প্রকাশ করেন। বাঙালিকে তার হিরন্ময় উত্তরাধিকার সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করেন। প্রকৃত অর্থে বাঙালির জাগরণের পক্ষে এটি একটি মূল্যবান কাজ। আত্মবিস্মৃত রাজনীতিতাড়িত ও প্রতারিত প্রচারপীড়িত বাঙালি যদি তার বিলুপ্ত সম্পদের উজ্জ্বল উদ্ধারে এতটুকু সচেতন হয়, তাতেই দেবজিতের অমেয় শ্রমের সার্থকতা।

বাংলার মঞ্চগীতি (১৭৯৫-১৮৭২) — দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়/সুবর্ণরেখা, কলকাতা-৯/২৫০.০০

প্রসঙ্গ পঞ্চপ্রিয়তা

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাগীতি। সেখানে একেবারে প্রথম গীতিতেই লুইপাদের রচনায় পাই : কাআ তরুবর পঞ্চ-বি ডাল/ চঞ্চল চীএ পইঠো কাল। (অস্যার্থ–কায়া হল তরুবর, তার পাঁচটি ডাল প্রবিষ্ট হয়েছে চঞ্চল চিত্তে)। এই 'পঞ্চ-বি ডাল' আসলে পাঁচটি ইন্দ্রিয়।

আবার, বাংলা ব্যাকরণ পদসংখ্যা পাঁচ — বিশেষ্য সর্বনাম বিশেষণ ক্রিয়া অব্যয়।

এইভাবে পাঁচ আমাদের আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে। জগৎসংসারে পাঁচের এই প্রাধান্য নিয়ে অসিত দত্ত একটি স্বল্পায়তনের গ্রন্থ রচনা করে ফেলেছেন। 'পঞ্চতত্ত্ব' নামে সেই গ্রন্থের উপনাম দেওয়া হয়েছে 'পঞ্চ ঘটিত বাংলা অভিধান শব্দকোষ'। একটু বিভ্রান্তিকর এই উপনাম। সংস্কৃত পুরাণ ও শাস্ত্র ঘেঁটে এবং লৌকিক জীবন থেকে নানা উপাদান সংগ্রহ করে পাঁচ-সম্পর্কিত বহু শব্দদ্বন্দ্ব নিয়ে বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে। বইটি অভিধান বা শব্দকোষ জাতীয় নয়, আসলে সরস প্রবন্ধ ওরফে রম্যরচনা। এবং লেখার ধরনও বেশ আলগা। এমনকী গ্রন্থশেষে সাড়ে চারশোর মতো শব্দের যে সূচি বিন্যস্ত হয়েছে সেটিও ঠিক ঠিক অভিধানসম্মত নয়।

তবে, বলতেই হবে, বইটি সুপাঠ্য। অনেক জিনিসই জানা হয়ে যায় এই বই-এর পাতায় চোখ বুলিয়ে। ধরা যাক 'পাঞ্চজন্য'-র কথা। কুরুক্ষেত্রের মহাসমর শুরু হয়েছিল ওই শঙ্খের নির্ঘোষে। কিন্তু ওই শাঁখটির বৈশিষ্ট্য কী তা অসিতবাবু বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এক অসুরের নাম পঞ্চজন, সে ছিল হিরণ্যকশিপুর পৌত্র। এই পঞ্চজন এক শঙ্খের রূপ ধরে বাস করত সমুদ্রগর্ভে। শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাগুরু সান্দীপনী মুনির পুত্র একদিন যখন প্রভাসতীর্থে স্নান করতে নেমেছেন তখন সেই অসুর তাকে ধরে নিয়ে জলের তলায় লুকিয়ে রাখে। এটা জানতে পেরে সান্দীপনী তার শিষ্যকে আদেশ দিলেন পুত্রকে উদ্ধার করার মধ্য দিয়ে গুরুদক্ষিণা দিতে। ফলে কৃষ্ণের দ্বারা ওই অসুরের বিনাশ হল। পঞ্চজনের অস্থি দিয়ে তৈরি যে-শাঁখ তারই নাম পাঞ্চজন্য।

আবার, পেঁচোয় পাওয়া-র মধ্যে যে-পাঁচ নিহিত আছে তারও ব্যাখ্যা মিলবে এই বই-এ। আসলে পঞ্চানন ঠাকুর বলে অপদেবতাটি অপভ্রংশে পঞ্চু থেকে পঞ্চা হয়ে পাঁচু-তে পরিণত হয়, তার থেকে পেঁচো-য়। আতুড়ঘরে নবজাতকের তড়কা রোগকে বলে পেঁচোয় পাওয়া। এটা আসলে খনুষ্টংকার রোগ।

লেখক প্রসঙ্গক্রমে ইসলামধর্মীয়দের পঞ্চপ্রিয়তারও কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়েছেন। যেমন নামাজ পড়তে হয় পাঁচ ওয়াক্ত বা পাঁচ বেলা। এই পাঁচ বেলা হল ফজর (সকাল) জোহর (দুপুর) অসর (বিকেল) মগরিব (সন্ধে) আর এসা (রাত্তির)। এ ছাড়া ধর্মভীরু মুসলমানদের আছে পাঁচ ফর্জ বা দায়িত্ব — কলেমা নামাজ রোজ হজ আর জাকাত। ইসলাম ধর্মে আছে পাঁচটি সাংকেতিক অক্ষর, সেগুলি হল : আঃ আলাইস সালাম (অর্থাৎ তাঁর ওপর আল্লার শান্তি বর্ষিত হোক), দঃ (দরূদ), সাঃ (সাল্লাল্লাহু আলাইস সালাম অর্থাৎ তার উপর আল্লার শান্তি বর্ষিত হোক), রঃ (রহমতুল্লাহ আলাইহে অর্থাৎ তাঁর উপর আল্লার শান্তি বর্ষিত হোক) আর রাঃ (রাজা আল্লাহঅমহ অর্থাৎ তার উপর আল্লা সন্তুষ্ট)।

শিখদের আছে পাঁচটি অঙ্গভূষণ — কৃপাণ, কেশ, কাঙ্গি, কঙ্কণ আর কচ্ছ।

অসিতবাবু পেশায় চিকিৎসক হলেও লেখালেখি নিয়ে থাকেন। আলোচ্য গ্রন্থের শুরুতেই তাঁর রচিত নানা বই এবং সম্পাদিত পত্রিকার তালিকা গ্রথিত আছে। তদুপরি তিনি হুগলি জেলার শ্রীরামপুরের বাসিন্দা। তাই পঞ্চতরঙ্গে হরফ শিল্পী পঞ্চানন কর্মকার বা পাঁচুকামারের প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। ভারতীয় মুদ্রণশিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা এখানে পাওয়া যায়।

এমনইভাবেই রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' আলোচনা করতে গিয়ে বেশ কিছুটা জায়গা দেওয়া হয়েছে আড্ডার উপকারিতা আর রমণীপ্রসঙ্গ নিয়ে। সম্প্রতি পোখরানে ভারত যে-পাঁচটি পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ করে তা নিয়ে বেশ বাগবিস্তার আছে। শারদীয় দুর্গোৎসব বা অকালবোধনের কাহিনিও সবিস্তারে লেখা হয়েছে। পঞ্চাঙ্গ বা পঞ্জিকার কথা বলতেও অনেকটা জায়গা নেওয়া হয়েছে।

মৎস্যকুলে নাকি পাঁচটি নিরামিষ আছে বলে সংস্কৃত এক উদ্ভট শ্লোকে বলা হয়েছে। এরা হল, ইলিশ শিঙি মাগুর কই আর খলশে। এই বিষয়টি উল্লেখ করে লেখক ইলিশ নিয়ে অনেক কথা বলেছেন, এমনকী একটি রবীন্দ্রসংগীতের প্যারডিও বানিয়েছেন। তবে 'আমি চিনি গো চিনি তোমাকে ওগো বিদেশিনী' গানটি একটি বিদেশী ফুলকে উদ্দেশ্য করে রচিত বলে লেখক দাবি করলেও তা মানা যায় না। কেননা জীবনস্মৃতি গ্রন্থে 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ' অধ্যায়ে কবির সাক্ষ্য এই রকম : 'বহু-বাল্যকালে একটা গান শুনিয়াছিলাম, "তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে।" সেই গানের ওই একটিমাত্র পদ মনে এমন একটি অপরূপ চিত্র

আঁকিয়া দিয়াছিল যে, আজও ওই লাইনটা মনের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া বেড়ায়। একদিন ওই গানের ওই পদটার মোহে আমিও একটি গান লিখিতে বসিয়াছিলাম। গুরুগুঞ্জনের সঙ্গে প্রথম লাইনটা লিখিয়াছিলাম, "আমি চিনি গো চিনি, তোমারে, ওগো বিদেশিনী" — সঙ্গে যদি সুরটুকু না থাকিত তবে এ গানের কী ভাব দাঁড়াইত বলিতে পারি না। কিন্তু ওই সুরের মন্ত্রগুণে বিদেশিনীর এক অপরূপ মূর্তি মনে জাগিয়া উঠিল।....'

লেখক এই বই-এ প্রচুর পঞ্চ প্রসঙ্গের উল্লেখ করলেন বর্তমান আলোচনার প্রথম দুই অনুচ্ছেদে যে-দুটি পাঁচের কথা বলা হয়েছে তা কিন্তু তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে।

যাই হোক, গ্রন্থটি সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন করবে। বেশির ভাগ বাংলা বইয়ের মতন এখানেও অনিবার্যভাবে প্রচুর মুদ্রণপ্রমাদ জায়গা করে নিয়েছে।

পঞ্চতরঙ্গ — অসিত দত্ত / ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা-৯/ মূল্য ৪০.০০।

জাহান আরা সিদ্দিকীর তিনখানি উপন্যাস

মীনাক্ষী ঘোষ

প্রতিবেশী দেশের লেখিকা জাহান আরা সিদ্দিকীর তিনখানি উপন্যাসের প্রত্যেকটিতেই নর-নারীর বিবাহ-অতিরিক্ত সম্বন্ধ প্রাধান্য পেয়েছে। পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে নারীরা কীরকম ব্যবহার করতে পারে তা খুব নৈপুণ্যের সঙ্গে দেখিয়েছেন লেখিকা। পুরুষ চরিত্রগুলি বরং অতটা যত্ন পায়নি। বইগুলি পড়লেই বোঝা যায় নারীর লেখা। যদিও 'উত্তল-অবতল' এবং 'প্রদোষকাল' উপন্যাস দুটিই পুরুষ কলমের বিবৃতি। 'অন্তর্দীপ' এর মূল বক্তা নারী হলেও সে মোটামুটি শ্রোতার ভূমিকাতেই রয়ে গেছে এবং মূল কাহিনিকার তার পুরুষ বন্ধুই। অর্থাৎ তিনটি বইতেই নারীকে দেখানো হচ্ছে পুরুষের চোখ দিয়ে। এ ব্যাপারে পুরুষ দৃষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধতা স্বাভাবিক এবং এই সীমাবদ্ধতাকে ভারি চমৎকার ভাবে রূপ দিয়েছেন জাহান আরা।

'প্রদোষকাল'-এর মূল বক্তাপুরুষ নারীকে বোঝে না, ক্রমশ আবিষ্কার করে — 'এই সে কন্যা ভালোবাসার সম্পর্ক যার কাছে ছিল মুখ্য, যে শুধুই নিরাপত্তার খাতিরে এতটা বহুল আপোষ করতে চায়নি। আজ সে কেমন করে অন্য ভাষায় কথা বলছে! তার কথাবার্তায় একজন আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর নারীর হাবভাব ফুটে উঠছে!' (পৃ:- ১৩৯)। এই না বোঝা ক্ষোভ 'অন্তর্দীপ' এর নায়কের মধ্যেও স্পষ্ট। নারীপুরুষের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারী চরিত্রগুলির মধ্যে বৈচিত্র দেখা গেলেও পুরুষগুলি কিন্তু মোটামুটি একই রকম। কামুক-টাইপ। অবৈধ সম্পর্ক কেন্দ্রিকতায় তাদের কোনওরকম মহত্ত্ব দেখা যায়নি।

'উত্তল-অবতল' উপন্যাসটিতে রহস্য বিন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে স্বামীর অবৈধ সন্তান এবং সেও একটি নারী। পিতাপুত্রীর সম্পর্ককে দারোয়ান, অফিসের কর্মীরা, পত্নী প্রভৃতি সকলেই আগাগোড়া বিকৃত দেখেছে যার ফলে পত্নীর হাতে স্বামী খুন হল। বয়সের পার্থক্য এবং পারস্পরিক ব্যবহার দেখেছে যারা, তারাও বিচারশূন্য ভাবে ভুলই করে গেছে। এই ভ্রান্তি খুব স্বাভাবিক মনে হয়নি বটে তবে গল্পটি বেশ জমাট হয়েছে। বিশেষত সিনেমার চিত্রনাট্য হিসাবে খুবই গ্রহণযোগ্য।

বই তিনটির কোনও খানে উপন্যাস শিরোনামা না থাকলেও চেহারা দেখে উপন্যাসই মনে হয়। কিন্তু পড়লে বোঝা যায় গল্পের স্বভাব এতে বেশি স্পষ্ট। বইগুলি জীবনের একটি বিশেষ দিক নিয়েই লেখা। চরিত্রগুলির সম্পূর্ণতা বা সমসাময়িক দেশ কালের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে লেখিকা বিশেষ একটি স্রোতে কাহিনিকে গতি দিয়েছেন। ছোট গল্পের মতো এসব কাহিনি এত একান্ত একমুখী যে অফিসে সর্বক্ষণ অফিসাররা নর-নারীর সম্পর্ক চর্চা করছেন, যেটি কাহিনির মূল বিষয়। উদাহরণ স্বরূপ 'প্রদোষকাল' উপন্যাসের তৃতীয় অধ্যায়টি স্মরণ করা যেতে পারে যার দৃশ্যপট — অফিসরুম এবং চরিত্র — দুটি পুরুষ, একটি নারী।

উপন্যাসগুলিতে অবৈধ প্রেম কেবল কেন্দ্রীয় বিষয় নয়। পার্শ্বচরিত্রগুলি — বাবা, মা, খালা, বন্ধু, প্রতিবেশী ইত্যাদিরাও অবৈধ প্রণয়ের পরিপ্রেক্ষিতে হাজির হয়েছেন। কোনও সন্দেহ নেই গণ্ডির বাইরে ননরারীর সম্পর্ক একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয় এবং বিষয়টিকে লেখিকা বেশ নৈপুণ্যের সঙ্গে খেলিয়েছেন; তবে তিনখানিও বিষয়ক বই পড়ার পর লেখিকার অন্যান্য বিষয়ে লেখা গল্প পাঠের জন্য প্রত্যাশা জন্মায়। নাটকীয় কেন্দ্র-নারীচরিত্রগুলি জাহান আরার বইগুলিকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। তিনটি উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাসে বৈচিত্র আছে তবে প্রকাশভঙ্গি আর একটু টান টান হলে পাঠকের মনোযোগ গভীরতর হতে পারত।

প্রদোষকাল — জাহান আরা সিদ্দিকী/দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা-১১০০/১০০.০০।

উত্তল-অবতল — জাহান আরা সিদ্দিকী/দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা-১১০০/১০০.০০।

অন্তর্দীপ — জাহান আরা সিদ্দিকী/দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা-১১০০/১০০.০০

কত কাছের অথচ কত দূরের

ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

... and out of the strong came forth sweetness (Judges 14 : 14)

"কমল-হীরের পাথর থেকে যে আলো এসে পৌঁছবার কথা বলেছিলেন, সেই আলোর আভাস (শঙ্খ ঘোষ), সৌম্য প্রসন্নতা (শিবনারায়ণ রায়), ব্যবহারে, কাজে, প্রকাশভঙ্গিমায় যথার্থভাবে রবীন্দ্র মননের অধিকারিণী (শুভাপ্রসন্ন) শান্ত, স্নিগ্ধ মূর্তি (জাহানারা বেগম), অনাবিল অশর্ত স্নেহ .... মাতৃময়ী রূপ (স্বপন মজুমদার) স্মরণে এলেই এই অধমের কাঙাল হৃদয় উদ্বেলিত হয়, দুই চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হয়, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে .... এসব সূক্ষ্ম স্নেহস্পর্শের যে আনন্দানুভূতি তা ব্যক্ত করার ভাষা আমার আয়ত্তে নেই। (আবদুর রউফ)

প্রায় আড়াইশো পাতার বইয়ের প্রথম আশি পাতার মধ্যেই এতবার সেই একই কথা ঘুরে-ফিরে। তার পরেও অজস্রধারে ঝরে পড়ছে সেই একই সঙ্গীত। বড় ভাল বলেছেন অপূর্ব বিশ্বাস "এই প্রচারসর্বস্ব কোলাহলে গৌরী আইয়ুব খুব সন্তর্পণে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন তাঁর প্রাণের প্রদীপটি, যার শিখায় সৌজন্য, সততা আর মানবিকতা আলো ছড়ায়। যার উত্তাপটুকু নিয়ে এখনো জীবনকে ভালবেসে বলতে পারি — "মধুর তোমার শেষ যে না পাই।"

সৌজন্য ও সততায় পরে আসছি। প্রথমে বলি মানবিকতার কথা। ওই অতিশয় অস্পষ্ট ধারণাটির সঙ্গে বিশ্বজনীনতার একটা ভাব যুক্ত হয়ে বিশ্বমানবিকতা নামক একটি বায়বীয় বস্তু সৃষ্টি হল, এবং তার ফলে সমগ্র ব্যাপারটি আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেল। যিশুখ্রিস্ট বিশ্বমানবকে ভালবাসতে বলেননি, বলেছেন, "Thou shalt love thy neighbour as thyself". (Matt : 19 : 19) মানুষ নামক বিমূর্ত কল্পনাকে ভালবাসা, কিংবা (যেহেতু সে ভালবাসাও একটা কল্পনা) ভালবাসি মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়, কিন্তু নানা দোষত্রুটি সম্বলিত সত্যিকারের মানুষকে, বিশেষত সে যদি প্রতিবেশী হয়, তাকে ভালবাসা মুখের কথা নয়। সে যে পারে সে পারে, যে পারে না সে পারে না। মনোজ দত্ত লিখেছেন, (আমরাও দেখেছি, এমন কী আমি নিজেও যতটুকু তাঁর সান্নিধ্যে আসতে পেরেছি তাঁর মধ্যে তাঁর সেই অহৈতুকী দাক্ষিণ্যের ধারায় স্নিগ্ধ হয়েছি) "এত সব জ্ঞান-বিচারের সঙ্গে সঙ্গে গৌরীদির মধ্যে ছিল সকলের জন্য ভালোবাসা। তাই তাঁর বাসায় শিল্পপতি-বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে মনার মা বা দূর গাঁয়ের অর্ধশিক্ষিত মানুষ একইভাবে সমাদর পেতেন।"

নানা জনে নানা কথা বলেছেন। শিবনারায়ণ রায় তাঁর "অনুশীলিত মনের সামর্থ্যের উল্লেখ করেছেন, এবং সেই সঙ্গে দিয়েছেন তাঁর দুর্মর নীতিনিষ্ঠা ও নির্ভিক ব্যক্তিত্বের পরিচয়। (এর মধ্যে অনেকটা যে তাঁর পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার তাতে কোনও সন্দেহ থাকে না। বাবার সঙ্গে তাঁর সংঘাত এই বইয়ে, আমাদের চোখের সামনে প্রায় একটি এপিক মহত্ত্ব লাভ করে। নিরঞ্জন হালদার শুনিয়েছেন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সময়ে যেভাবে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন সে কথা। তা ছাড়া আবু সৈয়দ আয়ুব এবং গৌরী আয়ুবের দাম্পত্যকাহিনি তো একটি অলিখিত মহাকাব্য। (সে আর কোনদিন লেখা হবে কি না সন্দেহ) সে কথাও কেউ কেউ বলেছেন।

কিন্তু সর্বক্ষণ মনের মধ্যে যে কথাটি বেজে যায় সেটি হল, "out of the strength" । ভিতরে শক্তি ছিল বলেই সেই অক্ষম দেহেও এত ভালবাসা, এত সেবাপরায়ণতা, এত মাধুর্য সম্ভব হয়েছিল। তাঁর এই মানবিকতা কত সত্য ছিল, কত বাস্তব ছিল, তার একটি চিত্র এঁকেছেন স্বপন মজুমদার : "মেশার ব্যাপারে আইয়ুব যেমন ছিলেন অতিবিচারী, গৌরীদি তেমন ছিলেন না। কোনও বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে, আইয়ুব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন তীক্ষ্ণ বিচারে। হঠাৎ কারও আগমন ঘটল, আইয়ুব সম্পূর্ণ স্তিমিত হয়ে যেতেন, যদি অভ্যাগতকে তিনি সে আলোচনার অংশী না মনে করতেন। গৌরীদির কোনও প্রিয়জনের বিষয়েও আইয়ুবের যে তেমন মনে হত না তা নয়। সেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে গৌরীদিকে দেখেছি কী মাধুর্যে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে যাতে তাঁরা বেদনা বোধ না করেন।

এ শুধু বাইরের লোক-দেখানো সৌজন্য নয়, তা যদি হত তা হলে সততার ছবিটি এই স্মরণগ্রন্থে অত ভাস্বর হয়ে উঠত না। স্বপন মজুমদারই লিখেছেন, "কিন্তু যদি আদর্শগত কোনও প্রশ্নে বা কারণে কোনও ব্যক্তিকে সততায় ঊন বলে মনে হত তাঁর, গৌরীদির প্রতিরোধ হয়ে উঠত পর্বতপ্রমাণ।"

ঠিক একই কথা না হলেও, প্রায় একই ধরনের কথা অনেকেই বলেছেন। অতীন্দ্রমোহন গুণ যে তালিকাটি দিয়েছেন গৌরী আয়ুবের বিনিদ্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের, সেটি থেকেই বোঝা যায় কোন কোন কথা বারে বারে ঘুরে এসেছে, এবং সেই-সব কথা বারে বারে শুনেও ক্লান্তি আসবার নয় : "ঋজুতা, সংবেদনশীলতা, জীবন যাপনে শৃঙ্খলার সঙ্গে সারল্য, মৃদুভাষিতা, সঙ্কল্পে অবিচলতা এবং মননশীলতা।"

এই সমস্ত গুণের একত্র সমাবেশ এতই দুর্লভ, যে মনে হয় যেন এ কোনও অজানা গ্রহের একজন আগন্তুকের কথা শুনেছি। অথচ তিনি আমাদের কত কাছের মানুষ ছিলেন।

কত কাছের, অথচ কত দূরের।

কৃতজ্ঞতার অশ্রুবিন্দু — সম্পাদনা মীরাতুন নাহার/ দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩/১৫০.০০

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

প্রসঙ্গ অমিয়ভূষণ

শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত 'বৈতানিক'-এর তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি প্রয়াত কথাশিল্পী অমিয়ভূষণ মজুমদারকে নিয়ে। নজরকাড়া প্রচ্ছদ তথা ভাল কাগজে সুমুদ্রিত পত্রিকাটিকে প্রথম দর্শনেই হাতে তুলে নিতে ইচ্ছে করে। সূচিপত্রের আগ্রহ উদ্রেককারী লেখক তালিকায় অশ্রুকুমার সিকদার, দেবেশ রায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, অরুণেশ ঘোষ, তপোধীর ভট্টাচার্য প্রমুখের পাশে রয়েছেন অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত লেখকবৃন্দ। স্বয়ং অমিয়ভূষণের একটি প্রবন্ধ, একটি ছোট নাটক ও একটি সংক্ষেপিত সাক্ষাৎকার এই সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ।

তিনি লেখক হিসাবে স্রোতের বিরুদ্ধে চলতেই ভালবেসেছেন। স্পষ্টবাদী, আত্মসচেতন, প্রতিষ্ঠানবিরোধী, অহঙ্কারী অভিধায় ভূষিত হয়েছেন জীবৎকালেই। বড় কাগজে না লিখে, রাজধানী থেকে বহুদূরে বাস করেও বাংলা কথাসাহিত্যে একটি পরম শ্রদ্ধেয় অবস্থান তাঁর। জীবিতকালেই তিনি পাঠক-সমালোচক-সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তার প্রমাণ সন্দীপ দত্ত কৃত 'পত্রপত্রিকায় অমিয়ভূষণ' শীর্ষক তালিকায়। আশ্চর্যের কথা এখানেও প্রাধান্য ছোট কাগজ। তা হলে লেখকের অভিমান না প্রতিষ্ঠানের উদাসীনতা কোনটি আসল কারণ? এখন এসব আলোচনাও নিরর্থক। মৃত্যুর পর লেখকের অবদান নিয়ে নানান পন্ডিতি বিশ্লেষণের মধ্যে প্রধানত শ্রদ্ধার বিভূতিই বিকীরিত হয়। বস্তুত 'বৈতানিক'-এর এই সংখ্যাটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

দশ ফর্মার এই সংখ্যা ছ'টি পর্বে বিভক্ত। কেন? সম্পাদকীয়তে তার কৈফিয়ত নেই। তবে অমিয়ভূষণের প্রবন্ধ ও নাটকটি নিয়ে আলাদা একটি পর্ব হতে পারত কিংবা চতুর্থ পর্বে জায়গা করে দেওয়া যেত অনায়াসে। পবিত্র দাস অমিয়ভূষণের একটি অজানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে আমরা পাই একজন চিত্রকরকে যিনি তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের অবসানে সাহিত্য রচনার ফাঁকে ফাঁকে সুদীর্ঘ দু'দশক ধরে অর্জন করেছেন অঙ্কনবিদ্যার করণকৌশল। আলোচকদের কেন্দ্রবিন্দু কখনও 'গড় শ্রীখণ্ড', কখনও বা 'মহিষকুড়ার উপকথা', কখনও 'দুখিয়ার কুঠি', 'রাজনগর'। 'অতি বিরল প্রজাতি' নিয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন অমিতাভ দাশগুপ্ত। নাট্যকার অমিয়ভূষণের 'বিয়োগ' নাটকের চমৎকার আলোচনা করেছেন পুলিন দাস। 'মহাসত্ত্ব' নাটকটি নিয়ে মেঘ মুখোপাধ্যায়ের আলেচনাটিও চিত্তাকর্ষক। বাংলার নাট্য নির্দেশকদের এ-নাটকের মঞ্চায়নের জন্য যে প্রস্তাব তিনি দিয়েছেন তার সঙ্গে আমি একমত।

বরেন্দু মণ্ডল অমিয়ভূষণের সাক্ষাৎকারকে ভিত্তি করে লেখকের আত্মকথার এক সুন্দর উপাখ্যান তৈরি করেছেন। বস্তুত এই ধরনের সংখ্যায় জীবনীপঞ্জি থাকার যে উপযোগিতা তা এই লেখাতেই বিদ্যমান তবে এই সংখ্যাতে লেখকের একটি কালানুক্রমিক রচনাপঞ্জি থাকলে ভাল হত। অনেকের লেখাতেই লেখকের অনেক লেখার উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্যতিক্রম অনুষ্টুপ প্রকাশিত 'ম্যাকডাফ' সাহেব ও অন্যান্য গল্প'।

সম্পাদনা : গৌতম রায়

সুশীল সাহা

উত্তরণের গল্প

ঔপন্যাসিক আর গল্পকারদের কল্যাণে বাংলাসাহিত্যে আজ একটি পরিচিত নাম জলপাইগুড়ি। 'উত্তরণ' উপন্যাসে লেখিকা পূরবী দত্তও পটভূমিকা হিসাবে বেছে নিয়েছেন উত্তরবঙ্গের এই পুরনো শহরটিকেই। প্রাক-স্বাধীন এবং স্বাধীনতা-উত্তর মফঃস্বল শহরের সামাজিক পটভূমিকায় কাহিনির বিন্যাস। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র দেবী। কৈশোর থেকে তারুণ্যে পৌঁছনো দেবীর অভিজ্ঞতার আয়নায় ধরা পড়েছে পুরুষশাসিত সমাজের রূপ। 'নিবেদন' অংশে লেখিকা বলেছেন ' এ এক সময়ের সন্ধিক্ষণ .... যেখানে এক কিশোরী তার বেড়ে ওঠার মুহূর্তকে অনুভব করে পুরুষশাসিত সমাজে, খুঁজে পায় তার পূর্ণ অস্তিত্ব।' চারিত্রিক-পার্থক্য থাকলেও, দেবীর বাবা শান্তিনাথ এবং দিলুদার মতো চরিত্রগুলি এক অর্থে পুরুষ শাসিত সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করে। অন্যদিকে আছে তরুবালা, খালেদাপিসি, ইস্কুলের বড় দিদিমণি, অন্নদাসুন্দরী বা বান্ধবী শিউলির মতো চরিত্র।

ঘটনাসূত্রে এসেছে ছেচল্লিশের দাঙ্গার কথা। আর এসেছে জলপাইগুড়িতে স্বাধীনতা উত্তর পঞ্চাশের দাঙ্গার বর্ণনা। বাংলার সমাজজীবনে দেশভাগ আর দাঙ্গা একটি নির্মম বাস্তব হলেও, বাংলা সাহিত্য কিন্তু আশ্চর্যভাবে সে সম্পর্কে নীরব। এতবড় এক রক্তাক্ত ইতিহাসের ছায়া কদাচিৎ পড়েছে আমাদের সাহিত্যে। এ উপন্যাসে সংক্ষিপ্তভাবে হলেও ১৯৫০ সালের সেই দাঙ্গার (স্থানীয় উচ্চারণে 'রায়ট') ছবি তুলে ধরেছেন লেখিকা। সে দিক থেকে অবশ্যই সাধুবাদ প্রাপ্য তাঁর। সাম্প্রদায়িক বিভেদে কেমন করে এক লহমায় পাল্টে যায় আজন্মলালিত বন্ধুত্ব — দেবী এবং তার বান্ধবী হাসিনার মাধ্যমে সেই সত্যকেই তুলে ধরেছেন লেখিকা। উত্তরবঙ্গে, বিশেষত জলপাইগুড়িতে যাদের শৈশব কেটেছে, অথচ কর্মসূত্রে বা অন্য কোনও কারণে যারা আজ ভিন-জায়গার বাসিন্দা, 'উত্তরণ'-এ শহরের বর্ণনা তাদের নিঃসন্দেহে স্মৃতিমেদুর করে তুলবে। বইটির প্রচ্ছদ যথাযথ, ছাপা বাঁধাই ভাল।

উত্তরণ—পূরবী দত্ত/অভিজাত প্রকাশনী, কলকাতা-৩৪/৬০.০০

ঝরনা ধর

নাট্যসমালোচনা

দ্রৌপদী, শাকুবাঈ, বৈজয়ন্তী এবং

মেঘ মুখোপাধ্যায়

গত ফেব্রুয়ারিতে নান্দীকারের উদ্যোগে জাতীয় নারী নাট্যোৎসব হয়ে গেল। ভারতীয় নারীদের জীবনকেন্দ্রিক কয়েকটি উচ্চমানের নাটক দেখার সুযোগ ছিল পরপর কয়েকদিন। নটী বিনোদিনীর স্মৃতিতে উৎসর্গ করা এই নাট্যসমারোহের পরিকল্পনা অভিনব। ভারতীয় নারীদের জীবন এখন কোন খাতে কেমনভাবে বইছে কিংবা আদৌ বইছে কিনা-কীভাবে কেন স্থবির হয়ে রয়েছে— থিয়েটারের ভাষায় তা জানার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নারীদের জীবনসংগ্রামের, বেঁচে থাকার সমস্যার আর তাদের স্বপ্নের ও আকাঙক্ষার রূপ নিয়ে গড়ে তোলা বাংলা সহ কয়েকটি প্রদেশের নাটক। ২১শে ফেব্রুয়ারি উদ্বোধনী সন্ধ্যায় ছিল ইম্ফলের বিখ্যাত কলাক্ষেত্র গ্রুপের দ্রৌপদী। মণিপুরি ভাষায় মহাশ্বেতা দেবীর কাহিনি অবলম্বনে নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করেছেন এইচ. কানহাইয়ালাল। নাটক শুরুর আগের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে কলাক্ষেত্রের প্রতিভাময়ী প্রবীণা অভিনেত্রী সাবিত্রী হৈশনমকে সম্মানজ্ঞাপন করলেন আর এক প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী অপর্ণা সেন। সেদিন নাটকটি দেখতে লেডি রানু মুখার্জি মঞ্চে (অ্যাকাডেমি) কলকাতার বিদ্বৎসমাজ ভিড় করেছিলেন।

প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এক তেজস্বিনী আদিবাসী রমণী হল দ্রৌপদী তথা দুপদি মেঝেন। নকশাল আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ দিনগুলিতে কাহিনির প্রেক্ষাপট। লড়াকু বিপ্লবীদের ধরবার জন্য বনের মধ্যে সেনাবাহিনীর শিবির পড়েছে। তারা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে রাষ্ট্রদ্রোহীদের এক দুর্ধষ পাঞ্জাবি ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে। শেষ পর্যন্ত কীভাবে দ্রৌপদীকে ধরা হল এবং রাষ্ট্রশক্তির সশস্ত্র রক্ষকরা কেমনভাবে এক রাষ্ট্রদ্রোহিণীকে নিজেরাই সশরীরে শাস্তি দিল — সেই নিষ্ঠুর মর্মান্তিক ঘটনার নাট্যরূপ দিয়েছেন কানহাইয়ালাল।

রাইফেল হাতে নিয়ে মঞ্চে কয়েক জন শিকারী সেনার বলদর্পী পদচারণায় নাটকের শুরু। রাইফেল হাতে নিয়ে বললাম কিন্তু তাদের হাতে সত্যিকারের কোনও আগ্নেয়াস্ত্র নেই। সারা নাটকে সৈন্যদের এমন ঘোরাফেরা। হাত দুটোয় কোনও ভয়ংকর আগ্নেয়াস্ত্র ধরার ভঙ্গি, পদক্ষেপ সতর্কতা, দৃষ্টিতে ক্রুরতা— সবমিলিয়ে বিদ্রোহ দমনে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর একটি অংশের জলজ্যান্ত প্রকাশ ঘটেছে মঞ্চে। সতর্ক ঘোরাঘুরির মধ্যে তারা নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনীয় বার্তা বিনিময় করে, কখনও সাধারণ কথাবার্তা বলে। মণিপুরি ভাষার সংলাপ হওয়ায় তা অনুসরণ করা যায়নি। নাটকের প্রায় পুরোটা জুড়ে দ্রৌপদীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন এক তরুণী অভিনেত্রী। চমৎকারভাবে তিনি চরিত্রটির দৃঢ়তা, লড়াকুমনোভাব ফুটিয়ে তুলেছেন মঞ্চে তাঁর আনাগোনায়, পদক্ষেপে, সংক্ষিপ্ত রুক্ষ সংলাপে, বুকে হাঁটায় কিংবা লাফ দেওয়ায়। সেনাদের হাতে ধরা পড়ার পর যখন সে অত্যাচারিত হবে, ভয়াল রাষ্ট্রশক্তির হিংস্র রূপ যখন নোখদাঁত নিয়ে লাফিয়ে পড়বে তরুণীটির ওপর, সেই পর্বে তরুণী অভিনেত্রীটির সঙ্গে নিজেকে বদলে নেন প্রবীণা সাবিত্রী হৈশনম। তাঁর আঙ্গিক অভিনয় নাট্যক্রিয়াকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তোলে। পুরো নাটকটি দাঁড়িয়ে রয়েছে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রখর আঙ্গিক অভিনয়ের ওপর। বাচিক অভিনয় খুব কম। অঙ্গ চালনা, পদচারণা এবং মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তি প্রকাশে নাট্যবস্তু বর্ণনের প্রয়াস। সংলাপনির্ভর থিয়েটারের চেয়ে এ জিনিস আলাদা। অভিনেতাঅভিনেত্রীদের শরীরবিভঙ্গের ওপর এ জাতীয় নাট্যের নির্দেশকরা জোর দেন বেশি। শরীরের ভাষায় নাট্যক্রিয়া ঘনীভূত হয়ে ওঠে। কলকাতার থিয়েটারেও নাট্যাভিনয়ের এই ধরন সম্প্রতি জনসমাদর লাভ করেছে।

ধরা পড়ার পর সেনাদের হাতে দ্রৌপদীর নিগৃহীত হবার দৃশ্যটি মনে দাগ রেখে যাবার মতো। এই অংশের আলো ও ধ্বনির প্রয়োগ নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতার মাত্রা প্রকট করে তুলেছে। বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত দ্রৌপদী যখন বারংবার ধর্ষণের পর হঠাৎ নিঃশেষিত শক্তি তার সমস্ত শরীরে জড়ো করে, নিরাবরণ অঙ্গে ক্যাপ্টেনের মুখের ওপর ক্রোধে ফেটে পড়ে— দৃশ্যটির ভয়াবহতা নাড়া দিয়ে যায়। রাষ্ট্রশক্তির পাশবিকতার কাছে নারীর লজ্জা নিবারণের জন্য শরীরে একটু কাপড়ের আচ্ছাদনের, এরকম হাস্যকর আব্রুর কোনও অর্থই হয় না। বরং এই লজ্জাকে অস্বীকার করার মধ্যেই যোগ্য ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটে উঠতে পারে। সাবিত্রী হৈশনম নির্যাতিত নারীর এই লজ্জার বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন অথচ কোথাও তা শিল্পকে ক্ষুণ্ণ করে না, রুচিকে ব্যাহত করে না — মেরুদণ্ডে কম্পন ধরানো একটি অমোঘ দৃশ্যের সৃষ্টি হয় মঞ্চের ওপরে।

অন্য এক সন্ধ্যায় ছিল নাদিরা জাহির ববর লিখিত ও নির্দেশিত এবং সরিতা যোশির একক অভিনয়ে সমৃদ্ধ মুম্বইয়ের ‘একজুট থিয়েটার’-এর নাট্য শাকুবাঈ। একক অভিনয়ের ঘরানায় বাংলা থিয়েটার সমৃদ্ধ। অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রে তৃপ্তি মিত্র, শাঁওলী মিত্র এবং সম্প্রতি বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ স্মরণীয় কাজ করেছেন। গৃহস্থ বাড়ির ঝি-র ভূমিকায় শাকুবাঈ চরিত্রে সরিতা যোশি দাপটে অভিনয় করেছেন। এক ঘন্টার কিঞ্চিদধিক কাল কোথা দিয়ে পার হয়ে যায় তাঁর অভিনয়ের গুণে।

প্রবল বর্ষণে ভেসে যাওয়া মুম্বইয়ের এক বিকেলে এক গৃহস্থ বাড়িতে দৈনন্দিন কাজ করতে আসে বাড়ির প্রৌঢ়া কাজের মেয়েটি। গৃহকর্তা-কর্ত্রী বাড়ির বাইরে। নির্জন ফ্ল্যাটে একা শাকুবাঈ যাকে সবাই ডাকে শাকু বলে। সে টুকটাক কাজ শুরু করার খানিক বাদে ফোন আসে। জানা যায় যে বাড়ির মালিকদের বাড়ি ফেরা হচ্ছে না। শাকুবাঈই তখন এ ফ্ল্যাটের রানি বনে যায়। কখনও ড্রইংরুমে কখনও বা রান্নাঘরে এটাওটা ধোয়ামোছা মাজাঘষার ফাঁকে ফাঁকে সে সারা বাড়িময় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে মৌজ করে আমাদের তার গল্প শোনায়। এ-বাড়ির গল্প। এর আগে সে যেখানে যেখানে কাজ করেছে তার ইতিকথা। বাড়ির মালিকমালকিনদের বিচিত্র ও জটিল জীবনের কাহিনি সে উন্মোচন করে মনোহারী ভঙ্গিতে। এক প্রৌঢ়া কাজের মেয়ে তার কর্মস্থলের বিবরণের সঙ্গে তার নিজের জীবনকাহিনি গেঁথে চলে। তার বাবামার কথা, স্বামীর কথা। যে-পরিবেশে যেমনভাবে সে বেড়ে উঠেছে, যে পথ পার হয়ে আজ এই পেশায় এসে পৌঁছেছে — তার খুঁটিনাটি আর বাঁকগুলির কথা শোনায় মগ্ন হয়ে।

আজ এই বর্ষণসিক্ত সন্ধ্যায় এমন নির্জন ফ্ল্যাটে সে যেন আচমকা নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়েছে। যেন বহুকাল তার জীবনে এমন একা হয়ে পড়ার দুর্লভ সুযোগ ঘটেনি। আজ সে সম্পূর্ণরূপে তার এই একাকিত্বের সদব্যবহার করে নিতে উদগ্রীব। তার মনে কত ঘটনার, কত চরিত্রের ভিড়। এই বিভিন্ন চরিত্রগুলিকে সে তাদের নিজনিজ চলনে বলনে অনুকরণ করে আমাদের সামনে হাজির করে। এদের কারুকে তার ভাল লাগত, পছন্দ হত, কারুকে সে দুচক্ষে দেখতে পারত না। কারুর প্রতি তাই তার সহানুভূতি আর কারুর বিরুদ্ধে বিদ্রূপ। পরতে পরতে তার নিজের জীবনের আকাঙক্ষা-হতাশা-হেরে যাওয়া আর অন্ধকারে আলোর রেখা দেখতে পাওয়ার স্ফূর্তি প্রকাশিত হতে থাকে।

মিনিটের পর মিনিটে আমরাও এক প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন অভিনেত্রীর মুখোমুখি হতে থাকি। সরিতা যোশির অভিনয়ের বিস্তার আমাদের মুগ্ধ করে তোলে। জীবনের নানা ঘাতপ্রতিঘাত সামলে নৌকা বেয়ে নিয়ে যাওয়া সমাজের নিচুতলার এক লড়াকু নারীর রূপ তিনি তাঁর দর্শকদের কাছে ধরে দিতে সক্ষম হয়েছেন। অভিনয়কলার নানা দিকে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার। তিনি সহজেই হালকা হতে পারেন, লঘুচালে বিচরণ করতে করতে আবার গভীর অনুভূতির স্তরে ঢুকে যেতে পারেন। রঙ্গ-তামাশা, হাসি মস্করাতে তাঁর জুড়ি নেই আবার তেমনই বিষাদে মুহ্যমান হতে বা শোকে ভেঙে পড়তে— জীবনের কথকতা বলতে বসে সব মাত্রাই তিনি স্পর্শ করেন। অভিনয়কলায় দারুণ পারদর্শিতা ভিন্ন এ নাট্য মনকে ছুঁত না, জীবনের গল্পটা বানানো বলে ধরা পড়ত। তা যখন হয়নি তখন অভিনেত্রীর গৌরব করতেই হয়।

তবে একক অভিনয়ের মধ্যে তাঁর চরিত্রানুগ করণীয় কাজের পরিমাণ কম বলে মনে হয়েছে। শুধু সোফা ঝাড়া কিংবা বেসিনে বাসনমাজা যথেষ্ট বলে মনে হয়নি। অভিনেত্রীর ‘বিজনেসে’র পরিমাণ আরও বাড়লে ভাল হত। না হয় সে আজ একা হয়ে পড়ে নিজেকে অনেক বেশি স্বাধীন ভাবছে, কাজ করতে তার মন চাইছে না, কাজে ফাঁকি দিয়ে সে নিজের মুখোমুখি হয়ে এই নির্জন সময়টিকে উপভোগ করতে চাইছে — এবং কত জনের জীবনকাহিনির খণ্ড খণ্ড ভাগ অভিনয় করে দেখাচ্ছে — তবুও এক একবার মঞ্চে তার ঘোরাফেরা কেমন ফাঁকা লাগে। যেন কিছু উপযুক্ত কাজের ফাঁকে ফাঁকে কথাগুলি বললে শোনাত আরও ভাল।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় তার মেয়ের রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারের সংবাদ আসে ফোনে। মেয়ে তাকে নিজেই ফোন করে জানায়। এই সংবাদে এবং তার মেয়ের লেখা একটি কবিতা পড়ে শোনানোর মধ্য দিয়ে নাটক শেষ হয়। বাড়ির সাধারণ কাজের মেয়ের জীবনটা একটা আকাশ স্পর্শের স্বাদে ঝলমলিয়ে ওঠে। এটা এক সহজলভ্য কল্পনাশ্রয়ী আশাবাদ বলে তুচ্ছ করার নয়। হয়ত শাকুবাঈ বাকি জীবনের জন্য ঘরে ঘরে শাকু রূপেই থেকে যাবে — এইভাবেই তার জীবন গড়াবে — সেখানে কোনও বড় আজগুবি রূপান্তর ঘটবে না কিন্তু তার মেয়ে যে আর বাড়ির কাজের মেয়ে হবে না, বাড়ি পালটে পালটে ঘুরবে না, তার জীবনধারা যে অন্যখাতে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে, সে যে সমাজের সম্মানিত নাগরিকের জীবনলাভের দিকে একটা বড় পদক্ষেপ করে ফেলেছে — এ সত্য অস্বীকার করা মুশকিল।

‘অশ্বত্থামা’ পাঠ

ইংরেজি পুরনো বছরের শেষ আর নতুন বছর শুরুর সারা রাত্রিব্যাপী অ্যাকাডেমি ও রবীন্দ্রসদন মঞ্চে নাট্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ‘নাট্যস্বপ্নকল্প’ উপস্থাপনা করে ‘অন্য থিয়েটার’ গোষ্ঠী নতুন শতাব্দী তথা সহস্রাব্দীতে বাংলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে স্মরণীয় সংযোজন করেছেন। যদিও বাংলার থিয়েটারের ইতিহাসে দোল-দুর্গোৎসব বা অন্য কোনও পার্বণ উপলক্ষে সারারাত্রিব্যাপী নাট্যানুষ্ঠানের

আয়োজন অভিনব কিছু নয় — কিন্তু সেই ধারাটি ক্রমশ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই ৩১শে ডিসেম্বর-১লা জানুয়ারির রাত্রে নাট্যামোদী দর্শকদের রঙ্গমঞ্চে জড়ো করার এই নতুন উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এ বছরের (২০০১-০২) অনুষ্ঠানের রাত্রি ছিল জমজমাট। অন্য থিয়েটার এবার রবীন্দ্রসদনে সারারাত ধরে আয়োজন করেছিল একাংক নাটকের। বাংলা সাহিত্যের *সাত* শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের *সাতটি* ছোটগল্পের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেছিল সাতটি দল। পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন দুই প্রবীণ আর পাঁচ শক্তিমান তরুণ নির্দেশক। এ ছাড়া ছিল দেবাশিস মজুমদারের লেখা একটি একাঙ্ক, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায়। এই উপভোগ্য একাংকগুলি নিয়ে পরে বিশদ আলোচনার অপেক্ষায় থেকে সে-রাতের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ বলে আমার যা মনে হয়েছে সেই অনুষ্ঠানের কথা বলি।

এ বছর রাতের প্রথম অনুষ্ঠান ছিল মনোজ মিত্রের নাটক 'অশ্বত্থামা' পাঠ। কী বিষয়বস্তুতে কী রচনাকৌশলে 'অশ্বত্থামা'কে বলা যেতে পারে একটি বিদ্যুৎগর্ভ কাব্যনাট্য। মহাভারতের অন্তিমলগ্নের এক ট্রাজিক উপাখ্যান নিয়ে মনোজ মিত্র এই নাটকটি রচনা করেছিলেন সত্তরের দশকে। প্রতিশোধপরায়ণ, রক্তপিপাসু, বন্ধুবৎসল অশ্বত্থামা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পরাজিত, ভগ্নউরু-ধরাশায়ী দুর্যোধনকে তৃপ্ত করার জন্য বিজয়ী পঞ্চপাণ্ডবের ছিন্নশির উপহার দিতে চেয়েছিল। কিন্তু পেরেছিল কি? অশ্বত্থামার প্রতিশোধস্পৃহা আর অন্ধ হিংসা তাকে যে ভয়াবহ অতৃপ্তির সীমায় পৌঁছে দিয়েছিল সেই নিয়েই নাটক। মহাকাব্যের কাহিনিটিকে তিনি নিজের সময়চেতনা, জীবনবোধ, ইতিহাসবোধ দিয়ে এমনভাবে নতুন করে রচনা করেছেন যে নাটকটি সমকালের সাহিত্যকৃতির একটি সম্পদ হয়ে উঠেছে। এ রূপ একটি নাটক যদি আবার মঞ্চে বসে পাঠ করে শোনান আমাদের যুগের শ্রেষ্ঠ (একজনকে তো শ্রেষ্ঠতমও বলা যায়) তিনজন অভিনেতা — সে পাঠ শোনা হয়ে ওঠে জীবনের এক বড় অভিজ্ঞতা। শ্রোতৃকুলের বোধে গভীর স্পন্দন জাগাতে সক্ষম সে-নাট্যপাঠ। কৃতবর্মার ভূমিকায় মনোজ মিত্র, কৃপাচার্য রূপে অশোক মুখোপাধ্যায় এবং অশ্বত্থামার চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পাঠ বা বাচিক অভিনয় অনবদ্য। সুস্থ স্বাভাবিক সহজ জীবনবোধের সঙ্গে বিকৃত, ক্রুর, চরমহতাশায় নিমজ্জিত ব্যক্তির দ্বন্দ্বের অভিঘাত চমৎকারভাবে ফুটে উঠতে দেখি। একদিকে বীভৎস হিংসা, প্রতিশোধপরায়ণ মানসিকতা আর একদিকে ন্যায়পরতা। বাস্তবে হেরে গিয়েও হার না মানার মূঢ় মানসিকতা, যার পরিণামে শুধুই বাড়ে আত্মধিক্কার। মানুষ আরও ছোট, আরও খাটো, আরও অমানুষ হয়ে যায়। কৃতবর্মা, কৃপাচার্য এবং অশ্বত্থামার চরিত্রের জটিল দ্বন্দ্ব তিনজন অভিনেতাই প্রকট করে তুলেছেন নিপুণ স্বরচেপণে। সমস্ত মিলিয়ে একটা ক্রুর সংকটপন্ন সময়কে আমাদের সামনে উপস্থিত করে দিয়েছেন তিন অভিনেতা। তাঁদের কণ্ঠ আশ্রয় করে এক বীভৎসতা আমাদের গ্রাস করতে থাকে। তাঁদের পরস্পরের পাঠের মধ্যে ছন্দ ছিল। তাল, লয় ছিল। কেউ কাউকে অযথা অতিক্রম করে যাননি — নিজ নিজ চরিত্রের দায়িত্ব যথার্থভাবে পূরণ করে নাটকটিকে সমগ্রতা দান করতে চেয়েছেন। তাই নাট্যপাঠটিকে একটি সম্পূর্ণ সঙ্গীতের মতো মনে হল। অবশ্য নাটকের মধ্যে যে ট্র্যাজিডি — পাঠ শেষ হলে তার অভিঘাতে মন ভার হয়ে থাকে বহুক্ষণ। মনে হয় যেন আমরাও ওই ট্র্যাজিডির অংশ। ভ্রান্ত পথে চালিত, ক্রোধে হতবুদ্ধি, মানবিকতা ভ্রষ্ট অশ্বত্থামার হাহাকার সৌমিত্রের কণ্ঠ নিঃসৃত হয়ে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে যখন ছড়িয়ে পড়ে এ রকম নষ্ট চৈতন্যের পরাজয়ে কোথায় যেন বাকিদের একটা সান্ত্বনা থাকে। শেষ পর্যন্ত অশ্বত্থামার জয় হয় না। নানা দিক থেকে নাটকটিকে ব্যাখ্যা করার অবকাশ আছে। নাট্যকারের অভিপ্রায় সম্বন্ধে ক্রমশ আমরা সচেতন হয়ে উঠি। কেন তিনি মহাভারতের অমন নিষ্ঠুর উপাখ্যানকে কেন্দ্র করে এমন ভয়ংকর এক নাটক লিখতে গেলেন — সৌমিত্র, অশোক এবং মনোজ স্বয়ং তা দর্শকের কাছে পরতে পরতে উন্মোচিত করে দিতে পেরেছেন। কেবল কণ্ঠের অভিব্যক্তিতেই তাঁরা এটা সম্ভব করে তুলেছেন। এমন একটি নাট্যপাঠ যাঁরা প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত থেকে শুনতে পেলেন না তাঁরা খুব বঞ্চিত হলেন। তাই সকলের জন্য এটির ক্যাসেট/সিডি প্রকাশ করতে তাঁদের অনুরোধ করি।

মানানসই

রমাপ্রসাদ বণিকের লেখা রূপান্তর-এর 'মানানসই' শুরু হয় এ রকম একটি দৃশ্য দিয়ে — সাফারি পরিহিত কয়েকজন বিশেষ নিরাপত্তা অফিসার একটি সুসজ্জিত ঘরের প্রত্যেকটি বস্তু উল্টেপাল্টে মেটাল ডিটেকটর দিয়ে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে দেখছে। ওদের কথা থেকে বোঝা যায় কিছুক্ষণের মধ্যেই এ ঘরে এসে উঠবেন মাননীয় এক মন্ত্রী। তিনি এই বনবাংলোয় আসছেন ক'দিন বিশ্রামের জন্য।

মন্ত্রীর নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করছে তারা। মন্ত্রীমহাশয়ের দেখাশোনার জন্য কারা কারা থাকছে তাদের নাম নেওয়া হয়। নিরাপত্তা অফিসাররা বাংলোর কেয়ারটেকার নোয়েল ডি সুজার কাছে জানতে পারে বাংলো কর্মী এক সরলমনা আদিবাসী মাটির মানুষের কথা। যুবকটিকে সবাই ডাকে 'মানুষ' বলে। সেই 'মানুষ' কে নিয়ে আসা হয়। সে ঘর ঝাড়পোছ সাফসুতরোর কাজ করতে করতে অন্যদের কথা শোনে আর টুকটাক দুয়েকটা কথা বলে। ছেলেকে শহরে রেখে লেখাপড়া আর ইংরেজি শিখিয়ে ভদ্রলোক বাবু বানানো তার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। সবাই ওকে আশ্বাস দেয় যে বলা যায় না মন্ত্রীমহোদয়কে ঠিক মতো বশরে পারলে তিনি সদয় হয়ে তার ছেলেটিকে এই জঙ্গল থেকে শহরে

নিয়ে গিয়ে পড়াশুনো শেখানোর বন্দোবস্ত করে দেবেন। কথাটা মানুষের মনে ধরে যায়। এই সামান্য কথার কথা থেকেই এ-নাটকে ঘনিয়ে উঠবে যে বিপর্যয় তা তখন টের পাওয়া যায় না। পরিচারক রূপে খালি গায়ে হাঁটুঅব্দি ধুতি পরা মানুষের চলাফেরা, নিজের মনে নিচু সুরে গান গাইতে গাইতে কাজ করে যাওয়া, তার শরীরের কিছুটা অবনমিত ভঙ্গিমা আর নিরাপত্তা কর্মীদের দিকে মাঝে মাঝে ভীরু চাউনি — নাটকটির আবহ তৈরি করে দেয়। আদিবাসী সুরে মাটির গন্ধমাখা 'লাল পাহাড়ির দেশে যা, রাঙা মাটির দেশে যা হিথাক তুকে মানাইছে না রে, গান গাইতে গাইতে সে আপনমনে কাজ করে যায়। রমেন বসু মানুষের ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করেছেন। আদিবাসী সরলপ্রাণ গ্রাম্য মানুষটিকে মঞ্চে তুলে আনতে তিনি সফল। 'আদিবাসী আবার কখনও মন্ত্রী হয়?' একজায়গায় আচমকা এরকম এক বিস্ময়জনক প্রশ্ন করে ফেলে সে সবাইকে স্তম্ভিত করে দেয় যেন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দেয়। আচমকা তার এই প্রশ্ন করার ধরন, তার উচ্চারণ আর অভিব্যক্তি, সেই মুহূর্তে মঞ্চের অন্য চরিত্রগুলির প্রতিক্রিয়া-প্রকাশ, ধ্বনি আর আলোকসম্পাত আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে আমরা একটি যোগ্য গ্রুপের অভিনয় দেখতে এসেছি। এই মুহূর্ত-রচনার মধ্য দিয়ে 'রূপান্তর' দর্শকমনে একটি ভাল নাটক দেখার আশা জাগায়।

দৃশ্য পরিবর্তন হলে দেখি গভীর রাতের নির্জন ঘরের মধ্যে মন্ত্রীমশাই বসে ফাইল দেখছেন। নেপথ্য থেকে ভেসে আসছে এক মহিলাকণ্ঠের গান, 'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে'। নিজের মনে গান গাইতে গাইতে মঞ্চে প্রবেশ করেন মন্ত্রী সুদর্শন পালেকারের স্ত্রী বৈজয়ন্তী। বনে বেড়াতে এসেও মন্ত্রীর কর্মব্যস্ততা আর নিরাপত্তার বহর নিয়ে তাঁর স্ত্রীর ক্ষোভ প্রকাশ হয়ে পড়ে। মন্ত্রী স্বামীর এই জীবনধারা তার আদৌ পছন্দ নয়। কলেজের জন্সি ছাত্রনেতাকে ভালবেসে বিয়ে করার সময় সেদিনের তরুণীটি একদম অন্যমান করতে পারেনি তাদের দাম্পত্যজীবনের ধারা আজ এইখাতে বইবে। আজ অরণ্যের নির্জনতা, রহস্যময়তা কিংবা জ্যোৎস্না ধোয়া জঙ্গলের রূপ উপভোগ করতে স্ত্রীকে নিয়ে একা একা বেরিয়ে পড়ার ফুরসত নেই পালেকারের। অবকাশ নেই না কি সে মনই খোয়া গেছে?

রাজনৈতিক ক্ষমতাবান বা সরকারি ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত একজন মানুষের স্ত্রীর মনের মধ্যে থেকে প্রাণোচ্ছল সহজ জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা হারিয়ে যায়নি। সে তার মনের তারুণ্য হারিয়ে ফেলেনি। এই নিয়ে স্বামীস্ত্রীর কথা চালাচালির মধ্যে তারা শুতে যায়। কিন্তু বৈজয়ন্তীর ঘুম ধরে না। সে বাথরুমে যায়। পরমুহূর্তেই ভেতর থেকে তার আর্ত চিৎকার শোনা যায়, সঙ্গে ধড়াধড়ির আওয়াজ। পালেকার চকিতে বিছানা ছেড়ে উঠে বাথরুমের দিকে এগিয়ে যান এবং বৈজয়ন্তীকে ডাকতে থাকেন। ভেতরে কী ঘটেছে কিছুই বোঝা যায় না। দরজাও খোলে না। তিনি যখন গার্ডদের ডাকতে যাচ্ছেন তখন ভয়ার্ত, বিহ্বল, বৈজয়ন্তী কোনওমতে কাঁপতে কাঁপতে বাথরুমের দরজা খুলে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। বাথরুমে ঢুকে মন্ত্রী দেখেন যে মানুষ নামের আদিবাসী কর্মীটি সেখানে মরে পড়ে আছে। কখন সে ওখানে ঢুকে বসেছিল। বৈজয়ন্তীর কথা থেকে জানা যায় সে বাথরুমে ঢুকলে নেশাতুর মানুষটা আচমকা তার পা জড়িয়ে ধরে কিছু বলতে চেয়েছিল, কিছু প্রার্থনা করছিল আর ভয়ার্ত বৈজয়ন্তী হতবুদ্ধি হয়ে শাওয়ারের হাতলটা দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে বসেছে। বৈজয়ন্তী তৎক্ষণাৎ মন্ত্রীর মেডিকেল ইউনিটকে ডাকতে চায় মানুষের চিকিৎসার জন্য। কিন্তু লোকটা মারা গিয়েছে নিশ্চিত হয়ে কেলেংকারির ভয়ে মন্ত্রীমশাই তাঁর চরিত্রের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উঠে পড়ে লাগেন। নোয়েলকে ডেকে তিনি পুরো হত্যাকাণ্ড বা দুর্ঘটনাটা ধামাচাপা দেবার সুবন্দোবস্ত করেন। কীভাবে লাশ গায়েব করা হবে ইত্যাদি। পুরস্কারস্বরূপ তিনি নোয়েলকে গোয়াতে জমি দেবেন হোটেল করার জন্য, তার বদলে নোয়েল এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবে। মন্ত্রী মানুষের চার বছরের শিশু পুত্রকে পালনের ভার নিয়ে সঙ্গে করে চলে যাবেন।

'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে' গাইতে গাইতে বৈজয়ন্তীর ভূমিকায় সৌমুশী রায়কে মঞ্চে প্রবেশ করতে দেখেছিলাম। তারপর মন্ত্রীর সঙ্গে তাদের বর্তমান দাম্পত্যজীবনের ধরন নিয়ে তার ক্ষোভপূর্ণ বাক্যবিনিময়। এই আশা-হতাশার দিকটা সৌমুশী তাঁর অভিনয়ে জীবন্ত করে তুলেছেন। দীর্ঘদিন ধরে জমে ওঠা অসন্তোষ প্রকাশের ভঙ্গিটি বেশ লাগে। তার খানিক বাদে দেখলাম এক আর্ত, বিহ্বল, ভীতচকিত বৈজয়ন্তীকে — ঘটনাচক্রে অনিচ্ছায় সে একটা মানুষকে খুন করে ফেলেছে। মানুষটাকে এখনও বাঁচিয়ে তোলার আশা আছে ভেবে সে মেডিকেল ইউনিটকে ডাকতে চায় কিন্তু তার রাজনীতিক, গদিয়ান স্বামী তাঁর ক্যারিয়ার বজায় রাখার লক্ষ্যে এক অমানবিক কঠিন রাস্তা গ্রহণ করেন। বৈজয়ন্তী এই অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে হতবিহ্বল। হতাশায় কাঁদে। স্বামীর মুখ চেয়ে নিজের বিবেক বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। একটি নাটকের স্বল্প পরিসরের মধ্যে প্রধান নারীচরিত্রের মনোজগতের এবং আচরণের বেশ কয়েকটি জটিল স্তর সৌমুশী রায় দক্ষতার সঙ্গে রূপ দিয়েছেন। তাঁর ভীতচকিত, বিহ্বল, কিংকর্তব্যবিমূঢ় অভিব্যক্তি হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত, — সংযম তিনি জানেন। কম কথা, নীরবতা এবং উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গি ও চোখের দৃষ্টির মধ্য দিয়ে চরিত্রটির অসহ্যতা তিনি বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু মন্ত্রী যখন নোয়েলকে ডেকে মোলায়েমভাবে শাসিয়ে আর প্রলোভন দেখিয়ে আদিবাসীর লাশ গায়েবের নির্দেশ দিচ্ছেন, মৌসুমী হাল ছেড়ে দিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়েন আর নীরব অভিব্যক্তিতে বেদনা প্রকাশ করতে থাকেন — এই

জায়গায় এতক্ষণ শুধু বসে না থেকে অন্য কোনও রূপেও তাঁর ভূমিকা পালন করতে পারলে নাট্যক্রিয়া আরও জোরালো হত বলে মনে হয়। মুহূর্তে সাবলীলভাবে মুখচোখের ভাবান্তর ঘটিয়ে তিনি নাট্য অভিঘাত তীব্র করে তুলতে পেরেছেন। চরিত্রটিকে সময় ঘটনাধারার পরম্পরায় বুঝে উঠতে না পারলে এটা সম্ভব হত না। জীবনের জটিলতাকে উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ করতে পারলেই এমন স্বচ্ছন্দভাবে চরিত্রায়ণ সম্ভব।

মৌসুমী রায়কে যথাযোগ্যভাবে সহায়তা করেছেন মন্ত্রী পালেকারের চরিত্রে প্রদীপ রায়চৌধুরী। দুর্ঘটনার আকস্মিকতায় বৈজয়ন্তীর ভেঙে পড়া এবং পরবর্তী ঘটনাধারাকে বাস্তবোচিত করে তোলা সহজ হত না প্রদীপ রায়চৌধুরীর উপযুক্ত অভিনয় বাদ দিয়ে। তিনিই নাটকটির নির্দেশক। দু'জনে মিলে নাটকের কেন্দ্রীয় মুহূর্তটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার ফলে গোবরডাঙা রূপান্তরের 'মানানসই' একটা দর্শনীয় প্রযোজনা হয়ে ওঠে। নাটকের পরবর্তী দৃশ্যে মনুষের যুবক পুত্রের পরিণতি দেখিয়েছেন নাট্যকার রমাপ্রসাদ বণিক। আদিবাসী পুত্রটি মন্ত্রীর বাড়িতে লালিতপালিত হয়ে উঠলেও সে এই জটিল নাগরিক সমাজে নিজেকে শেষ পর্যন্ত মানিয়ে নিতে পারেনি।

২০ বছর পরে নতুন করে আবার ভারী দপ্তরের মন্ত্রী হওয়ার শপথ গ্রহণের দিনে পালেকরের সংসারে হঠাৎ গোয়া থেকে সর্বস্ব খোয়ানো নোয়েল ডি-সুজার আবির্ভাব ঘটে। সে যুবকটিকে তার আসল পিতার পরিচয় এবং তার মৃত্যু বা হত্যার আর লাশ গায়েবের সত্য প্রকাশ করে দেয় — যা এতকাল তার কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। সে যখন তার পালক বাবা-মার কাছে প্রশ্নমুখর হয়ে ওঠে এবং আদিবাসী সরল মানুষটির মৃত্যুকে ধামাচাপা দেবার জন্য অভিযুক্ত করে সেই সংকটময় দৃশ্য যুবকটির চরিত্রে রমেন বসু (যিনি 'মানুষ' চরিত্রে আগে করেছেন) এবং মৌসুমী রায় — প্রদীপ রায়চৌধুরীর অভিনয়ে বাস্তবতা পেয়েছে। পরিকল্পিতভাবে হত্যা না করেও হত্যাকারীর ভূমিকায় পৌঁছে যাওয়ার ঘটনা যে অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করে সেই অসাধারণ বিপন্ন মানসিকতা আর একবার ফুটিয়ে তুলতে দেখি শ্রীমতী রায়কে নাটকের শেষ দৃশ্যে। ঘটনাটা যখন ঘটেছিল তখন তার কাছে কেউ জবাব চায়নি, স্বামীর সান্ত্বনা ও প্রশ্রয় সত্ত্বেও নিজেই নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল, আর আজ পালিতপুত্রের প্রশ্নের অভিযোগের মুখোমুখি — ২০ বছর বাদে ইতিহাসের সামনে।

প্রথম দিকে মানুষের গলার গান 'লাল পাহাড়ির দেশে যা, রাঙা মাটির দেশে যা, হিথাক তুকে মানাইছে না রে' নাটকের শেষে নতুন তাৎপর্য পেয়ে যায়। এই গানটি ব্যবহার করে পরিচালক মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। সামান্য কিছু জিনিস দিয়ে মঞ্চ নির্মাণ এবং নাট্যমুহূর্ত সৃজনে আলোর প্রয়োগ প্রশংসনীয়। প্রযোজনাটি দেখে ভাল লাগার প্রাথমিক অভিঘাত থিতিয়ে এলে কিন্তু নাটকের পরিণতি নিয়ে প্রশ্ন জাগে। একজন মন্ত্রী তথা রাজনীতিক পালকপিতার সংসারে বেড়ে ওঠার, যুবক হয়ে ওঠার পরও একজন আদিবাসী তনয় কি এতই সরল থেকে যায় যে সে স্বেচ্ছায় মন্ত্রীপরিবারের সুখের স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন পরিত্যাগ করে বনজঙ্গলের জীবনে ফিরে যাবার সংকল্প নেয়? ২০ বছর সুখী পরিশীলিত নাগরিক জীবনযাপন এবং রাজনৈতিক পরিবেশে থাকার পরও একজন আদিবাসী কি আর সরল অন্তঃকরণের আদিবাসী থেকে যেতে পারে? তার নিজেকে এই সভ্য জটিল সমাজে তখনও আর বেমানান লাগে? নাট্যকার যুবক আদিবাসীপুত্রটিকে যেভাবে এঁকেছেন তাতে কিছু সরলীকরণ ঘটে গেছে বলে মনে হয়নি কি এ নাট্যের নির্দেশকের?

অন্তঃসলিল: একটি হৃদয়গ্রাহী প্রযোজনা

বিশ্বনাথ রায়

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রপরিচালক অম্লান চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গি জীবনের দোলাচল নিয়ে বিদেশি প্রযোজনায় একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য বিখ্যাত বাঙ্গি তারাবাঈয়ে জীবনকে কেন্দ্র করে সুটিংয়ের কাহিনি বিন্যাস নিয়ে 'চোখ' নাট্যসংস্থার নব প্রযোজনা 'অন্তঃসলিল' নাটকের আখ্যানবস্তু গড়ে উঠেছে। নাট্যকার ও নির্দেশক অভিজিৎ করগুপ্ত বাঈজি জীবনের শোষণ বঞ্চনার মধ্য দিয়ে পুরুষশাসিত সমাজের, নারীজাতির ওপর বাণিজ্যিক ভোগদখলের প্রতি স্পষ্টভাবে আঙুল তুলেছেন। একটি মাত্র 'সেট'-এর সাহায্যে নাটককার — পরিচালক মঞ্চের ওপর সমগ্র নাটকটি অত্যন্ত সুবিন্যস্তভাবে উপস্থিত করেছেন। এই নাটকে আছে একগুচ্ছ চরিত্র। তরন্নুম বা তারাবাঈ তো আছেই। আছেন তরন্নুমের সঙ্গীত শিক্ষক উস্তাদজি, দালাল আকিল, নথ্‌খোলনিবাবু গোপাল বর্মণ, তারা'র জন্মদাতা পিতা প্রিয়ানাথ মিত্র, আছে প্রেমিক সাজে আর এক দালাল 'পান্না', সমাজ পরিত্যক্তা জনাকতক বারবণিতা, শরীর ও সুরের মালিকবাবুরা ও সাজসরঞ্জাম সহ একটা সুটিং পার্টি। এই মালিকবাবুদের সম্পর্কে বলা যায়, এরা বাঈজিদের উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের সমজদার নয়, পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির

বর্তমান বিশ্বায়নের গহ্বর থেকে জন্ম নেওয়া যৌন উত্তেজক চটুল সুরের খদ্দের এবং যারা পরিসমাপ্তি ঘটায় তরন্নুমদের দেহ টানাহ্যাঁচড়ানোর মধ্য দিয়ে।

চিত্রপরিচালক অম্লান চট্টোপাধ্যায় যথাসম্ভব তরন্নুম বা তারাবাঈয়ের জীবনে আসা বাস্তব চরিত্রগুলিকে দিয়েই অভিনয় করিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর। এইভাবেই সুটিং এগিয়ে চলে। একেবারে শেষ সটে এসে তরন্নুমের কাছে চিত্রপরিচালক অম্লানের মুখোশ খসে পড়ে। যে-নারী সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে সুটিংয়ের কঠিনশ্রমকে বরণ করেছেন হাসিমুখে-শুধুমাত্র কোঠাবাড়ির যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনকাহিনি মানুষ জানবে, এই টুকু আশায়, সেই তারাবাঈয়ের আত্মমর্যাদার আয়নায় ধরা পড়ে গেল চিত্রপরিচালকের অন্তঃসারশূন্য ক্যারিয়ার সর্বস্ব দাম্ভিক মুখ। ছলেবলেকৌশলে বা অর্থকৌলিন্যে সে কিনতে চায় অনিচ্ছুক তারাবাঈকে। এই ফাঁদ থেকে বাঁচার আশায় প্রেমিক 'পান্না'কে নিয়ে তরন্নুম অন্য কোথাও পালাতে চেয়েও পারে না। আজ পান্নাকেও বড় অচেনা মনে হয় তার। সেও যে শুধুমাত্র তা'র দেহবেচা অর্থের অংশীদার হবার জন্য প্রেমিক সেজেছে, আজ এ নিষ্ঠুর সত্যও প্রকাশ হয়ে পড়ে। চারিদিকে ফাঁদপাতা পেশীশক্তির কাছে তারাবাঈ বাধ্য হয় ছবির শেষ সট দিতে। নৃশংস বাবুদের তালিকায় আর একটি নাম যুক্ত হয় — অম্লান চট্টোপাধ্যায়। বিশ্বদেহব্যবসার চালচিত্রের যে তত্ত্ব ও তথ্য গবেষক নাট্যকার অভিজিৎ করগুপ্ত পাদপ্রদীপের আলোয় হাজির করেছেন, পঞ্চমুখে এই প্রয়াসের প্রশংসা না করে সুধীসমাজের উপায় নেই। চিরাচরিত এক বারবণিতার মর্মস্পর্শী জীবনকাহিনির নাটকরূপ নয়, গবেষণালব্ধ শিকড়ের সন্ধানে পৌঁছবার এক আবেগহীন দলিল এই নাটক — অন্তঃসলিল।

চমৎকার অভিনয় করেছেন উস্তাদজি রূপী শ্যামল ঘোষ। রূপসজ্জায় পোশাকে ও চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি যেন নাটকের পাতা থেকে রক্তমাংসের পিতৃপ্রতিম সঙ্গীতগুরুকেই মঞ্চে উপস্থিত করেছেন। চিত্রপরিচালক অম্লান সেজে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন শৌভিক মজুমদার। অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময় তাঁর বাচিক ও শারীরিক অভিনয়। কিন্তু আদ্যন্ত পেশাদারি ক্যারিয়ারিস্ট পরিচালকের চরিত্রে আবেগের স্থান থাকে কি! ধরে ধরে সংলাপ উচ্চারণ চরিত্রের ব্যক্তিত্বকে আরও দীপ্তিময় করবে বলে মনে করি। তবু বলি শৌভিক অনবদ্য। সাংবাদিক মণিকা চরিত্রে ফৌজিয়া সিরাজ চমৎকার। তাঁর সপ্রতিভ চরিত্রচিত্রণ মনে রাখার মতো। সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় নথ্‌খোলনি বাবু গোপাল বর্মণ চরিত্রে বেশ অভিনয় করেছেন। এ ছাড়া দর্শকমনে দাগ কাটে পান্না চরিত্রে প্রদীপ দত্ত ও আকিল চরিত্রে প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য। এ ছাড়া সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত, গৌরদাস গুপ্ত, স্বপ্না আইচ ও সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের নিজের ক্ষেত্রে সুবিচার করেছেন। তারাবাঈ চরিত্রে বৈশাখী মার্জিতের আবির্ভাব দর্শকমনে গভীর দাগ কাটে। মুন্নাবাঈ রায়চৌধুরী সুরারোপিত গানগুলি শ্রীমতী মার্জিত অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী কণ্ঠে পরিবেশন করেছেন। মঞ্চ চলনসই। যে দৃশ্যে, তারাবাঈ মুজরো ছেড়ে দেবার পর, শুধুমাত্র চিত্রপরিচালক অম্লান চট্টোপাধ্যায়ের ছবির সুটিংয়ের স্বার্থে বাছাবাছা নৃশংস অত্যাচারী দেহলিপ্সু খদ্দেরদের নিয়ে সুটিং দৃশ্য রচিত হ'ল, সে দৃশ্য সাদামাটা হবে কেন? সে দিনকার মুজরো দৃশ্যের 'সেট' আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রপরিচালকের বাঈজিবাড়ির মঞ্চসজ্জা অত্যন্ত ঝকঝকে হতে হবে। অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ ও সুসজ্জিত সুটিংয়ের দৃশ্য রচিত হবে। খদ্দেরদের পোশাকপরিচ্ছদ সবার সমানভাবে ধোপদুরস্ত ছিল না। এই দৃশ্যটিকে গ্রহণ করবার জন্যে পরিচালক যেভাবে চাইলেন,— একটা অত্যাচারের দৃশ্য — কই, সেভাবে তো কুৎসিত নাচগান ও অত্যাচারে দৃশ্যটি কানায় কানায় ভরে উঠল না। দর্শকমনে যে আতঙ্ক ও ক্ষোভ সৃষ্টি করবার সুযোগ ছিল, তা হল না। নাটককার অভিজিৎ যত শক্তিশালী, পরিচালক অভিজিৎকে সম্ভাবনাপূর্ণ প্রযোজনাটিকে ভরিয়ে তুলতে আরও তীক্ষ্ণ ও আরও যত্নবান হতে হবে। সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো কাটিয়ে উঠতে পারলে 'অন্তঃসলিল' এই সময়ে নাট্য-দর্শক সমাজের কাছে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী প্রযোজনা হিসাবে অতি সহজেই স্থান করে নেবে। এরকম সম্ভাবনাময় অভিনয়সমৃদ্ধ নাটক ইদানীং সচরাচর চোখে পড়ে না। তাই এ নাটকের আদর হবেই। আলোকশিল্পী বাদল দাস উল্লেখযোগ্য। রূপসজ্জা শিল্পীদ্বয় তাপস ঘোষ ও শান্তনু দাসের কাজ মনে রাখার মতো। শাশ্বু বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত শব্দ প্রক্ষেপণ ভাল। এই নাটকটির বহুল অভিনয় কামনা করি। নারীবাদী প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে 'অন্তঃসলিল' নাটকটি এক জীবন্ত দলিল।

তথ্যচিত্র : প্রস্তরপ্রণয়

(রোমান্সিং দ্য স্টোন)

মেঘ মুখোপাধ্যায়

আজ মাসাধিক কাল যখন গুজরাতে সংখ্যাগুরু হিন্দুর হিংসার তাণ্ডবে মুসলিম সম্প্রদায় সমূলে বিনাশের মুখে, কত সাধারণ মুসলিম নাগরিককে হত্যা করা হচ্ছে নির্মমভাবে, তখন সমীরণ দত্তের তথ্যচিত্র 'প্রস্তরপ্রণয়' বা 'রোমান্সিং দ্য স্টোন' আমাদের কাছে জীবন ও শিল্পের নতুন মানে নিয়ে আসে। বছর কয়েক আগে সমীরণবাবু মেদিনীপুরে কাঁসাই নদীর পশ্চিমকূলে পাথরা গ্রামের ভগ্ন হিন্দু দেবালয়গুলি নিয়ে এই তথ্যচিত্রটি নির্মাণ করেছিলেন। ছবিটির বিষয় মূলত কয়েকশো বছরের পুরনো শিল্পমণ্ডিত পরিত্যক্ত ও ভগ্ন মন্দিরগুলি হলেও সমীরণবাবু আসলে দেখাতে চেয়েছেন জনবিরলপ্রান্তরে বহুযুগ পরিত্যক্ত পড়ে থাকা গৌরবহীন মন্দিরগুলিকে হৃতগৌরব ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে এক মুসলিম যুবক মহম্মদ ইয়াসিন পাঠানের অক্লান্ত উদ্যম। এই ভাঙা দেবদেউলগুলির প্রতি ইয়াসিন পাঠানের ভালবাসা এক রোমাঞ্চকর প্রণয়কাহিনির তুল্য।

তিনি এক স্থানীয় ইস্কুলের স্বল্পশিক্ষিত নিম্নবিত্ত পিওনমাত্র। জাতে মুসলমান কিন্তু তাঁর জীবনের একটা সংকল্প করে নিয়ে ছিলেন হিন্দুর এই পরিত্যক্ত জীর্ণদশাগ্রস্ত মন্দিরগুলির সংস্কারসাধন। লোকচক্ষুর অন্তরালে নদীকূলে পড়ে থাকা মন্দিরগুলির গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য এই অতি সাধারণ যুবকটির উদ্যোগ আজ জেলা ও রাজ্য ছাড়িয়ে সারা দেশের দৃষ্টি ও সম্মান আকর্ষণ করে নিয়েছে। সরকার মন্দিরগুলির সংস্কারসাধনের কাজ হাতে নিয়েছে — বিভিন্ন সংবাদ ও সাময়িকপত্রে এ নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি তাঁকে 'কবীর' পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু প্রথম দিকে পথ তো এত সুগম ছিল না। তাঁকে যারপরনাই লড়াই করতে হয়েছে, উপযুক্ত গুণীব্যক্তি এবং আমলাদের নজরে পাথরাকে আনার জন্য তাঁকে কম ছোটাছুটি করতে হয়নি। অনেকে তো এই ভাঙামন্দিরগুলি নিয়ে তাঁর দরদের কারণই খুঁজে পাননি। পাঠান কিন্তু দমেননি। তিনি মেদিনীপুরের তৎকালীন জেলা সমাহর্তা অমিতকিরণ দেব এবং মন্দির বিশেষজ্ঞ তারাপদ সাঁতরার কাছে ছুটে গেছেন — তাঁদেরও উৎসাহী করে তুলেছেন। স্থানীয় গ্রামবাসীদের নিয়ে কমিটি গড়েছেন। যেখানে যাদের বললে কাজ এগবে তাদের দোরে দোরে ছুটে গেছেন। এই সাধারণ ভারতীয় মুসলমানকে কী চোখে দেখবে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা — এ প্রশ্ন আজ মনে জাগে।

সমীরণ দত্তের ক্যামেরা কাব্যময় চোখে পর্দায় তুলে এনেছে পাথরার ভগ্ন মন্দিরগুলিকে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা একগুচ্ছ মলিন মন্দিরের সৌন্দর্য পর্দায় ভেসে উঠতে থাকে। দিনের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি আমাদের মন্দিরগুলি দেখাতে থাকেন। তারপর কলকাতা থেকে আসা এক তরুণী গবেষকের সঙ্গে কথোপকথনের সূত্রে ইয়াসিন পাঠানের সঙ্গে এই মন্দিরগুলির প্রণয়সম্পর্ক উন্মোচিত করতে থাকেন। পাঠান তরুণীটিকে নিয়ে মন্দিরগুলি ঘুরে দেখাতে দেখাতে তাঁর প্রচেষ্টার কাহিনি শোনান। বাল্যকালে এই মন্দিরসংলগ্ন নির্জন পথ দিয়ে ইস্কুলে পড়তে যাবার পথে বারবার এদের দেখতে দেখতে কেমন করে তিনি এই জীর্ণমলিন মন্দিরগুচ্ছের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন আমরা তা জানতে পারি।

ক্যামেরার চোখে দেখা নদীকূলের মন্দিরগুচ্ছের দৃশ্যগত সৌন্দর্য সত্যিই উপভোগ্য। মনে হয় কবে সশরীরে পাথরায় যাব আর ইয়াসিন পাঠানের সঙ্গে দুটো কথা বলব। গ্রামবাংলার এমন এক মুসলমানকে চোখে দেখারও পুণ্য আছে। সে তো আর হিন্দুর মন্দির বলে আলাদা করে কিছু জানে না। তার চেতনায় ধর্মের উগ্রতা বা প্রবল স্বাতন্ত্র্য নেই। হিন্দুর হারিয়ে যাওয়া মন্দিরশ্রেণীর গৌরব পুনরুদ্ধারে সে জান কবুল করে দিয়েছে।

সমীরণবাবুকে সেলাম পাথরার মন্দিরগুলিকে আশ্রয় করে ইয়াসিন পাঠানের কাহিনি শোনানোর জন্য। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে জানালেন রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাওয়া সত্ত্বেও এ তথ্যচিত্রটি কিন্তু কিছুতেই দূরদর্শনে দেখানো হচ্ছে না। কর্তৃপক্ষ নানা কারণ দর্শিয়ে প্রদর্শন বন্ধ রেখেছেন। তথ্যচিত্রটিতে একটি বিখ্যাত মসজিদ ভাঙার — বিলীন করে দেওয়ার তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে বলেই কি কর্তৃপক্ষের এই উদাসীনতা? অথচ ইয়াসিন পাঠানের উদ্যোগের কথা তো দেশের ঘরে ঘরে প্রচারিত হওয়া জরুরি।

চিঠিপত্র

প্রসঙ্গ : কালজয়ী রবীন্দ্রসঙ্গীত

কার্তিক-চৈত্র, ১৪০৭ সংখ্যা 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রসঙ্গীতচিন্তায় নব সংযোজন' গ্রন্থসমালোচনাটি পড়লাম। আমার বইতে 'প্রসঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীত : স্রষ্টা, শিল্পী এবং শ্রোতা' প্রবন্ধটির সূত্র ধরে গ্রন্থসমালোচক লিখেছেন, ... "একবার দিলীপকুমার রায় তাঁর স্বকীয় ভঙ্গিতে গেয়ে ' হে ক্ষণিকের অতিথি' গানটি কবিকে শোনান। কবিকে আরও কয়েকজন শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। গান শেষ হলে হর্ষোৎফুল্ল শ্রোতারা সাধুবাদ জানালেন শিল্পীকে। স্মিতহাস্যে শিল্পী বললেন, আমার নিজস্ব ভঙ্গিতে গাওয়া আপনার গান কেমন লাগল? রবীন্দ্রনাথ মুখে বলেছিলেন, তোমার নিজস্ব ভঙ্গি আমার ভালই লেগেছে। শিল্পী বলেছিলেন, আপনি অনুমতি দিলে গানটি রেকর্ড করতে পারি। তার উত্তরে কবি বলেন, গানটি তুমি গ্রামোফোনে দিতে চাইছ — তা দিও। কিন্তু এই ঘটনার ন দিন পরে সাহানা দেবীকে একটি চিঠিতে কবি লিখছেন, হে ক্ষণিকের অতিথি মস্ট সেদিন গেয়েছিল — সুরের মধ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটায়নি। তার মধ্যেও যে ধাক্কা লাগিয়েছিল সেটাতে গানের ভাবের চাইতে ভঙ্গি প্রবল হয়ে উঠেছিল। দেখলুম, শ্রোতাদের ভালো লাগল। তা থেকে অনুমান করা যায় খুব একটা পছন্দ না হলেও কবি গানটি রেকর্ড করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সে রেকর্ড বেরয়নি। সংশয় জাগে, রবীন্দ্রনাথ কী পরবর্তীকালে তাঁর অনুমতি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন? এর সদুত্তর কমলাকান্তবাবু দেননি।"

গ্রন্থসমালোচকের মনে যে সংশয় জেগেছে, সেই সংশয় আমার মনে জাগেনি। আর কী করেই বা জাগবে? রবীন্দ্রনাথের মতো একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি সকলের সামনে অনুমতি দিয়ে পরবর্তীকালে আবার তা আড়াল থেকে গোপনে গোপনে প্রত্যাহার করে নেবেন, এটা আদৌ সম্ভব নয়। প্রকাশ্য সভায় কোনও ঘোষণা আবার সভা ডেকেই প্রত্যাহার করতে হয়। সংবাদপত্রে বিবৃতি অথবা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রত্যাহার করা যায়। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে রকম কিছু হয়েছে বলে জানা নেই। ঘটনাটি ১৯৩৮ সালের। দীর্ঘকাল ধরে ব্যাপারটা নিয়ে কোনও রকম আলোচনা কেউ করেননি। কর্তব্যবোধে আমিই আবার ১৯৪৮ সালে বিষয়টির প্রতি রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুরাগী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। দীর্ঘকাল ধরে আমি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আলোচ্য প্রসঙ্গে চিঠিপত্র এবং প্রবন্ধ প্রকাশ করি। পত্রিকাগুলি হচ্ছে : কথাসাহিত্য — বৈশাখ ১৩৯১, পরিবর্তন — ৯-৫-৮৪, দেশ — ১৮-৫-৮৫, যুগান্তর — ২১-৬-৮৮, কথাসাহিত্য — বৈশাখ, ১৯৮৯, আনন্দবাজার — ৩০-৫-৯১, ওভারল্যান্ড — ২২-১২-৯১। আশ্চর্যের বিষয় প্রসঙ্গটি আট বছর ধরে ছাপা পত্রিকায় সাতবার উথাপন করেও আমি কারুর কাছে কোনও রকম সংশয়ের কথা শুনিনি অথবা কোনও বিশেষ প্রশ্নও পাইনি। কাজেই আবার বলব, আমার সিদ্ধান্তটিই এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর : 'অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও দিলীপকুমার যে রেকর্ডটি করলেন না, এতে তাঁর মহত্ত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়।'

পঞ্চম অনুচ্ছেদের প্রথম অংশে রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে হিসাবটা রয়েছে, সেটা এখন বাতিল। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত ৬৩ খণ্ড স্বরবিতানের মোট ১৯৩৩ টি গানের মধ্যে ৫৫২ টি গানে সুরের উল্লেখ আছে আর বাকি গানে সুরের উল্লেখ নেই। একই অনুচ্ছেদে সমালোচক বলেছেন, "ইচ্ছামত তাঁর গান গাইবার অধিকার আজ আমাদের নেই। ..... জনরুচিকে উপেক্ষা করে কেবল আইনের জোরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শুদ্ধতা রক্ষা করা যাবে?" কপিরাইটের মেয়াদ তো ফুরল। ব্যাপারটা হচ্ছে, কপিরাইট থাকতেই তো আমরা ব্যতিক্রমী শিল্পীদের হরেকরকমের খেল্ দেখলাম। কিন্তু কিছু হেহ্-ফের হল কি? সুনির্দিষ্ট কথা ও সুর এবং মমতাপূর্ণ শব্দোচ্চারণ সমন্বিত গায়ন-শৈলীর শতাধিক বৎসর কালব্যাপী অবিরাম প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে রবীন্দ্রসঙ্গীত এখন বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক মানসলোকে স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। বাইরের দু-চারটে ঝড়-ঝাপটা সহ্য করার এবং সব রকমের আঘাত উপেক্ষা করার মতো শক্তি এখন এই গানের আছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতকে কালজয়ী বলায় সমালোচক প্রশ্ন করেছেন, রবীন্দ্রনাথকে কতগুলি গান কালজয়ী হয়েছে? (অনুচ্ছেদ-৬) উত্তরে বলি, অখণ্ড শিল্পকর্মকেই কালজয়ী বলা হয় — শিল্পকর্মকে খণ্ডে খণ্ডে যাচাই করে কালজয়ী বলার রীতি কোথাও আছে কি না জানা নেই। সারাজীবন গান গেয়েই জেনেছি রবীন্দ্রসঙ্গীত কালজয়ী। তা ছাড়া, বহু বিখ্যাত ব্যক্তিও রবীন্দ্রসঙ্গীতকে কালজয়ী বলেছেন যাঁদের মধ্যে রয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৈয়দ মুজতবা আলি, ড. কালিদাস নাগ, আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং মৈত্রেয়ী দেবী

প্রমুখ বিদগ্ধ রসিকজন। বলাবাহুল্য এঁদের কেউ রবীন্দ্রনাথের বাছা বাছা গান যাচাই করে কালজয়ী বলেননি। গ্রন্থসমালোচকের প্রশ্ন — রবীন্দ্রনাথের যে গানগুলি প্রতিনিয়ত শোনা যায়, সেগুলি একঘেয়ে লাগে কেন। এর উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন করব, বেশি শুনলে কোন গান এবং কার গান একঘেয়ে লাগে না? এক শ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত শ্রোতা আছেন, যাঁদের কাছে কেবল রবীন্দ্রনাথের গানই একঘেয়ে। দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত এবং অন্যান্য রচয়িতাদের গান সম্বন্ধে এঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন এবং নির্বিকার। এঁদের একমাত্র লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর গান। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর এবং পরিবেশনভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে এঁরা নিজেদের পছন্দসই করে নিতে চান। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বাংলা সঙ্গীতের নুতন ধারাকেই আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বঙ্গসংস্কৃতির সম্পদ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। (প্রবন্ধ : জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য। গ্রন্থ : বাঙালীর সংস্কৃতি)

গ্রন্থসমালোচক আরও বলেছেন, (অনুচ্ছেদ - ৬) "চার হাজার রবীন্দ্রগানের ইশকুলে কয়েকটি গাইতে শেখানো হয়। এবং সাহস করে বলি তথাকথিত কালজয়ী গানগুলির অধিকাংশ রাগাশ্রিত আর ভাঙা গান। তা হলে কবির মৌলিক শিল্পকর্মগুলির, যেখানে তিনি নিজের খেয়ালে সুর দিয়েছেন, যুগের নিয়মে সেগুলি খারিজ হয়ে যাবে?" একটা ব্যাপার, সমালোচক তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে সমগ্র আলোচনার কোথাও কোনও প্রামাণিক তথ্য উদ্ধৃত করেননি, — এখানেও নয়। বর্তমানে অধিকাংশ শিক্ষাব্যবস্থা এবং সিলেবাসই যখন পদ্মপত্রে নীরের মতো আজ আছে কাল নেই, তখন কতকগুলি গানের ইস্কুলে কী গান শেখানো হয় এবং কীভাবে, তা নিয়ে মাথা ঘামানো কেন? আবার বলছি, বিখ্যাত ব্যক্তিদের কেউ যখন গান বেছে বেছে কালজয়ী বলেননি, তখন তা নিয়ে তর্ক নিরর্থক। একশো বছর কবে পেরিয়ে গেছে। দুটো সহজ সুরের হালকা গানই তো দু-দুটো রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত। উল্লেখ্য, এই দুটি গানের স্বরলিপির কোনওটিতেই সুরের উল্লেখ নেই। তার মানে, এই দুটো গানই কবির মৌলিক শিল্পকর্মের মধ্যে পড়ে। এখনও কী সন্দেহ আছে? কালের গতিতে সমালোচকের দেওয়া ওই 'তথাকথিত' অলঙ্কারটি জীর্ণ হয়ে, খসে পড়ে যাবে, — মহাকালের মহাকাশে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে থাকবে শুধু একটি নাম 'কালজয়ী'।

.... "এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানের সুর তাঁর অর্ধচেতন এবং অবচেতন মনের সৃষ্টি। আবেগপ্রসূত ও স্বতঃস্ফূর্ত।" (অনুচ্ছেদ - ৭) সমালোচকের এই বক্তব্যের উত্তরে বলতে হয়, এটা ধারণা নয়, এটা ঘটনা। অবনীন্দ্রনাথই বলেছিলেন "আবেগপ্রসূত ও স্বতঃস্ফূর্ত।" তিনি আরও বলেছিলেন "নিত্যকার হাওয়ার মত যা বইল তার ফল রবীন্দ্রসঙ্গীত। এ যেন বসন্তের পাখি কোথা থেকে সুর পেলে কেউ বলতে পারে না। ... রবিকার মনের ভিতরে সুর ধরল, সেই ভিতর থেকে যা বের হল তাই রবীন্দ্রসঙ্গীত। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মহত্ত্বই এখানে। রবিকার মনে সুর স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুটে উঠল। সুরের যে গভীরতম দিক, তা মনের ভিতরে প্রবেশ করে যা প্রকাশ হল, তাতে আমাদের সবার প্রাণ কাঁদিয়ে দিয়ে গেল।" (আমাদের পারিবারিক সঙ্গীতচর্চা, অবনীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড)

দিনেন্দ্রনাথ বলেছেন, "কবি হয়তো জানেন না কেমন করে সুরগুলো আপন গতিবেগের প্রেরণায় আপনি decorative design গুলো তৈরী করল — যার আরম্ভও নেই, শেষও নেই। যে সুরটা গড়ে উঠল, সেটা কালোয়াতিও নয়, বাউলও নয়। তা সম্পূর্ণ খেয়ালি।" (দিনেন্দ্র রচনা সঙ্কলন) এই অনুচ্ছেদের শুরুতে গ্রন্থসমালোচক লিখেছেন, "তাঁর সহায়কগণ স্বরলিপিকার পরিচয়ে সন্তুষ্ট থেকে গেছেন, সুরারোপে তাঁদের ভূমিকা অস্বীকৃত থেকে গেছে।" — রবীন্দ্রনাথের 'সকল গানের ভাণ্ডারী' দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহায়ক স্বরলিপিকার। রবীন্দ্রনাথের সুরারোপ সম্পর্কে দিনেন্দ্রনাথের উপরিউক্ত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কেউ কি বিশ্বাস করবে যে রবীন্দ্রনাথের গানে সুরারোপের ক্ষেত্রে স্বরলিপিকারদের ভূমিকা ছিল এবং থাকলে তা অস্বীকার করা হয়েছে? ক্ষিতিমোহন সেন একবার গায়ক অশোকতরুকে বলেছিলেন, ... "তাঁর গান রচনার সময় আমি কাছ থেকে দেখেছি — তাঁর আত্মসচেতনতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হত, তখন দেখতে পেতাম সত্যিকারের রবীন্দ্রনাথকে — যেন একেবারে খোলস ছাড়ানো ন্যাংটো মানুষ।" (বাঙালীর প্রাণের বীণার সুরে যে কেবলই উঠেছে গান গেয়ে।" — সুধীর চক্রবর্তী, দেশ : ২৫ জুলাই, ১৯৯৮) উপরিউক্ত মন্তব্যগুলির নিরিখে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানের সুর তাঁর অর্ধচেতন এবং অবচেতন মনের সৃষ্টি এবং তা আবেগপ্রসূত এবং স্বতঃস্ফূর্ত — এমন একটা ধারণা যদি সত্যিই বদ্ধমূল হয়ে থাকে, তবে তার ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন আছে।

এই অনুচ্ছেদে (৭) গ্রন্থসমালোচক আরও লিখেছেন, "এ বিষয়ে লেখক কবির যে বক্তব্যটি শিরোধার্য করেছেন, তা হল 'ক্ষণে ক্ষণে এ রাগিণী ও রাগিণীর আভায পাই ধরিতে পারা যায় না।' কথাটি অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর। তিনি সচেতনভাবে প্রথাসিদ্ধ প্রকরণ ভেঙেছেন, এই মত মেনে নেওয়াই ভাল যেমন সুদক্ষ কবিরা ছন্দ মেনে ছন্দ ভাঙেন।" — কথাটি অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর তো হবেই। কেননা, সমালোচকের বক্তব্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের যে উদ্ধৃতিটুকু রাখা হয়েছে, তার সঙ্গে আরও একটু যোগ করতে হবে, কারণ, এটা বাদ পড়ে গেছে। বাদ-পড়া কথাগুলি হচ্ছে, "ঠিক যেমন বাউলের গানে হয়।" — বাউলদের

গানে "ক্ষণে ক্ষণে এ রাগিণী ও রাগিণীর আভাস পাই কিন্তু ধরিতে পারা যায় না" মন্তব্যটি শিরোধার্য করতে পারলে রবীন্দ্রনাথ কী অপরাধ করলেন? তিনিও তো জীবনে কখনও রাগসঙ্গীত শেখেননি। রবীন্দ্রনাথের সচেতনভাবে প্রথাসিদ্ধ প্রকরণ ভাঙার কথা মেনে নেওয়ার যেমন কোনও উপায় নেই, ঠিক তেমনই উপায় নেই তাঁর আনাড়িত্বকে বিনয় বলে মেনে নেওয়ার। এগুলো মেনে নেওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথের 'সঙ্গীতচিন্তা' বইটাকেই তো ছুড়ে ফেলে দিতে হয়, কারণ, এই বইটার সর্বত্রই দেখা যায় তাঁর গান না-শেখার, না-জানার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। উদ্ধৃতি তুলে আলোচনা করতে হলে লেখাটা আরও দু-পাতা বেড়ে যাবে তাই বিরত থাকছি। তবে নমুনা হিসাবে একটি স্বীকৃতি উদ্ধৃত না করে পারছি না। .... "বাল্যকালে আমি গান শিখি নি — এত সহজে শেখা যায় না, শিখতে কষ্ট হয়, সেই কষ্ট আমি নেই নি"। (সঙ্গীতচিন্তা, সংস্করণ ১৩৯২, পৃঃ ২৬১) প্রশ্ন হচ্ছে, এটা স্বীকারোক্তি না ক্ষেদোক্তি? এটাকে বিনয়বচন বলে উপেক্ষা করা যাবে কী কৌশলে?

সাধারণ মানুষের মুখে মুখে রবীন্দ্রসঙ্গীত এত জনপ্রিয় হয়েছে। এই গান যে 'নাকি সুরের ন্যাকামি', 'মেয়েলি' এই দুর্নামও সেই সহজতার কারণে।' (৯) এই বক্তব্যের উত্তরে বলব যারা রবীন্দ্রসঙ্গীতের শ্রোতাই নয়, তারা যদি এইসব শব্দ প্রয়োগ করে তাহলে বলার কী থাকতে পারে। 'আকাশ ভরা সূর্য তারা' গানটির সুর খুবই সহজ এবং এটা সর্বত্র গাওয়া হয়। এই গানটা শুনে যদি কেউ 'ন্যাকামি' অথবা ' মেয়েলি' বলে, তবে তার সম্বন্ধে করুণা বোধ না করে পারা যায় না। একটি রচনায় সৈয়দ মুজতবা আলি মন্তব্য করেছেন, "রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলতেন যে তিনি তাঁর গানে প্রকৃতিকেও হার মানাতে পেরেছেন এবং সে গর্বটুকু একটি গানে অতি অল্প কথায় প্রকাশ করেছেন।" (ময়ূরকণ্ঠী) গানটি হচ্ছে "বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল।" অত্যন্ত সহজ সুরের আর্তিভরা এই গানটি শুনে যদি কেউ 'মেয়েলি' বলে, আমরা তাকে কী বলব? সমালোচক আরও বলেছেন, "যেখানে যুক্তির সমর্থন নেই, শৃঙ্খলা নেই, তাকে প্রতিভাবানের স্বতঃস্ফূর্তি না বলে খামখেয়ালি বলাই ভাল" — তা বলা যায়, বলতে বাধা কী। তবে 'Nothing succeeds like success'। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তা-বড় তা-বড় সব রসিকজনের মতে রবীন্দ্রনাথের গান যখন কালজয়ী বলে বিবেচিত হয়েছে, তখন যুক্তির সমর্থন, শৃঙ্খলা, প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্তি — সবই আছে। অবশ্য খামখেয়ালি বলায় আপত্তি নেই। গান-বাঁধার ক্ষেত্রে দিনেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই এটা বলেছিলেন।

নমস্কারান্তে

কমলাকান্ত বরাট
জগাছা
হাওড়া

পুনর্মুদ্রণ

মহাসত্ব

অমিয়ভূষণ মজুমদার

সম্প্রতি প্রয়াত অমিয়ভূষণ মজুমদার স্মরণে চতুরঙ্গ (বৈশাখ ১৩৬০, ১৫শ বর্ষ ১ম সংখ্যা) থেকে তাঁর মহাসত্ব নাটিকাটির পুনর্মুদ্রণ শুরু হয়েছিল চতুরঙ্গের গত সংখ্যায় (৬১ বর্ষ ২ সংখ্যা)। এ সংখ্যায় শেষ করা হল। — সম্পাদক

বীরসেন। এ ভাবে রাজকোষ পূরণ কি অন্যায় হবে?

নগরপাল। রাজকুমার, কৌটিল্যে নিষেধ নেই বরং—

চন্দ্রসেন। সোমলতাকে এ স্তরে নামিয়ে আনা—

নগরপাল। না উঁচুতে তোলা।

বীরসেন। বয়স্য চন্দ্রসেন, তোমার কি অন্যপ্রকার— সোমলতার সাথে দেখা হবার পর থেকেই যেন অপেক্ষাকৃত নির্বাক হয়ে গেছ, পাহাড়পুরের কথায় কয়েক পংক্তি কবিতাই যেন ব'লে ফেললে। (কৌতুকের হাসি)

চন্দ্রসেন। না রাজকুমার, কোনও অভিপ্রায়ই আমার নেই, কিন্তু—

নগরপাল। আমরা সোমলতাকে যত বড় ভাবছি আসলে সে হয়ত তা নয়। আজকের মহলা শেষ হবার পরই আমরা বুঝতে পারব, সামান্য নটীর চাইতে সে কত বড়। রাজকীয় গণিকার সম্মান তাকে দেয়া যায় কিনা।

বীরসেন। আপনার বাস্তবজ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ। নাটকের আর দেরী কত? এদিকে শ্রেষ্ঠী তো ঘুমিয়েই পড়েছে।

জয়পাল। উঁ হুঁ হুঁ, আজ্ঞে না। আমি ঘুমোইনি, একটা তন্দ্রা। রাজকোষ পূরণ না কী বলছিলেন। আজকাল বড় খরচ-খরচা। গত মাসের ব্যয়-আয়ের চাইতে একুশ কার্যাপন বেশি ছিল।

বীরসেন। ঠিকই শুনেছেন, চিন্তার কথাও বটে। কবি, শ্রেষ্ঠীকে আর কষ্ট দেয়া উচিৎ হবে না। তুমি দেখ, আচার্য্যমশাই কোথায়। নান্দীর কাজটা তিনি সংক্ষেপে সেরে নিন।

(কবি পূর্বদিকের প্রকোষ্ঠটির দিকে চলে গেল।)

বীরসেন। মহারাজা বল্লাল সেন কেন সুবর্ণবণিকদের সমাজে অধঃপাতিত করেছিলেন এখন তা বোঝা যাচ্ছে। এই এক দেশ যেখানে বণিক সম্প্রদায় নিজেদের রাজধানী স্থাপন করত। রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করত।

চন্দ্রসেন। শুধু তাই নয়, দেশের অর্থসম্পদ তাদের অধিকারে থাকায় রাজশক্তিকে তারা স্তম্ভিত ক'রে রাখত।

নগরপাল। শুনেছি মহারাজা বল্লাল সেনের রাজত্বের প্রথম দিকে সুবর্ণবণিকদের সৈন্যবাহিনী নৌ-বাহিনীও থাকত। এবং অর্থবলে বলীয়ান বণিকদের সৈন্যবাহিনী রাজকীয় সৈন্যবাহিনীর চাইতে সুসজ্জিত ছিল।

চন্দ্রসেন। রাজার যে কোনও অভিযান, যে কোনও শাসন প্রস্তাবকে বানচাল ক'রে দেয়ার ক্ষমতা ছিল তাদের।

বীরসেন। আমি শুধু ভাবি কতখানি রাজনীতি জ্ঞান থাকলে সামাজিক শক্তিগুলিকে এমন ক'রে কাজে লাগান যায়। তাদের ক্ষমতা ছিল, জনবল ছিল তবু সমাজের জনসাধারণ তাদের চায়না এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। এবং এটা বুঝতে পারা তখনকার দিনে সহজসাধ্য ছিল না।

নগরপাল। সে সব চাঁদসদাগরের চাইতে আমাদের জয়পাল অনেক ভাল। এই বৌদ্ধ বণিকদের অর্থ ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ে দৃষ্টি দেয়ার উৎসাহ নেই। আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

(কবি ফিরে আসছে এমন সময় পুরুষদের নেপথ্যগৃহ থেকে সূত্রধারও প্রবেশ করল।)

সূত্রধার। রাজকুমার, নবীন মঞ্চ ও তার বৃদ্ধ সূত্রধার আপনার পৃষ্ঠপোষকতায় ধন্য হয়েছে।

বীরসেন। আমিও ধন্য হবার আশা রাখি নাটক দেখে।

সূত্রধার। আপনি অনুগ্রহ ক'রে মঞ্চে আরোহন করুন, নেপথ্যে নট-নটীরা আপনার আশীর্বাদের জন্য সমবেত হ'য়েছে। রাজ-আশীর্বাদের পর আমি নান্দীর সূত্রপাত করব। কিন্তু তারও আগে আমার একটি আবিষ্কারের সাথে আপনাদের পরিচয় ক'রে দেব। সোমলতা, এদিকে এস—

(সোমলতা নটীদের সাজঘর থেকে প্রবেশ করল। ছেলেদের মতো কাছা দিয়ে কাপড় পরা, গায়ে একটা মেরজাই জাতীয় জামা, ওড়নাটা গলার দুপাশ দিয়ে ঝুলছে, চুলগুলি কপালে, গলায় বাহুতে লোটাচ্ছে।)

কবি। এ কি?

বীরসেন। এটা কি রঙ্গসজ্জা?

সূত্রধার। বৃদ্ধ আচার্য্যের শেষ দুঃসাহস।

চন্দ্রসেন। সোমলতা কি নারীর অভিনয় করছে না! সে কি নায়িকা নয়?

সূত্রধার। নাটকের গল্পটা শুনুন, কোটালকন্যা ময়নামতী বড় দজ্জাল, বড় দয়াবতী। সে তীর চালনায় সেনাপতিপুত্রকে হারিয়ে দিয়েছে, রথ চালনায় সুতপুত্রকে। সে পুরুষের বেশে রাজধানীর সর্বত্র হই হই ক'রে বেড়ায়। রাজপুরী থেকে অনুযোগ হ'য়েছিল, কোটাল তাকে শাসনের চেষ্টাও করেছে, কিন্তু একমাত্র কন্যাকে পিতা কি শাসন করতে পারে! রাজপুত্রকেও হয়ত কোনও না কোনও বিষয়ে হারিয়ে দিত কিন্তু রাজার পুত্রই ছিল না মোটে। অনেক যাগ্‌যজ্ঞের পর রাজার রাজপুত্র হ'ল, কিন্তু গণক গুণে বললেন পরমায়ু ছ'মাস। কি উপায়? উপায় এই যদি কোনও ষোড়শী সতী তার জন্য বেহুলার মতো তপস্যা করে। কে সে ষোড়শী? গুণে দেখা গেল কোটালকন্যা। তিন দিনের রাজকুমারের সাথে ষোড়শী কোটাল কন্যার বিয়ে হ'য়ে গেল, এইখানে নাটক আরম্ভ। সোমলতা কোটালকন্যার অভিনয় করছে। আপনি অনুমতি করুন, আমি কাজ আরম্ভ করি। (একখানি পাণ্ডুলিপি দিল রাজকুমারকে।)

বীরসেন। কি অদ্ভুত কল্পনা। (হো হো ক'রে হেসে উঠল)

নগরপাল। রাজকুমারের মৃত্যু দৃশ্যও আছে। সেখানেই হাস্যরস সব চাইতে তীব্র। কোটালকন্যা ছ'মাসের রাজপুত্রকে কোলে নিয়ে 'হা নাথ' ক'রে শোকও করেছে।

বীরসেন। বল কি! পুরোপুরি বিলাপও আছে নাকি?

কবি। কবিবর ধোয়ী বলেন, রস ব্যাভিচারেই নাকি হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে।

বীরসেন। ঠিকই বলেছে। কিন্তু কবি, এ যদি নাথ-বৌদ্ধদের সমাজকে বিদ্রূপ ক'রেও লিখে থাক, কোথাও প্রকাশ্যে তাদের আক্রমণ করনি তো? দেখো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে রাজরোষে পড়তে না হয়।

(সোমা কী বলতে গেল, তাকে থামিয়ে দিয়ে সূত্রধার কথা বললে)

সূত্রধার। আমি বলছি মা, আমাদের সোমলতা বলে, ময়নামতীর বিলাপগুলি নাকি বাংলায় বলতে পারলে ভাল হয়। কবি রাজি হ'চ্ছেন না। ভারতশাস্ত্রের নজির দেখাচ্ছেন।

চন্দ্রসেন। সত্যি কথাই, কোন কাব্যে বাংলা ভাষার স্থান আছে, বাংলা কি কাব্যের ভাষা হতে পারে?

সূত্রধার। এ বিষয়ে কবির সাথে অনেক কথা কয়েছি। আমি বলি, আজকের মহলায় সোমাকে দু'একবার বাংলায় কথা বলতে দিয়ে দেখুন।

কবি। আচার্য্য আপনার বাংলাপ্রীতি অস্বাভাবিক। মনে হয় কোনও উদ্দেশ্য আছে। আমি আবার বলছি, নাট্য-কাব্যে দেশিভাষার স্থান হ'তে পারে না। অকারণ মহলার সময় নষ্ট ক'রে কী হবে?

সূত্রধার। উদ্দেশ্য আছে। এ রকম বিষয়বস্তু নিয়ে, এ রকম চারিত্রিক সংঘাত নিয়ে নাটক হয় এ আমি জানতাম না। সর্বৈশ্বর্য্যময়ী ষোড়শীর সাথে তিন দিনের শিশুর বিবাহ যতই অবাস্তব হোক, প্রতি অঙ্কে আমাকে দ্বিধা করতে হ'য়েছে। লঘু হাস্যকৌতুকের সুরে চলতে পারিনি। আচ্ছা কবি এ সম্বন্ধে আপনার নিজের মত কী?

কবি। আপনি আমার প্রতি কোনও অজ্ঞাত কারণে বিরূপ হয়েছেন, এই আমার মত।

সূত্রধার। না, না, কবি। আমার মনে হয় বিপরীত রসের সমন্বয়ে এতে একটা গূঢ় সত্যের প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে। কাঁটা আর গোলাপ, পদ্ম আর পঙ্কে যেমন একটা তৃতীয় সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, এও তেমনই। এর জন্যই আমার পুরানো প্রধান নটীকে বাদ দিতে হয়েছে। সে এই দুই বিপরীতের সমন্বয় করতে না পেরে উৎকট হাস্যরসের সৃষ্টি করছিল।

কবি। (হাসতে হাসতে) কি সাংঘাতিক।

সূত্রধার। সত্যি বলছি কবি, সোমার অভিনয়ই আমার চোখে সত্যের আবরণ খুলে দিয়েছে। মাঝে মাঝে মহলায় প্রাকৃত ভাষার বদলে সে যখন বাংলায় কথা ক'য়ে ওঠে তখনই এই চমৎকার ব্যাপারটা ঘটে। তখনই নাটকটি নিছক হাস্যরসের অনেক উর্ধ্বে উঠে যায়। ময়নামতীর বুকে বাৎসল্য ও আদিরসের সন্নিপাতে নারীমনের যে দ্বৈত রূপটি ফুটে ওঠে সেটা কবির বৈপ্লবিক সাহসের পরিচয়।

কবি। আপনি এরই প্রশংসা করছেন? আপনার কাছে বোধ হয় কবিবর ধোয়ীর মতামতেরও খুব একটা মূল্য নেই।

বীরসেন। দাঁড়াও কবি, আচ্ছা সূত্রধার আপনি সত্যি নারীমনের এই বিপরীতমুখী বৃত্তিগুলি নাটক দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন?

সূত্রধার। পারব, না সোমলতা? সোমলতা বলে প্রায় এ রকমই একটা নাটক ওদের দেশে গ্রাম্য ভাষায় পাওয়া যায়, প্রায় একই রকম কাহিনি।

বীরসেন। কাহিনিটা ওদের দেশে প্রচলিত?

সোমলতা। আমরা কখনও কখনও দিশি ভাষায় অভিনয়ও করেছি।

নগরপাল। এ কথা তো আমাকে বলোনি, কবি।

কবি। বন্ধু নগরপাল—

বীরসেন। না কবি লজ্জার কিছু নেই। প্রচলিত কাহিনি নাট্যকাররা ব্যবহার ক'রে থাকেন, কালিদাস ভবভূতিও করেছেন।

চন্দ্রসেন। কিন্তু আমরা যে হাস্যরসের আশ্বাস পেয়েছি, সেটা কি তারপরও পাওয়া যাবে?

সূত্রধার। হাস্যের বদলে মধুর পাওয়া যাবে, কী হবে বলতে পারি না। অনুমতি করুন নাটক আরম্ভ করি। ওদের সকলকে মাঙ্গলিক সঙ্গীতের জন্য প্রস্তুত হ'তে বল সোমলতা। (সোমলতা নটীদের সাজঘরের দিকে চলে গেল) রাজকুমার—

বীরসেন। হ্যাঁ আচার্য্য মশাই আপনি আরম্ভ করুন।

(সূত্রধার পূর্বদিকের ঘরখানিতে প্রবেশ করল। ঠিক এমন সময়ে মুণ্ডিত মস্তক পীতবাস একজন শ্রমণ এসে দাঁড়াল সোপানগুলির কাছে। প্রায় একই মুহূর্তে সাঙ্গী দু'জন সোপানের উভয় প্রান্ত থেকে এসে শ্রমণের পথরোধ ক'রে দাঁড়াল। শ্রমণ গৌরবর্ণ, সে অতিশয় দীর্ঘ ও শুভ্র। তার মুখাবয়বে বৈশিষ্ট্য আছে, ঠিক বোঝা না গেলেও কোথায় যেন একটা মোঙ্গলীয় ভাব আছে।)

শ্রমণ। এখানে নাটক হচ্ছে বাপু, এখানে নাটক হবে শুনছি?

প্রথম সাঙ্গী। (রূঢ়ভাবে) তাতে তোমার কি?

দ্বিতীয় সাঙ্গী। আহা হা করো কি? অমন করে বলে? দেখুন মহাশয় এখানে একটা নাটক হ'চ্ছে আপনার যে সব বিষয়ে প্রয়োজন তেমন কিছু নয়।

শ্রমণ। কিন্তু ভেতরে যাওয়াটা আমার খুব দরকার হ'য়ে পড়েছে যে—

প্রথম সাঙ্গী। কঠিন সমস্যা। দেখুন মহাশয়, আপনাকে কী ক'রে নিষেধ করা যাবে বুঝতে পারছিনে, আপনি এখন অসুবিধার সৃষ্টি করছেন কেন?

শ্রমণ। (হাসতে হাসতে) জিজ্ঞাসা করলে বোলো বাধা দিয়েছিল, আমি সে বাধা মানিনি।

(কথা বলতে বলতে শ্রমণ এদের পার হ'য়ে রঙ্গশালায় প্রবেশ করল)

প্রথম সাঙ্গী। পার হয়ে গেল যে! বলপ্রয়োগ করলেও তো হ'ত।

দ্বিতীয় সাঙ্গী। কি করব বাপু, মনে কষ্ট না দিয়ে কী করে যে বলপ্রয়োগ করা যায় বুঝি না। এখন সর। (দু'জনে নিষ্ক্রান্ত হ'ল। শ্রমণ বীরসেন প্রভৃতির দিকে অগ্রসর হ'ল।)

বীরসেন। কে এ নগরপাল, ঠিক এ সময়ে—

নগরপাল। মূর্তিমান বাধা, আর কিছু বুঝতে পারছি না। শ্রমণ—(শ্রমণ হাত জোড় করল) প্রহরীরা তোমাকে বাধা দিল না?

শ্রমণ। না।

জয়পাল। আপনি কি নিমন্ত্রিত।

শ্রমণ। তাও নয়।

চন্দ্রসেন। কিন্তু এটা তো উপাসনাগৃহ নয়, রাজার দরবারও নয়।

শ্রমণ। কোথায় কী হবে এ কি কখনও বলা যায়?

কবি। দেখ শ্রমণ, তোমাদের এসব আজগুবি ধরনের কথাবার্তা তার রহস্যজনক ব্যাখ্যা অলস অবসরে ভাল লাগে—

শ্রমণ। সব ব্যাপার ভাললাগার মতো হ'য়ে ঘটে না। স্পৃহাহীন হ'তে পারলে অবিচলিত থাকা যায় মাত্র। আমি রাজকুমার বীরসেনের সাথে আলাপ করতে ইচ্ছা করি।

বীরসেন। আপনার ইচ্ছাটাকে আপনি কি বিশ্বের পরিচালক শক্তি বলে মনে করেন? বীরসেনকে সে শক্তি আপনার সাথে আলাপ করতে বাধ্য করবে?

শ্রমণ। ইচ্ছাশক্তির কি শেষ আছে? ইচ্ছা করলে কুষ্ঠি হওয়া যায়, ইচ্ছা করলে মরা যায়; ইচ্ছা করলে নীরোগ হওয়া যাবে না কেন, চিরজীবী হওয়া যাবে না কেন?

নগরপাল। (বিদ্রূপ ক'রে) আপনার ইচ্ছাশক্তির ক্ষমতা আমরা দেখলাম, অশিক্ষিত প্রহরীরা পথ ছেড়ে দিয়েছে।

শ্রমণ। না, ওরা ঠকেছে। মিনতি নয়, বলপ্রয়োগ নয়, শুধু ইচ্ছা জানানো—এ অবস্থায় কী করা যায় তা ওরা এখনও শেখেনি।

বীরসেন। আপনি সুন্দর আলাপ করতে পারেন, কিন্তু রাজকুমার বীরসেন আপনার ইচ্ছা হওয়া মাত্রই আলাপ করবেন কেন?

শ্রমণ। তিনি তো আলাপ করছেন আমার সঙ্গে।

বীরসেন। আপনি আমাকে চিনলেন কী ক'রে?

শ্রমণ। আপনার শিরোভূষণ আর মহারাজ লক্ষণ সেনের সাথে আপনার আকৃতিগত সাদৃশ্য। (হেসে) কোনও রহস্যজনক উপায়ে নয়।

বীরসেন। আমাকে দিয়ে আপনার কী প্রয়োজন?

শ্রমণ। বলছি, তার আগে আপনাকে জানানো দরকার আমি ভিক্ষু মহাসত্ব।

বীরসেন। মহাসত্ব!

নগরপাল। যাকে বন্দী করার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হ'য়েছে?

শ্রমণ। আমি নিজেই সে কথা বলতে যাচ্ছিলাম।

চন্দ্রসেন। কি দুঃসাহস আপনার!

কবি। আপনি মহাসত্ব! সত্পদাবলীর কবি?

শ্রমণ। হ্যাঁ কবি, লোকে তাই বলে। কিন্তু দেশের শ্রেষ্ঠ ধীশক্তিগুলির সমবেত আক্রমণে বির্পর্য্যস্ত।

বীরসেন। তোমার পরিচয় আমি পেলাম, এবার তোমার বক্তব্য?

নগরপাল। মহারাজকুমার, আমরা একটা শুভ কাজের উদ্যোগ করেছি—

বীরসেন। নগরপাল ঠিকই বলেছেন শ্রমণ, তোমার বক্তব্য অন্য সময়ে শুনলে হয় না?

শ্রমণ। আমার বক্তব্য খুব বেশি নয়। এখানে সোমলতা নামে এক নটী আছে শুনলাম, তাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি।

নগরপাল। রাজকীয় রঙ্গশালার নটী কোথাও যাবার আগে রাজকীয় অনুমতি প্রয়োজন। সেটা কি চাইবা মাত্রই পাওয়া যাবে?

শ্রমণ। কবি, সোমলতাকে একটু ডাকো না? রাজকুমার, আমি আপনার অনুমতি চাইছি।

চন্দ্রসেন। তাকে তুমি কোথায় নিয়ে যেতে চাও? সে যাবে কেন?

শ্রমণ। সোমলতাকে আমি স্নেহ করি, সে আমার শিষ্যা, তাকে নতুনতর অভিজ্ঞতার জন্য অন্যত্র নিয়ে যেতে চাই।

বীরসেন। তার সাথে আমাদের স্নেহের সম্বন্ধ নয়, কিন্তু সে আমাদের প্রজা, তদুপরি তার কলাবিদ্যা সম্বন্ধে আমরা অনেক আশা রাখি।

শ্রমণ। সোমলতার অভিনয়ে অনুপ্রেরণা দিচ্ছে তার নবীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা। এমনও হয় সংস্কৃতির আকর্ষণে সুপ্ত প্রতিভা জেগে ওঠে।

কবি। কিন্তু এই নবীন সংস্কৃতির কেন্দ্রই তো নবদ্বীপ।

শ্রমণ। আমি তাকে নবীনতর সংস্কৃতির স্বরূপ দেখাতে নিয়ে যাব।

নগরপাল। তোমার তর-টি বোধ হয় ভারতের বাইরে?

শ্রমণ। না। নতুন একটি আর্য্যস্রোত ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে। নৃতত্ত্বের হিসাবে নালন্দার পদ্ধতিতে বিচার ক'রে দেখা গেছে এরা আর্য্যজাতীয়, হূন কুশানদের মতো অনার্য্যজাতীয় নয়।

বীরসেন। আপনি ইসলামধর্মীদের কথা বলছেন?

শ্রমণ। বাংলার রাজকুমার অন্যান্য দেশের রাজকুমারদের চাইতে বেশি খবর রাখেন। তাদের ধর্মের নাম ইসলাম, কিন্তু তাতে তাদের আর্য্য হওয়াতে বাধা নেই। এদেশে আর্য্যরা যখন আসে তখন তারাও এদেশের অধিবাসীদের কাছে বিধর্মী ছিল।

(সহসা সোমলতা প্রবেশ করল)

সোমলতা। আচার্য্যমশাই, (থেমে দাঁড়াল) আমি আচার্য্যমশাইকে খুঁজছিলাম।

কবি। কেন, সোমা?

সোমলতা। নাটক সম্বন্ধে একটু দরকার ছিল।

শ্রমণ। ফুল্লরা?

সোমলতা। (শ্রমণকে চিনতে পেরে আনন্দোজ্জ্বল হ'য়ে) মহাসত্ব, আপনি?

শ্রমণ। শান্তিলাভ কর। আমি তোমাকে খুঁজছিলাম ফুল্লরা।

কবি। দেখলে, সোমাকে ডাকতে হ'ল না। এ কি শ্রমণের ইচ্ছাশক্তি?

নগরপাল। পূর্বপরিকল্পিত কিছু হতে পারে।

চন্দ্রসেন। বয়স্য রাজকুমার, আমি সোমলতাকে পাহাড়পুর সংঘারামে দেখেছিলাম সন্দেহ নেই, অথচ ফুল্লরা অস্বীকার করছে।

সোমলতা। নটীদের অনেক কারণেই মিথ্যা অভিনয় করতে হয়, রাজকুমার।

শ্রমণ। (হাসিমুখে) আপনার সাথে অপরিচিতার অভিনয় করেছে? ফুল্লরা, আর্য্য থেকে আর্য্যতর খুঁজে বেড়ানো কবে তোমার শেষ হবে? শোন ফুল্লরা, আমি তোমাকে নিতে এসেছি।

সোমলতা। অসময়ে প্রভু? রাজদরবারে অভিনয় করার এই প্রথম সুযোগ পেয়েছি, আজ প্রথম মঞ্চে নামা। এখন আমাকে কঠোর ব্রতের আদেশ করবেন না।

শ্রমণ। তুমি কি ধর্মের চাইতে কলাকে বড় ব'লে মনে কর?

সোমলতা। দাসীর অজ্ঞতা ক্ষমা করবেন প্রভু।

শ্রমণ। অজ্ঞতা নয় ফুল্লরা। আমি বিশ্বাস করি শিল্পকে অবলম্বন ক'রে তোমার যে অভিজ্ঞতা হবে সাধারণের ধর্মকে অবলম্বন ক'রেও তা হয় না। আশীর্বাদ করি তোমার এক শিল্পীজীবনে জন্মজন্মান্তর ঘটে যাক। তোমার অভিজ্ঞতা তোমার বন্ধন মোচন করুক।

সোমলতা। আপনার অনুমতি পাব আমি জানতাম।

শ্রমণ। না ফুল্লরা, কথা তোমার শেষ হয়নি। যে সংস্কৃতি তোমার অভিনয়-শিল্পের অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে তার চাইতে শক্তিশালী সংস্কৃতির সন্ধান আমি পেয়েছি।

সোমলতা। তার চাইতেও বড়, কোথায় প্রভু? আমরা কনৌজের কথা শুনেছি, সেখানে কি?

শ্রমণ। না, বাংলার দরজায়, যাবে?

সোমলতা। আপনি অপেক্ষা করুন, আমি প্রস্তুত হয়ে আসি। (সোমলতা সাজঘরে প্রস্থান করল)

চন্দ্রসেন। কি আশ্চর্য্য।

নগরপাল। ব্যাপারটা এই? (একটু থেমে) শ্রমণ, তুমি একটি নারীকে প্রবঞ্চিত করছ।

কবি। সোমার এই ভুল ভাঙতে হবে, নগরপাল।

নগরপাল। সোমা তোমাকে বিশ্বাস করে, তার অন্যায় সুযোগ নিচ্ছ তুমি।

শ্রমণ। আমি প্রতারণা করি না।

নগরপাল। তুমি কি সত্যি বিশ্বাস কর, ইসলামীদের কৃষ্টি সেন কৃষ্টির চাইতে মহত্তর?

শ্রমণ। সেন কৃষ্টি ও ইসলামীয় কৃষ্টি মূলত এক, কারণ দু'টিই প্রসারণশীল পরমত অসহিষ্ণু আর্য্যকৃষ্টি।

কবি। তাদের কাব্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ইত্যাদির সাথে আপনার পরিচয় আছে?

শ্রমণ। আর্য্যকৃষ্টি বৃদ্ধ হ'লে কাব্য রচনা করে, যৌবনে করে পররাজ্য জয়। সোমা সিংহ দেখতে চায়, তাকে স্থবির সেন সিংহ না দেখিয়ে যৌবনদৃপ্ত সিংহ দেখান কি অন্যায় হবে?

নগরপাল। মূর্খ শ্রমণ, তুমি বারংবার সেন কৃষ্টির প্রতি অপমানজনক ইঙ্গিত করছ।

বীরসেন। বন্ধু নগরপাল—(নগরপালের উদ্যত ক্রোধ থামিয়ে) তুমি বলছিলে শ্রমণ, ইসলামিদের কৃষ্টির সাক্ষাৎ বাংলার দ্বারদেশে পাওয়া যাবে। তোমার কথাটা ঠিক বোঝা গেল না। সোমাকে তুমি কোথায় নিয়ে যাবে?

শ্রমণ। আপাতত তাকে ইখতিয়ারউদ্দীনের কাছে নিয়ে যাব।

নগরপাল। যেন চেনা চেনা নাম। নামটা যেন আজকাল মাঝে মাঝেই কানে আসছে। এটা কি ইসলামীয়দের সাধারণ নাম?

শ্রমণ। না। ইখতিয়ারউদ্দীন বলতে আমি এক জনকেই চিনি।

বীরসেন। দাঁড়াও, দাঁড়াও। চন্দ্রসেন, তোমার সেই অশ্ব-বিক্রেতাটির নাম কি?

চন্দ্রসেন। তার নামও ইখতিয়ারউদ্দীন, নগরপাল তার নামই শুনে থাকবেন। কারণ সে অপেক্ষাকৃত কম দামে ভাল ঘোড়া দিচ্ছে।

শ্রমণ। লোকটি ভদ্র এবং রসিক। বাংলা ভাষায় কথা বলতে শিখেছে।

নগরপাল। ভদ্র এবং রসিক। তবে আর কি, কৃষ্টির অভাব কোথায়? হোক সে ঘোড়াওয়ালা, সাবাস। (হো হো করে হেসে উঠল)

কবি। তুমি হাসছ, নগরপাল? কৃষ্টির নাম ব'লে একজন ঘোড়াওয়ালার কাছে সোমাকে নিয়ে যেতে চায় আর সেই কথাতেই হাসছ? স্বপ্নপদাবলীর কবি ব'লে আপনার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা ছিল, তা আর রইল না শ্রমণ। আপনি কি সোমার সম্মানের কথা ভেবে দেখেছেন?

শ্রমণ। তুমি কি দৈহিক সম্মানের কথা বলছ? ফুল্লরা প্রতিভাবান শিল্পী। তার কাছে দেহের মূল্য, তার প্রতি মমত্ব সাধারণ গৃহস্থ নারীর চাইতে বেশি।

কবি। আর আত্মা?

শ্রমণ। হৃদয় যাদের পথ দেখায়, হৃদয়ের অভিজ্ঞতা তিক্ততর হ'লে তাদের আত্মার মুক্তির সহায়তাই করে।

চন্দ্রসেন। রাজকুমার, আমরা একটি নাটকের প্রথম রজনীর উৎসব করতে এসেছিলাম। এই শ্রমণের প্রলাপ শোনার জন্য নয়। আমাদের কাজের বিলম্ব হ'চ্ছে। আপনি শ্রমণকে ব'লে দিন—সোমা যাবে না।

বীরসেন। আচ্ছা শ্রমণ, তোমার এই ইখতিয়ারউদ্দীন তো সাধারণ একজন অশ্ব-ব্যবসায়ী, সোমার মতো শিল্পীর মূল্য সে বুঝবে? কিম্বা অন্য কথায় সোমা কি ইখতিয়ারউদ্দীন পর্যন্তই যাচ্ছে না, তার মাধ্যমে তাদের রাজার অন্তঃপুর পর্যন্ত?

চন্দ্রসেন। কবির মুখের দিকে চেয়ে দেখুন, বয়স্য, তার নাটকটা—

বীরসেন। আজ শুক্লা ত্রয়োদশী। আলোর অভাবে নাটকের বিঘ্ন হবে না। একটু দেরি হোক না। শ্রমণ, তুমি প্রসারণশীল একটি আর্য্যস্রোতের কথা বলছিলে, আর তার সঙ্গে সঙ্গেই অশ্ব-ব্যবসায়ী ইখতিয়ারউদ্দীনের কথা বলছ এমন ভাবে যেন তোমার এই আর্য্যস্রোতের সাথে সে সংযুক্ত।

শ্রমণ। বাংলার রাজকুমার অন্যান্য রাজকুমারদের চাইতে সর্তক, এ জন্য আমি নিজেকে বাঙালি হিসাবে ধন্য জ্ঞান করছি। ইখতিয়ারউদ্দীনকে আমি সামান্য অশ্ব-ব্যবসায়ী মনে করি না।

বীরসেন। তোমার স্রোতের উপমা দিয়েই বলা যাক, শ্রমণ, ইখতিয়ারদের আর্য্যস্রোত এখন কী করছে?

শ্রমণ। গাঙ্গেয় উপত্যাকার ঢালু বেয়ে গড়িয়ে আসছে বাংলার দিকে।

বীরসেন। বেশ বলেছ কথাটা। সোমলতাকে আশ্রয় দেবার মতো প্রাধান্য তুমি ইখতিয়ারউদ্দীনকে দিচ্ছ। আমার মনে হচ্ছে হয়ত বা সে সামান্য অশ্ব-ব্যবসায়ী নয়। আমি অনুসন্ধান করব। যদি তোমার এ সংবাদ সত্য হয়, তোমাকে পুরস্কৃত করব। সোমা আজ নাটকে নিযুক্ত আছে, আজ যেতে পারে না। যদি সে আদৌ যেতে চায়, তার আবেদন যথাসময়ে বিবেচনা করব।

(শ্রমণের ভ্রূ দু'টি একটু অন্ধকার হ'য়ে উঠল। হাত দিয়ে কপাল ঢেকে এক মুহূর্ত দাঁড়াল সে। তারপর তার নির্বাক মোঙ্গলীয় হাসি চোখের কোণ থেকে সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়ল।)

চন্দ্রসেন। সাধু, সাধু, বয়স্য।

বীরসেন। বয়স্য চন্দ্রসেন, হৃদয়দৌর্বল্য সর্বত্র প্রকাশ করতে নেই। (হাসল) সোমা এখনও তার সব পূর্বপরিচিতকে স্বীকার ক'রে নেয়নি।

(সোমা প্রবেশ করল। তার বেশভূষার পরিবর্তন হ'য়েছে)

কবি। সোমা, তুমি যাবার জন্য প্রস্তুত?

সোমলতা। কবি, আপনার জন্য আমার কষ্ট হবে, বিশ্বাস করুন।

কবি। আমি নতুনতর মহত্তর নাটক রচনা করব, সোমা।

সোমলতা। যদি ওদের মহত্তর সৃষ্টির ক্ষমতা না থাকে, নিশ্চয়ই আমি ফিরে আসব।

নগরপাল। কিন্তু রাজ-অনুমতি না পেলে তুমি যাচ্ছ কী ক'রে? রাজকুমার তোমাকে যেতে নির্দেশ দেননি।

চন্দ্রসেন। বরং তুমি যাবে না, তাই বলেছেন।

সোমলতা। মহাসত্ত্ব?

শ্রমণ। আমার ইচ্ছা তোমাকে নিয়ে যাওয়া। অভিনয়ের চাইতেও বড় প্রয়োজন আমার। রাজকুমার, আজ অভিনয় না হ'লেই কি নয়?

চন্দ্রসেন। তোমার যখন ইচ্ছা, তাই হ'বে হয়ত!

শ্রমণ। (মোঙ্গলীয় হাসি) অনেক রাজ্যে এ রকম হয়েছে বটে।

(শ্রমণের চোখের প্রান্ত দু'টি কুঞ্চিত হ'য়ে একটা কুঞ্চনের ঢেউ তার সারা মুখে ধীরে ধীরে প্রসারিত হ'তে হ'তে তার ঠোঁটের কোণ দু'টিতে এসে মৃদু শব্দময় হ'য়ে উঠল। সহসা দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠে সোপানের কাছেকার দেয়ালগিরি দু'টি, চন্দ্রাতপ থেকে ঝোলান গুটিকয়েক প্রদীপ, সাজঘরের দরজার উপরে দেয়ালে বসান আলোকসজ্জাগুলি নিভে গেল।)

চন্দ্রসেন। কে আলো নেভালো?

কবি। কেউ ওদিকে যায় নি তো—

(নগরপাল ছুটে সোপানের কাছে গেল)

নগরপাল। সাস্ত্রী, সাস্ত্রী—

সাস্ত্রীদ্বয়। প্রভু।

নগরপাল। আলো নিভিয়ে দিল কে?

সাস্ত্রী। এদিকে তো কেউ আসেনি, প্রভু।

(সাস্ত্রীরা অদৃশ্য হ'ল, নগরপাল ফিরে আসনগুলির কাছে এল)

নগরপাল। কি আশ্চর্য্য —

কবি। এ যদি শ্রমণের যাদুমন্ত্র হয়, ইচ্ছাশক্তি হয়?

নগরপাল। যাদুমন্ত্র চুলোয় যাক। (ছোট একটা বাঁশী বার ক'রে ফুঁ দিল, দ্রুত কয়েকজন সাস্ত্রী প্রবেশ করল। তাদের মধ্যে একজনকে লক্ষ্য ক'রে নগরপাল বললে) কামন্দক, রঙ্গালয়ের চারিদিকে কড়া পাহারার দরকার। একটি প্রাণীও যেন বিনা অনুমতিতে বাইরে যেতে না পারে।

(সাস্ত্রীরা অভিবাদন ক'রে প্রস্থান করল)

শ্রমণ। আপনারা বিচলিত হচ্ছেন কেন? প্রদীপ নিভে যাওয়াটা কি এতই অস্বাভাবিক? মাপ ক'রে তেল দিতে একদিন কোনও দাসীর ভুলও হ'তে পারে।

বীরসেন। শ্রমণ ঠিকই ব'লেছে নগরপাল। আপনারা কেন ধরে নিচ্ছেন শ্রমণই এইভাবে আপনাদের নাটক বন্ধ করার চেষ্টা করছে, একজনকে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে বলুন,

(নগরপাল এক পা অগ্রসর হবার আগেই সূত্রধার প্রবেশ করল)

সূত্রধার। (বিচলিত স্বরে) রাজকুমার, কি একটা গোলমাল শোনা গেল।

বীরসেন। আপনি প্রস্তুত? নাটকের জন্য প্রস্তুত কিনা জিজ্ঞাসা করছি, শ্রমণের কাছে কিছু কিছু রাজনৈতিক খবর পাচ্ছি কিনা, তাই একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সূত্রধার। একটা গোলমাল হ'চ্ছে, রাজকুমার, লোকজন রঙ্গাগারের পেছনের পথটা দিয়ে ছুটোছুটি করছে। নাটক হবে না, এমন সব কি কথা বলছে।

নগরপাল। কোন দিকে যাচ্ছে তারা?

সূত্রধার। ইতস্ততঃ—

বীরসেন। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে? নগরপাল—? আচ্ছা সূত্রধার আপনি প্রস্তুত হন গে।

(নেপথ্যে ঘোড়ার খুরের শব্দ। সহসা পত্রবাহক প্রবেশ করল। বীরসেনকে অভিবাদন ক'রে একখানা পত্র দিল।)

বীরসেন। (পত্র প'ড়ে) মহামাত্য আজ রাত্রিতে একবার পরামর্শ-সভায় যেতে বলেছেন।

নগরপাল। কী হ'য়েছে রাজকুমার?

বীরসেন। শ্রেষ্ঠী জয়পাল, সেনানি চন্দ্রসেন, নগরপাল—। পত্রবাহক তুমি যাও, মহামাত্যকে ব'লো আমরা অবিলম্বেই মন্ত্রণাশালায় উপস্থিত হব।

(পত্রবাহকের প্রস্থান)

চন্দ্রসেন। মন্ত্রণাশালায়, রাত্রিতে?

বীরসেন। পূর্বস্থলীতে বিদেশি সৈন্য উপস্থিত। এপারের অশ্ব-ব্যবসায়ী ইখতিয়ার তাদের সাথে সংযোগ রাখছে ব'লে সন্দেহ হ'চ্ছে। সন্ধ্যার পর থেকে ইখতিয়ারের শিবির পরিত্যক্ত। মহাসত্ত্ব, হয় তুমি শত্রুর চর, নতুবা, নতুবা তুমি বিচক্ষণ রাজনৈতিক।

শ্রমণ। রাজকুমার—। ফুল্লরা আর দেরি নয়।

চন্দ্রসেন। এখনও তুমি সোমলতাকে ইখতিয়ারের কাছে নিয়ে যেতে চাও? কি অপূর্ব তোমাদের নীতিজ্ঞান।

শ্রমণ। এখন দেখছি আমার আরও তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। চল সোমলতা, সময় বড় সংক্ষিপ্ত।

নগরপাল। নগরীর শ্রেষ্ঠা সুন্দরী ও কলাশিল্পীকে অনেকেই উপঢৌকন হিসাবে স্বীকার করবে। তুমি কি সোমাকে ইখতিয়ারের উপহার ক'রে নিয়ে যেতে চাও?

শ্রমণ। উপহার দেবার কথা ভাবিনি। এখন দেখছি তা যায় বটে। কিন্তু ফুল্লরা কি রাজি হবে? ও যেতে চেয়েছিল সংস্কৃতির খোঁজে, শত্রুর হাতে উপহার হ'য়ে যাওয়াটা ত্যাগ স্বীকারের ব্যাপার। আত্মত্যাগের মতো মহৎ হ'তে কি ফুল্লরা পারবে?

চন্দ্রসেন। তোমার উদ্দেশ্য কী, উপহার দিয়ে কী লাভ হবে তাই আমরা জানতে চাই?

শ্রমণ। উপহার দিয়ে যা হয়, বলবান শত্রুকে খুসি করা।

চন্দ্রসেন। বিস্ময়কর স্পর্দ্ধা তোমার শ্রমণ, রাজ্যের বলিষ্ঠ শক্তিগুলির সামনে দাঁড়িয়ে তুমি শত্রুকে খুসি করার কথা বলছ? তুমি রাষ্ট্রদ্রোহী, তোমাকে বন্দি করা হ'ল।

শ্রমণ। কি মুস্কিল। আজ না হয় ফুল্লরা থাক। ইখতিয়ারও সহসা উপহার নিতে রাজি হবে ব'লে মনে হয় না। লোকটা কাজ ভালবাসে। ও পন্থায় তার আক্রমণ রোধ করা যাবে না।

চন্দ্রসেন। রাজকুমার, সীমাইন আপনার ধৈর্য্য। বিনা বিচারে শ্রমণদের দণ্ডিত করা নিষিদ্ধ হ'য়েছে, কিন্তু রাজদ্রোহের অপরাধেও কি তাই?

বীরসেন। মুক্তি পেলে তুমি কি কর, শ্রমণ?

শ্রমণ। ধীমান্ রাজকুমার, আপনি বুঝবেন। আমাকে মুক্তি দিন। আমি বাংলা দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়াব। যাতে যুদ্ধ না হয় তারই চেষ্টা করব।

বীরসেন। যুদ্ধ যাতে বাংলা দেশে না পৌঁছায় তার জন্য আমাদের সৈন্যবাহিনী অগ্রসর হচ্ছে।

শ্রমণ। না, না, ও উপায়ে হয় না। মহামতি অশোকের সময়েও হয়নি।

বীরসেন। তুমি কী করতে চাও?

শ্রমণ। আমি প্রচার করব, যুদ্ধ তোমরা কোর না।

চন্দ্রসেন। শত্রু যাতে বাধা না পায়, এই না তোমার উদ্দেশ্য?

শ্রমণ। না। লোকক্ষয় হবে না, রক্তপাতও হবে না। শত্রুকে বাধা দিলে উভয় পক্ষের সৈন্যদলের চাপে কত শিশু নিষ্পিষ্ট হবে, কত নারী দলিত হবে। রাজকুমার, রাজকুমার অকারণ রক্তপাত বন্ধ করুন।

নগরপাল। রাজকুমার, কালক্ষেপণ হ'চ্ছে। নাটক—আর না হয় মন্ত্রণাশালাতে যাওয়া দরকার। শ্রমণ, তুমি রাজদ্রোহী—কিন্তু বাতুল। ষড়যন্ত্রের যারা মূল তারা তোমার মতো নির্বোধকে যন্ত্র ক'রে ভাল করেনি।

বীরসেন। অকারণ রক্তপাত! শ্রমণ তোমাদের ধর্ম কি এই শিক্ষা দেয়? আত্মরক্ষার জন্যও রক্তপাত নিষিদ্ধ, ক্লীবের জীবনের কি এতই মূল্য?

শ্রমণ। জীবনকে আমি বড় ভালবাসি। মন্ত্রের সাধনার জন্য জীবন ব্যয় করা যায় কিন্তু এ যুদ্ধে শরীরের পতনই হবে, কোন

সাধনাই হবে না। একটি দেশ নিজের করায়ত্ত রাখায় কোন সিদ্ধি নেই। তা ছাড়া এক্ষেত্রে—

বীরসেন। কি এ ক্ষেত্রে?

শ্রমণ। সংবাদ যদি সত্য হয় তবে পরাজয় অনিবার্য।

চন্দ্রসেন। শ্রমণ!

বীরসেন। আহ্ চন্দ্রসেন। কেন পরাজয় অনিবার্য, শ্রমণ? বাঙ্গালি জাতির বাহুতে কি বল নেই?

শ্রমণ। আমার মতো অযুদ্ধ-ব্যবসায়ীর মতের কি মূল্য আছে? রাজকুমার, এ অভিযান একটি মাত্র তরঙ্গে আসবে না। একের পর এক তরঙ্গ আসবে, সেই অবিরত আঘাতে সেনা-শক্তি ভেঙে পড়বে। বিক্রমশীলার ভিক্ষুদের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে নবীন অভ্যুদয়কে পুরাতন রোধ করতে পারে মাত্র একটি অবস্থায়, যখন সমগ্র দেশের অধিবাসীরা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নিজের বলে অনুভব করে। এ ক্ষেত্রে জনসাধারণ রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিবর্তনের দর্শক মাত্র।

বীরসেন। বাঙ্গালি কি এমনি নিঃস্ব জাতি যে বিদেশি বিধর্মী শত্রুর আঘাতও তারা অবনত হ'য়ে মেনে নেবে?

শ্রমণ। সেন শাসন বাঙ্গালির কাছে বিদেশি ও বিধর্মী শাসন। তার সাথে বাঙ্গালির কতটুকু সংযোগ। কোন শাসনের সাথেই বা কতটুকু যোগ তার? যারা ফসল তুলছে, কাপড় বুনছে এরাই তো বাঙ্গালি। এদের হৃদয় আবদ্ধ এদের সমাজে; সেই সমাজের বিধানে এদের সূর্য্য উদিত হয়, অস্ত যায়। রাজশক্তি যদি সেখানে ছায়া ফেলে তারা তাড়াতাড়ি রাজশক্তিকে উপহার দিয়ে বিদায় ক'রে দেয়। যেদিন তার সমাজের ভেতরে রাষ্ট্রীয় অন্যায় অনুপ্রবেশ করে, সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাঙ্গালির বাহুবল প্রকাশিত হয়, গোপালদেবকে তারা রাষ্ট্রনায়ক করে। কিন্তু প্রাসাদদ্বারে অপেক্ষা করে না। সমাজের কুটিরগুলিতে ফিরে যায়। কে রাজা হ'ল, কোন রাজা চলে গেল, এ তাদের কাছে আলাপ করার সংবাদ মাত্র। আকাশের চাঁদের ক্ষয়বৃদ্ধি আর রাজার ক্ষয়বৃদ্ধি এদের কাছে সমান ব্যাপার।

বীরসেন। তুমি কি বলতে চাও, বাঙ্গালি বিপদকালে সেনরাজাদের পাশে দাঁড়াবে না? সেনরাজারা কি বাংলাকে কিছু দেয়নি।

শ্রমণ। দিয়েছে। কিন্তু বাংলা কি তা গ্রহণ করেছে? বাঙ্গালির কি সেটা প্রয়োজনের ছিল?

বীরসেন। আর্য্যসভ্যতা ও ব্রাহ্মণ্যধর্মকে অবশ্য তুমি ঘৃণা কর।

শ্রমণ। না, প্রশ্রয় দেই।

চন্দ্রসেন। রাজকুমার, রাজকুমার—

নগরপাল। রাজকুমার, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই ভিক্ষুকের কাছে অপমানিত হবেন না—

বীরসেন। (এদের নিরস্ত ক'রে) শ্রমণ, যারা সেন-সংস্কৃতিকে ভালবেসে সেন-শিক্ষাদীক্ষাকে অবলম্বন করেছে তাদের সংখ্যা কি নগণ্য? তাদের এ অবস্থা কি তারা উন্নততর বিবেচনা করছে না?

শ্রমণ। তাদের কেউ কেউ এ জন্য কৃতজ্ঞও বটে। কিন্তু সে কৃতজ্ঞতার মূল্য কতটুকু? ফুল্লরা, ইখতিয়ার রাষ্ট্রের শত্রুতা করার আগেই আমাদের সীমান্ত পার হওয়া উচিৎ ছিল — কিন্তু আমি তো—

সোমলতা। আমি প্রস্তুত, মহাসত্ব।

বীরসেন। তুমি কোথায় যাচ্ছ, তা জান সোমলতা?

সোমলতা। কোথায় রাজকুমার?

বীরসেন। বিধর্মী শত্রুস্থানীয় একজন অশ্ব-ব্যবসায়ীর হাতে তোমাকে সমর্পণ করা হবে।

সোমলতা। সমর্পণ করা হবে?

শ্রমণ। দেখতে দোষ কি ফুল্লরা? তোমার নিশ্চয়ই সাহসের অভাব হয়নি?

সোমলতা। আমি আপনাকে বিশ্বাস করি মহাসত্ব।

বীরসেন। আমাদের শুভেচ্ছার প্রয়োজনও বোধ হয় আর নেই, না সোমলতা?

সোমলতা। রাজকুমার—

শ্রমণ। বীরসেন, আপনি সোমলতার কাছে কৃতজ্ঞতা আশা করেছিলেন, যেমন সেন-কৃষ্টিতে বিশ্বাসী অন্য অনেকের কাছে করেন। ফুল্লরা কৃতজ্ঞ, কি বল ফুল্লরা? কৃতজ্ঞের চাইতেও বেশি। আমার তো মনে হয় সেন-কৃষ্টিকে আর কেউ এত ভালবাসেনি। রমণীর পক্ষে শিল্পকলার আকর্ষণে পারিবারিক জীবনের বাইরে পা দেয়া, প্রেমকে উপেক্ষা করা সুতীব্র আগ্রহেরই সূচনা করে। সেই শিল্পকলার উৎস যে কৃষ্টি সেটা নিশ্চয়ই তার কাছে ধর্মের মতোই উপাস্য।

বীরসেন। তুমি কি এই ঘটনা দিয়ে প্রমাণ করতে চাও সেন-কৃষ্টির প্রতি সোমলতার আকর্ষণ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী?

কবি। আপনি আপনার প্রভাব কাজে লাগিয়েছেন, প্ররোচিত করেছেন, সোমলতা মোহগ্রস্ত।

শ্রমণ। যে আকর্ষণ প্ররোচনায় টুটে যায়, তা কখনও রাষ্ট্রবিপ্লব কাটিয়ে উঠতে পারে না, কবি। তবু সোমার আকর্ষণ কত খাঁটি। সেনরাজাদের আকর্ষণে তাদের কাছে খ্যাতি পাবার লোভে সে আসেনি। অভিনয়-শিল্পের আকর্ষণেই সে এসেছিল। কিন্তু তোমার এ প্রীতি কত ক্ষণস্থায়ী ভেবে দেখেছ কবি?

কবি। ক্ষণস্থায়ী?

শ্রমণ। হ্যাঁ কবি, তুমিও মুক্তি চাও। এ কৃষ্টিকে তুমিও অন্তরে স্বীকার করতে পারছ না।

কবি। আমি? কি বলছেন আপনি মহাসত্ব!

শ্রমণ। নিজের শ্রেষ্ঠ মানস-সৃষ্টিকে উপহাসিত হ'তে দেখে তুমি কষ্ট পেয়েছ। যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি তোমাকে ময়নামতীর গান রচনায় সাহায্য করেছিল, আজ তা কোথায় কবি? সভাস্তাবক ধোয়ীর অনুমোদন লাভের আশায় নিজের কাব্য ভাষান্তরিত করেছ। ওরা যখন বুঝতে না পেরে বলছে উদ্ভট হাস্যরস, তখন নিজেকে ধন্য জ্ঞান করছ। সাহস ক'রে বলতে পারছ না, এ আমার নবীন সৃষ্টি, হাস্যরসের চাইতেও শুভ্র, করুণের চাইতেও গভীর— নারীহৃদয়ের চিরন্তনী স্বরূপের উদঘাটন। মনে আছে সহ্যপদাবলীর কবি কী ব'লে তোমাকে অভিনন্দিত করেছিল?

কবি। মহাসত্ব?

বীরসেন। এ তোমার অনূদিত নাটক?

কবি। পরাস্বপহরণ নয় রাজকুমার, দেশিভাষা থেকে রাষ্ট্রভাষায় অনূদিত।

বীরসেন। তথাপি সোমলতাকে বাংলায় অভিনয় করতে দিতে তুমি আপত্তি করেছ, বৃদ্ধ সূত্রধারকে ভারতশাস্ত্রের নজির দেখিয়ে নিরস্ত করেছ?

সোমলতা। কবির এ নাটক আমাদের দেশিভাষায় যে কত মধুর, কত অনির্বচনীয় তা বর্ণনা করা যায় না।

নগরপাল। অথচ কবি, অনুবাদ ক'রে ব্যঙ্গকাব্যে পরিণত করেছ?

বীরসেন। কিন্তু কেন তুমি তা করতে গেলে কবি? রাজসভার খ্যাতির আশাতেই কি?

কবি। রাজকুমার, কবিও মানুষ। কাব্য আমাদের পণ্য, অর্থলাভ না হোক, যশ না হোক অন্তত শ্রোতা প্রয়োজন।

বীরসেন। সেন শাসনই কি তোমার শ্রোতার অভাবের জন্য দায়ী?

কবি। বাংলার ভাগ্য তাই। বিদগ্ধ শ্রোতামাত্রই রাজানুগ্রহে রাষ্ট্রভাষা সংস্কৃতকে ভালবাসার জন্য প্রাণপণ করছে।

শ্রমণ। কিন্তু বিচক্ষণ ইখতিয়ারউদ্দীন ইতিমধ্যে বাংলা শেখার জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়।

বীরসেন। তাই তো। (একটু নিস্তব্ধতা)

মহাসত্ব। আমাকে বিদায় দিন, রাজকুমার।

বীরসেন। তোমাকে আমি মুক্তি দিতে পারি না। বাঙালির সহায়তা ছাড়াই সেনরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে, তাদের সহায়তা ছাড়াই রক্ষিত হবে। কিন্তু মুক্তি পেলে সমগ্র দেশকে তুমি যুদ্ধবিমুখ করার চেষ্টা করবে, সেটা রাজনীতির পক্ষে সহনীয় নয়। তুমি আমাকে খানিকটা সাবধান করে দিয়েছ, শ্রমণ, এ জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

চন্দ্রসেন। মূর্খ শ্রমণ। তুমি তোমার বৌদ্ধ অনুচরদের অকৃতজ্ঞতার কথা প্রকাশ ক'রে তাদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করলে মাত্র। তাদের অনার্যত্ব ও ধর্মহীনতার উপরে নির্ভর ক'রে সেনরাজ্য সারা ভারতে প্রখ্যাত হয়নি।

শ্রমণ। সেনানি চন্দ্রসেন, আপনি ক্ষত্রিয়, কিন্তু ব্রহ্মক্ষত্রিয় নয়। আপনার মাতুল আমার পরিচিত।

(চন্দ্রসেন বিচলিত)

চন্দ্রসেন। ব্রহ্মক্ষত্রিয় আমার সহোদর, আমরা এক মহান আর্যজাতির অংশ।

শ্রমণ। (হাসি মুখে) কিন্তু সেনানি, আপনার কাছেবলার মতো বিশেষ সংবাদ ছিল। রাষ্ট্রবিপ্লবের কাল উপস্থিত। শক্তিমানরা এ সময়ে সব রকম সংবাদেই সংগ্রহ ক'রে থাকেন। আপনার মাতুল এখন কামতা রাজ্যে, তা ছাড়া তার চাইতেও বড় কথা ফুল্লরার সম্বন্ধেও কিছু — (চন্দ্রসেন বিধা করতে লাগল) এই মুহূর্ত থেকে আমি রাজদ্রোহী, বন্দি, কথা বলার অবসর পরে নাও হ'তে পারে।

চন্দ্রসেন। বল আমরা শুনছি।

শ্রমণ। আপনি অনুগ্রহ ক'রে এক পা সরে আসুন। সকলের কাছে কথাগুলি প্রীতিপ্রদ হবে না—(চন্দ্রসেন শ্রমণের দিকে এক পা অগ্রসর হ'ল) রাজকুমার বীরসেন, রাষ্ট্রবিপ্লবের সম্মুখে বন্দির কাছে বিশেষ সংবাদ শোনবার জন্য যে সেনানি উন্মুখ, সে আপনার কতখানি বিশ্বাসভাজন?

চন্দ্রসেন। (তরবারি নিষ্কাশিত করে) প্রতারক, ভণ্ড শ্রমণ!

বীরসেন। (তিরস্কারের সুরে) চন্দ্রসেন।

চন্দ্রসেন। (জানু পেতে বীরসেনের পায়ের কাছেতরবারি ভূমিতে রেখে) রাজকুমার।

বীরসেন। বয়স্য চন্দ্রসেন, ব্রহ্মক্ষত্রিয় কিম্বা আদিক্ষত্রিয় সে বিচার পরে হবে। এখন আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াব, ওঠো। কবি, তোমার নাটকের মহলায় আজ নানারূপ প্রতিবন্ধক এসে গেল। তার জন্য আমি দুঃখিত। সূত্রধারকে বলবে তিনি যেন কাল একবার আমার সাথে দেখা করেন। সোমা, তুমি আর অন্য নাট-নটীরা বিশ্রাম কর আজ। কাল তুমি এবং কবি সূত্রধারের সাথেই আমার প্রাসাদে যাবে। দেখি নাটকটার কী করা যায়। যাও তোমরা।—নগরপাল—?

(কবি ও সোমলতা বিপরীত মুখে প্রস্থান করল)

নগরপাল। চলুন রাজকুমার, আমি বন্দি শ্রমণকে সান্ত্রীদের হাতে দিয়ে যাচ্ছি। সান্ত্রী—

(সান্ত্রীরা কেউ এল না। নগরপাল কয়েক পা এগিয়ে গেল।) সান্ত্রী! কে? (পিছিয়ে এসে) কে তোমরা? কী চাও?

(আট দশজন পাঠান সৈন্য প্রবেশ করল। তাদের চেহারা যমজের মতো। পোশাকেও হুবহু এক রকম। তাদের প্রসারিত ডান হাতে ধরা উন্মুক্ত তরবারির অগ্রভাগ প্রায় ভূমি স্পর্শ করছে। নিঃশব্দে যন্ত্রচালিতের মতো একই সঙ্গে তারা সোপান বেয়ে রঙ্গাগারের ভেতরে এসে দাঁড়াল।)

শ্রমণ। রাজকুমার, এখনও আমাকে এগিয়ে যেতে দিন, এরা ইসলামীয় সৈন্য।

(রঙ্গাগারের নানা দিক দিয়ে নট-নটীরা, সোমলতা, কবি, সূত্রধার প্রভৃতি প্রবেশ করে রাজকুমারের কাছে দাঁড়াল)

সূত্রধার। রাজকুমার। রাজকুমার।

কবি। রাজকুমার দূরে কোথায় আগুন লেগেছে। বহু লোকের আর্ত কোলাহলের শব্দ ভেসে আসছে। দুঃসময় উপস্থিত।

বীরসেন। (হাসল। চন্দ্রসেনের হাত থেকে উন্মুক্ত তরবারি নিজের হাতে নিল। চন্দ্রসেন ও নগরপাল বীরসেনের ইঙ্গিতে শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে বীরসেনের পেছনে দাঁড়াল।) নগরপাল, যে রকম দেশের অবস্থা, এখন থেকে সর্বদা সশস্ত্র থাকবেন। কবি, আজকের রাতটা বোধ হয় তোমাদের বন্দি হ'য়েই থাকতে হবে। নট-নটীরা, তোমরা সূত্রধারের আশ্রয়ে থাক। সূত্রধার, আপনার এ রঙ্গশালায় যদি গুপ্তপথ নির্মাণ না ক'রে থাকেন রসিক চূড়ামণিদের জন্য তবে বুঝব আপনি অভিজ্ঞ না হ'য়েই বৃদ্ধ হয়েছেন।

(বীরসেন, নগরপাল, চন্দ্রসেন শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল, শ্রমণ স্তম্ভটির পাশে যেন স্তম্ভিত হ'য়ে গেছে। নটনটী ইত্যাদি সূত্রধারের পেছনে অন্তর্হিত হ'ল। বীরসেন এবার অগ্রসর হ'ল। পাঠান সৈন্যদের প্রায় সবগুলি তরবারী বীরসেনের তরবারীর উপর আঘাত করল। কৌশলে নিজের দেহকে বাঁচিয়ে প্রথমে নগরপাল ও চন্দ্রসেনকে পলায়নের পথ করে দিল বীরসেন, তারপরে তরবারী দিয়ে পাঠান সৈন্যদের আঘাত ঠেকাতে ঠেকাতে পেছনে হঠতে হঠতে সোপানে পৌঁছে ছুটে পালাল।)

ইখতিয়ার। বাস্। তোমরা ঘরগুলি খুঁজে দেখ, দু'জন দু'জন করে।

(জন ছয়েক পাঠান সৈন্য রঙ্গাগারের তিন দিকের ঘরগুলির দরজা ঠেলে অদৃশ্য হ'য়ে গেল)

ইলতুৎমিস। দাঁড়িয়ে দেখলে?

ইখতিয়ার। তুমিও তাই। তবে তোমার তরবারী চালানোর পথ ছিল না এই যা। ব্যাপার কি জানো ইলতুৎমিস? লোকটিকে আমার বীর বলে মনে হ'ল। নতুবা আমাদের দেখেও অমন হেসে হেসে কথা বলতে পারত না।

ইলতুৎমিস। নির্বোধরাও হাসে।

ইখতিয়ার। কিন্তু একখানা তরবারী নিয়ে দশখানার সামনে সতর্ক পায়ে মেপে মেপে এগিয়ে আসে না।

ইলতুৎমিস। ছিপাহছালার যা বলছো শিরোধার্য।

ইখতিয়ার। (হেসে) তুমি কি ভেবেছ বিনা রক্তপাতে ওকে বন্দি বা হত্যা করা যেত? দু'তিনজনের জান যেতে পারত। আর সে দু'তিনজনের মধ্যে আমি এবং তুমিও থাকতে পারতাম।

ইলতুৎমিস। ছিপাহছালারকে কাপুরুষ বলতে পারি না, এটা বোধ হয় তাঁর রসিকতা।

ইখতিয়ার। (হো হো ক'রে হেসে) তুমিও দেখছি ভারতীয় হ'চ্ছ। এর পরে সম্মুখ যুদ্ধের ক্ষাত্রোচিত মৃত্যুর প্রশংসা শুরু করবে। আরে কে ওখানে, হেকিম সাহেব না—

শ্রমণ। হ্যাঁ, ইখতিয়ারউদ্দীন।

ইখতিয়ার। বাংলা শিখলে বাঙ্গালিরা পেয়ার করে সেটা ঠিক। তোমাকে বহুৎ শুকরিয়া।

শ্রমণ। যুদ্ধের জন্য বাংলা শিখতে আমি বলিনি ইখতিয়ার, তোমার ব্যবসায়ের জন্য বলেছিলাম।

ইখতিয়ার। জন্ আমার কারবার।

শ্রমণ। ইখতিয়ারউদ্দীন, তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে।

ইখতিয়ার। ফরমাইয়ে জনাব।

শ্রমণ। তুমি বিনাযুদ্ধে এ রাজ্য জয় করতে পারবে।

ইখতিয়ার। হুঁ? কি সর্ত?

শ্রমণ। অকারণ নরহত্যা কোর না।

ইখতিয়ার। (হো হো ক'রে হেসে উঠে) যদি কাল ফজর তক জিন্দা থাকি তবে তোমার কথা ভেবে দেখব।

শ্রমণ। আমি তোমাকে বিনা রক্তপাতে দেশ জয়ের উপায় বলে দিতে পারি। ইখতিয়ার আমাকে বিশ্বাস কর। আমাকে এরা বন্দি করেছে, তুমি মুক্তি দাও, আমি গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করব, জনসাধারণকে বলব, সৈন্যদের বলব অস্ত্রত্যাগ করতে।

ইখতিয়ার। দেশদ্রোহীকে বিশ্বাস করা কঠিন। তা ছাড়া এভাবে দেশ জয় হয় এ কোনও কেতাবে লেখে না। তোমার স্বার্থ কী? তুমি কি পাল বংশের শাহ্জাদা, প্রতিহিংসা চাও? এ সওয়াল পরে হবে যদি জান নিয়ে ওয়াপোস আসি।

(নেপথ্যে অশ্বপদ শব্দ। বহুলোকের ভীত কণ্ঠের কোলাহল। কে একজন সাহস দিয়ে বলছে—ভয় পেও না দেশবাসী, অপরিমেয় শক্তি মহাবাহু লক্ষ্মণ সেন এ দেশের প্রতিপালক। বিশ্রান্ত হয়ো না। পাঠান সৈন্যরা নিজেদের সমবেত করার জন্য চিৎকার করছে—হুকমতে ইখতিয়ার। কারা চিৎকার করে উঠল—আগুন আগুন। কে একজন কেঁদে উঠল—বাবা আমার সোনা আমার।)

মহাসত্ব! শোন, শোন, ইখতিয়ার—

ইখতিয়ার। পূর্বস্থলীর জওয়ান এসে পড়েছে। ইলতুৎমিস শুনতে পাচ্ছ, আমি গাজি। বল হেকিম, আমি তোমাকে দু'পলক সময় মঞ্জুর করলাম। (হাসিমুখে বিজয়ীর ভঙ্গিতে দাঁড়াল)

মহাসত্ব। আমাকে মুক্তি দাও। তোমার যুদ্ধক্ষত সারিয়েছিলাম, মনে আছে? এখানে তো অনেকের তেমনই ক্ষত, তেমনই যন্ত্রণা। আমাকে ছেড়ে দাও।

ইখতিয়ার। (একটু চিন্তা করে) আচ্ছা, যাও। কিন্তু দেখো হেকিম, মানুষের চিকিৎসাই কোরো। সোওয়ার ভুলে আবার ঘোড়ার ক্ষত সারাতে বস না। তোমার কাছে তো সোওয়ার আর ঘোড়ার তক্‌লিফ সমান। (মহাসত্ব নত মস্তকে চলে গেল) ইলতুৎমিস পাহারায় থাক। চারিদিকে পাথর দিয়ে ঘেরা এমন শিবির আর পাওয়া যাবে না।

ইলতুৎমিস। ছিপাহছালার কি একা এই রাত্রিতে শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়ান উত্তম বিবেচনা করেন? চারিদিকে শত্রু ক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

ইখতিয়ার। উপায় কি ইলতুৎমিস? যারা গঙ্গা পার হয়ে এল তাদের এক জায়গায় জমায়েৎ করতে হবে তো। সারি বেঁধে দাঁড় করাতে হবে। আজ রাত্রিতে বেশি লুটপাট করলে কাল সকালে রাজার সৈন্যদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। আমি যাচ্ছি। আর শোন, কেউ যদি প্রবেশ করে, সে যেই হোক আটক করবে।

(ইখতিয়ার চলে গেল। ইলতুৎমিস মঞ্চের উপরে উঠে দাঁড়িয়ে পদচারণা করল। মঞ্চের উপরে কবির পাণ্ডুলিপিটি পড়ে ছিল, সেটা তুলে নিয়ে দেখল, তারপর মঞ্চের উপরে ফেলে দিল। স্তম্ভের গায়ের প্রদীপ সারিগুলি হঠাৎ নিভে গেল। ব্যাপারটা এত আকস্মিকভাবে হল যে ইলতুৎমিস খানিকটা চমকে উপরের দিকে তাকাল। খোলা আকাশে চাঁদের একটু খানি আলো তার মুখের উপরে এসে পড়ল, তারপর অন্ধকার হয়ে গেল। স্তম্ভের প্রদীপগুলি ইতিমধ্যে প্রায় সবই নিভে গিয়েছিল। ফলে আকাশের চাঁদের আলো ছাড়া আর কোনও আলো ছিল না। আকাশে মেঘও ছিল। বিচক্ষণ ইখতিয়ার এই রাত্রিটি সে জন্যই বেছে নিয়েছিল অভিযানের জন্য। কিন্তু ইলতুৎমিস অন্ধকারে বিচলিত হ'য়ে উঠল।)

ইলতুৎমিস। কই হ্যায়—

(দু'জন পাঠান সৈন্য সাজঘর থেকে প্রবেশ করল)

পাঠান সৈন্য। জনাব।

ইলতুৎমিস। বড় অন্ধকার, মশাল জ্বালো।

পাঠান সৈন্য। মশাল—বন্দেআলি, মশালের কোনও ব্যবস্থা নেই।

ইলতুৎমিস। এদের ঘরের ভেতরে কিছু পেলে না?

পাঠান সৈন্য। জি কেতাব আছে, আর রকম রকম পোশাক। আদমি, জেনানা কেউ নেই।

(ছুটতে ছুটতে শ্রমণ প্রবেশ করল। ইলতুৎমিস বিচলিত হ'য়ে উঠল)

ইলতুৎমিস। হুঁশিয়ার।

শ্রমণ। দাঁড়াও, দাঁড়াও, ভুলে গেছি। পেয়েছি, পেয়েছি।

(মহাসত্ব এগিয়ে গিয়ে সূত্রধারের হস্তচ্যুত কবির নাটকের পাণ্ডুলিপিটি কুড়িয়ে নিল)

ইলতুৎমিস। হ্যাহি। কৌন হ্যায় রে?

শ্রমণ। কিছু না, কিছু না। এটা অস্ত্র নয়, একখানা নাটক শুধু।

(বাইরে কোলাহল ও আর্তনাদ)

ইলতুৎমিস। হুঁ। কেতাব? ফিকির বটে।

শ্রমণ। সত্যি তাই, সত্যি তাই। ফিকির নয়। এ কেতাবের মূল্য অনেক।

ইলতুৎমিস। ঠিক আছে। আমি ইলতুৎমিস আছি, ইখতিয়ার নয়। বহুত আচ্ছা অভিনেতা আছে বাঙ্গালরা। (মহাসত্বের হাত থেকে পুঁথি নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল)

ইলতুৎমিস। তুমি আটক। বাঁধো একে।

(দু'জন পাঠান সৈন্য অগ্রসর হ'য়ে মহাসত্বের হাত চেপে ধরল)

শ্রমণ। কেন, কেন, ইখ্‌তিয়ার আমাকে মুক্তি দিয়ে গেল শোন নি?

ইলতুৎমিস। ইখতিয়ারের হুকুমেই তুমি বন্দি।

(পাঠান সৈন্যরা শ্রমণকে স্তম্ভের কাছে নিয়ে গিয়ে তার হাত দু'টি স্তম্ভের দু'পাশে কাপড় দিয়ে বেঁধে দিল। মনে হচ্ছে শ্রমণ স্তম্ভ থেকে উদ্ভাহু হ'য়ে ঝুলছে)

শ্রমণ। আমি, আমি ভিক্ষু মহাসত্ব, বন্দি? আমি মহাসত্ব— আমি বন্দি?

(কথাগুলি বলতে বলতে অট্টহাসিতে শতদীর্ণ হ'য়ে যেতে লাগল শ্রমণের মুখ। সে অট্টহাসিতে বিদ্রোহ ছিল, কিন্তু সহসা তার হাসির পরিবর্তন হ'ল। তাতে স্নেহ ও করুণা আসতে লাগল। মধুর হ'য়ে উঠল হাসি। ঝরণার কলতানের মতো অজস্র ও মধুর হ'তে হ'তে অকস্মাৎ সে হাসি থেমে গেল। শ্রমণের সর্বাঙ্গ স্থির হ'য়ে গেল। মাথাটা ঢলে পড়ল।)

পাঠান সৈন্য। কি এ? ইয়া আল্লা—তক্ নাকি?

দ্বিতীয় পাঠান সৈন্য। আরে ও কে আসে জিন?

ইলতুৎমিস। (তরবারি নিষ্কাশিত ক'রে) পিছিয়ে এস। (পাঠান সৈন্য ও ইলতুৎমিস স্তম্ভের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।) (সোমা আঁচলে ঢাকা প্রদীপ নিয়ে সোপানের পথে প্রবেশ করল)

সোমা। কবি? মহাসত্ব! কবি! (উচ্চস্বরে ডাকল কিন্তু ভয়ে হাঁপাচ্ছে) মহাসত্ব? (শ্রমণকে দেখে এগিয়ে) প্রভু আপনি এখানে? আপনাকে খুঁজছি। আপনাকে পাচ্ছি না, কবিকে পাচ্ছি না, ওরা বোঝে না—তা হ'লে নটীর জীবনে কলঙ্ক ছাড়া আর কী রইল। মহাসত্ব-

(সোমা প্রদীপ নিয়ে মঞ্চে উঠতে যাবে এমন সময় ইলতুৎমিসের তরবারী বিদ্যুতের মতো তাকে আঘাত করল। সোমা কাতরোক্তি ক'রে মঞ্চের নীচের ধাপে লুটিয়ে পড়ল।)

সোমা। (একটু পরে) প্রভু, প্রভু এই কি মহাযোগ? এই কি বিরাম?

(ইলতুৎমিস ও পাঠান সৈন্যরা স্তম্ভের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময়ে ভীমা কামন্দক ও তার একজন সঙ্গী প্রবেশ করল)

ভীমা। (দৃশ্যটা অনুভব ক'রে) একি রে নাটক হচ্ছে না কি? ভাল ক'রে দেখ তো, মধুর নেশায় ঠিক ঠাহর হ'চ্ছে না।

সঙ্গী। না ভীমা দাদা, নাটক শেষ ক'রে বাড়ি গেছে। মঞ্চের পাহারা রেখে গেছে।

ভীমা। তবে যে চেঁচামেচি শুনলাম, যুদ্ধ যুদ্ধ নাটক যেন— এরই মধ্যে শেষ হ'ল!

সঙ্গী। দেখছ না যখ্ বেঁধে রেখে গেছে থামে। পাহারার যখ্।

(এমন সময়ে আকাশ বোধ হয় মেঘমুক্ত হ'ল। শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদের অজস্র কিরণ এসে পড়ল শ্রমণের মুখে। মনে হ'ল যেন তার দেহ থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে।)

ভীমা। ও বাবা, এ যখ্ নয় রে। কোনও ঠাকুর। প্রণাম কর, প্রণাম কর। জ্বলছে দেখছিস না! হে ঠাকুর ভীমার অপরাধ ক্ষমা কোরো। সে একটু বোকা। একটু বুদ্ধি দাও।

(ভীমা ও তার সঙ্গী প্রস্থান করল। মহাসত্ব অজস্র কিরণে কখনও কখনও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতে লাগল।)

Rasoi
RASOI LIMITED

দেখাসাক্ষাতের সময়

চতুরঙ্গের সম্পাদকীয় দপ্তরে প্রতি মঙ্গল, বুধ এবং শুক্রবার বিকাল চারটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত